বঙ্গ-বীণা

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

ও

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্

এলাহাবাদ

১৯৩৪

উৎসর্গ

যাহার মোহন অঙ্গুলিস্পর্শে

বঙ্গ-বীণার

স্বর্ণতন্ত্রীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর ঝঙ্কার

রণিত হইয়াছে,

সেই কবিশ্রেষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের

করকমলে

পরিচয়

যখন কবি য়েট্‌স্‌ আমার গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন, "আপনার এই যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হলো, এ'কে বাংলা-সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌চি, কিন্তু বস্তুত এ তো বিচ্ছিন্ন নয়,—যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জান্‌তে পারলে এর রস উপলব্ধি হয়তো সম্পূর্ণ হবে না।"

কথাটা অনেক দিন পর্যান্ত আমার মনে লেগে ছিল। কোনো কাব্যের পরিচয় তা'র নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'তে পারে না; যখনি তা'র বিচার করি, তখনি স্বদেশী বিদেশী যে-কোনো সাহিত্য আমাদের জানা আছে, নিজের অগোচরেও তা'র সঙ্গে আমরা যাচাই ক'রে থাকি।

কলাসৃষ্টি বা সাহিত্যসৃষ্টিতে রুচি নিয়ে যখন তর্ক ওঠে, তখন তা'র অন্ত থাকে না। সংসারে এক একজন মানুষ থাকে যে সহজ কবি; তেমনি সহজ রুচিবান্‌ লোকও রসসৌন্দর্য্যের 'পরে সহজ দরদ নিয়ে দৈবক্রমে জন্মায়। এই কবি এবং রসিক উভয়ে একই জাতের মানুষ, তফাতের মধ্যে এই যে, একজনের আছে সুরের প্রাণ এবং গলা, আর একজনের আছে সুরের প্রাণ ও কান।

এই শ্রুতিবোধের সহজ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে না থাক্‌লেও যে-মানুষ বহুশ্রুত সে রসসৌন্দর্য্যের একটা আদর্শ বাহিরে থেকে সংগ্রহ ক'রে অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করতে পারে। এর জন্যে চাই, সাহিত্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা'র সঙ্গে নিরন্তর পরিচয় থাকা। এই পরিচয় বিশুদ্ধ সম্ভোগের, এ তত্ত্ববিশ্লেষণের বা শব্দব্যবচ্ছেদের মতো অঙ্গবিভাগের চর্চা নয়।

এই সম্ভোগকে খাঁটি করতে হ'লে যা-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু সাময়িক উত্তেজনামূলক, যা-কিছু ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি বা সামাজিক অভ্যাসলালিত, তা'র থেকে মনকে বিযুক্ত ক'রে নিতে হয়। এ কাজ সহজ নয়, কেননা যা আমাদের কাছের জিনিস, যা উপস্থিতমতো ঘাটে-বাটে দশের কোলে-কাঁধে আদর পেয়ে ফেরে, তা অচিরস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর হ'লেও তা'র প্রতি অভ্যস্ত স্নেহবশত তা'কে আমরা বেশি দাম দিয়ে ঠকি। এই রকম পাড়ার হাটের রঙ্‌-লাগানো সস্তা মনিহারির মোহ থেকে মনকে বাঁচাবার উপায় সর্বপ্রসারিত সাহিত্যকে মনের অন্তরগোচর করা। যে-সমস্ত রসসৃষ্টি ক্ষণকালের প্রশ্রয়ের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যকালের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের সঙ্গে সর্বদা চেনাশোনা থাক্‌লে সাহিত্যবিচার করবার অধিকার জন্মে ও আনন্দ ভোগ করবার শক্তি খাঁটি হ'য়ে ওঠে।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি সঙ্কলনের প্রয়োজন এই কারণেই। সাহিত্য বিজ্ঞানের মতো নয়। তা'র খাঁটা-সাচ্চা বিচার, যুক্তির দ্বারা সম্ভব হ'লে ভাবনা থাক্‌ত না; রুচি ছাড়া আর কোনো কষ্টিপাথর বা মানদণ্ড তা'র নেই। অথচ রুচি-সম্বন্ধে অতি অযোগ্য লোকেরও আত্মাভিমান আছে। এই রকম অভাজনের অসঙ্কোচ উপদ্রব সাহিত্যকে সহ্য করতেই হয়; চতুরাননের কাছে নালিশ ক'রেও কোনো ফল নেই। বিধি যেখানে আছে বিধাতার কাছে তা'র দরবার খাটে। এ তো বিধি

নয়, এ যে উপলব্ধি। এ ক্ষেত্রে ক'রেও কোনো ফল নেই। নির্ব্বিবেক অত্যাচার ঘট্‌লে তা'র কোনো চরম প্রতিকার আছে ব'লে জানিনে,—একটি মাত্র উপায় হচ্চে, সাহিত্য অনুশীলনের সাহায্যেই সাহিত্যরুচির বিস্তার সাধন করা। এ জিনিসটা সাধুতার মতোই,—স্বাভাবিক সাধুতা যদি দুর্ব্বল হয়, তবে সাধুসঙ্গ হচ্চে পথ। কিন্তু মূলধন অল্প থাকা সত্ত্বেও এ প্রণালী যে সকলের পক্ষে খাট্‌বে তা নয়; তবু যাঁরা উপযুক্ত ভোজের আয়োজন ক'রে সাহিত্যরুচির উদ্বোধন করতে প্রবৃত্ত, তাঁরা দুঃসাধ্যসাধনে অক্ষম হ'লেও অন্তত কবিদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত লেখা গীতিকবিতাগুলি হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া বঙ্গ-বীণার চারিটি স্তবক রচনা করা হইয়াছে। কি প্রণালীতে এই চারিটি বিভাগ করা হইল এবং উহার প্রত্যেকটিতে কি ভাবে কবিতা-বিন্যাস করা হইল, তাহা "কবিতা-পরিচয়" শীর্ষক 'নোটগুলির' মধ্যে পাওয়া যাইবে। কোনও কোনও কবিতা সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে একটি সহজ সম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইবে। মাত্র দুই এক স্থলে উদ্ধৃত পংক্তিগুলি গীতি-কবিতা হইতে গ্রহণ করা হয় নাই; কিন্তু আমরা আশা করি, সেখানেও উদ্ধৃতাংশের মধ্যে সেই সহজ সম্পূর্ণতাটি পাওয়া যাইবে এবং কবির হৃদয়ের স্পন্দনও অনুভব করিতে পারা যাইবে।

স্বল্পপরিসরের মধ্যে সকল ভাল গীতি-কবিতারই স্থান করিতে পারা সম্ভব হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ভাব, বিষয় ও রচনাভঙ্গীর বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সঞ্চয়নে সকল কালের বাংলা-গীতিকবিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন সন্নিবিষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

চতুর্থ স্তবকে জীবিত কবিদের ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত লেখা কবিতা গৃহীত হইয়াছে।

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই কাব্যসঞ্চয়নের পরিচয় লিখিয়া দিয়া এই পুস্তককে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। পুস্তকের প্রচ্ছদপটের নকসা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও মুখপাতের রঙীন ছবিটি আঁকিয়া দিয়াছেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী। ইঁহাদের অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্য ইঁহাদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বঙ্গ-বীণা

—:*:—

প্রথম স্তবক

———

১

মহাশূন্য

নাহি রেখ, নাহি রূপ, নাহি ছিল বর্ণচিহ্ন ;
রবি শশী নাহি ছিল, নাহি ছিল রাতি দিন ·
নাহি ছিল জল স্থল, নাহি ছিল আকাশ ;
মেরু মন্দার নাহি ছিল, নাহি ছিল কৈলাশ
নাহি সৃষ্টি ছিল, আর নাহি সুর নর ;
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাহি ছিল, নাহি ছিল অম্বর ;
দশ দিকপাল নাহি ছিল, মেঘ তারাগণ ;
আয়ু মৃত্যু নাহি ছিল, যমের তাড়ন ;
শূন্যেতে ভ্রমণ প্রভুর, শূন্যে করি ভর ,
'কাহারে জন্মাব ?' প্রভু ভাবে মায়াধর ;

মহাশূন্য মধ্যে প্রভুর জন্মিল পবন[১],
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন[২] ;
অনিল হইতে প্রভুর হয়ে গেল দয়া ;
ঠাকুরের পারিষদ হইল কত মায়া ;
আসন ছাড়িয়া প্রভু বৈসেন চুমুক[৩] উপরে,   ১৫
প্রভুর আসন বিম্ব সহিতে না পারে ;
ভাঙ্গিল জলের বিম্ব হইল ভাগ ভাগ,
শূন্যেতে বেড়ান প্রভু কারো নাহি পান লাগ ;
বিসার[৪] উপরে প্রভুর উপজিল দয়া,
আপনি স্বজিল প্রভু আপনার কায়া ;   ২০
দেহেতে জন্মিল প্রভুর, নাম নিরঞ্জন,
প্রভুর সঙ্গতি কেহ নহে একজন ;
শ্রীধর্ম্মচরণারবিন্দে করিয়া প্রণতি,
শ্রীযুত রামাই কয়, শুন রে ভারতী।

—রামাই পণ্ডিত

---

(১) বায়ুমণ্ডল। (২) শ্বাস-প্রশ্বাস। (৩) জলবিম্ব। (৪) বিশ্বকর্ম্মার।

২

সৃষ্টি

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার,[1]
যেই প্রভু জীব দানে স্থাপিল সংসার ;
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন ;
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ ;
সুগন্ধ সৃজিল প্রভু স্বর্গ আকলিতে[2] ; ৫
সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে ;
মিষ্টরস সৃজিলেক কৃপা-অনুরোধ ;
তিক্ত-কটু-কষা সৃজি জানাইল ক্রোধ ;
পুষ্পে জন্মাইল মধু সুগুপ্ত আকার ;
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার ; ১০
এতেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব ;
অন্তরীক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনি স্তম্ভ ;
সেই এক ধনপতি যাহার সংসার ;
সকলেরে দেয় দান, না টুটে ভাণ্ডার ;
ক্ষুদ্র পিপীলিকা হতে ঐরাবত আর ১৫
কাকে নাহি বিস্মরণ, দিয়াছে আহার ;

(১) কর্ত্তা। (২) গণনা, অনুসন্ধান করিতে।

হেন দাতা আছে কোথা, শুন জগজন,
সবাকে খাওয়ায় পুনঃ না খায় আপন ;
যেই ইচ্ছা সেই করে, কেহ নাহি জানে ;
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে ; ২০
সেই সে সকল গড়ে, সকল ভাঙ্গয় ;
ভাঙ্গিয়া গঠয় পুনঃ যদি মনে লয় ;
অনেক অপার অতি প্রভুর করণ,
কহিতে অকথ্য৩ কথা, না যায় বর্ণন ;
সপ্ত মহী, সপ্ত স্বর্গ, বৃক্ষপত্র যত, ২৫
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগত ;
যতবিধ নবগৃহ৪ আর বৃক্ষশাখা,
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী পাখা,
পৃথিবীর যত রেণু, স্বর্গে যত তারা,
জীবজন্তু-শ্বাস আর বরিষার ধারা,— ৩০
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতি এ লেখয়
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় !

—আলাওল

---

(৩) অবর্ণনীয়, অনির্ব্বচনীয় । (৪) নব ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর : দেহধারী জীব ।

৩

বসন্তোদয়

আএল ঋতুপতি, রাজ বসন্ত,
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ ;
দিনকর-কিরণ ভেল পয়[১]গণ্ড ;
কেশর-কুসুম ধবল হেম[২]দণ্ড ;
নৃপ-আসন নব পীঠল-পাত[৩] ; ৫
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ ;
মৌলি রসালমুকুল ভেল তায় ;
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায় ;
শিখিকুল নাচত, অলিকুল যন্ত্র ;
আন দ্বিজ[৪]কুল পড়ু আশীষ-মন্ত্র ; ১০
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ ;
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ;
কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান ;
পাটল তূ[৫]ণ, অশোকদল বাণ ;

(১) পৌগণ্ড, প্রবল, বর্দ্ধিত। (২) উহার মধ্যস্থিত পীতবর্ণ দণ্ডটি দীর্ঘ হইয়া স্বর্ণদণ্ডের মত প্রকাশিত হইল। (৩) পাটলা বৃক্ষের রক্তবর্ণ কচি পাতা। (৪) পক্ষী। (৫) পাটলপুষ্প দেখিতে তূণাকৃতি।

কিংশুক লবঙ্গলতা একসঙ্গ ১৫
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ;
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিককুল ;—
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল ;
উধারল সরসিজ, পাওল প্রাণ ;
নিজ নবদলে করু আসন দান ; ২০
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার ;—
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার।

—বিদ্যাপতি

৪

মধুমাস

মধু ঋতু, মধুকর-পাঁতি,
মধুর কুসুম মধু মাতি ;
মধুর বৃন্দাবন মাঝ,
মধুর মধুর রসরাজ !
মধুর মাদল রসাল[1],
মধুর মধুর করতাল ;
মধুর নটন গতি-ভঙ্গ,
মধুর নটনী নটরঙ্গ ;
মধুর মধুর রসগান,
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ।

-বিদ্যাপতি

---

(১) রসমধুর-ধ্বনিযুক্ত মাদল নামক বাদ্যযন্ত্র।

৮

বসন্ত-সখা

কল কোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে,
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী বাণী ৫
করিল রাজধানী অশোকমূলে;
কুসুমে পুনঃপুনঃ ভ্রমর গুন গুন,
মদন দিল গুণ ধনুক-হুলে;
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধু-মুদিত-মন ভারত ভুলে। ১০

— ভারতচন্দ্র

৬

বসন্তের প্রভাব

নব-মঞ্জু-রঞ্জন-পুঞ্জ-রঞ্জিত চূত-কানন সোহই[১] ;
রস-লোল[২] কোকিলা-কোকিল-কুল-কাকলী মন মোহই !
কুসুম-বিকাস হাস-বিলাস-সুললিত[৩] ; কমলিনী রসজৃম্ভিতা[৪],
মধু-পান-চঞ্চল-চঞ্চরীকুল-পদ্মিনী-মুখ-চুম্বিতা[৫] !

—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

——

(১) নূতন সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া আম্র-কানন শোভা পাইতেছে। (২) রসের আধিক্যে চঞ্চল। (৩) কুসুমকুল বিকশিত হইয়া হাস্যে ও বিলাসে সুললিত কান্তি ধারণ করিয়াছে। (৪) কমলিনী রসাধিক্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। (৫) কমলিনীর মধুপান করিয়া চঞ্চল ভ্রমরকুল দ্বারা পদ্মিনীর মুখ চুম্বিত হইতেছে।

৭

প্রীতিরহস্য

পীরিতি বলিয়া একটি কমল
রসের সায়র[১] মাঝে ;
প্রেম পরিমল- লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে।
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী ৫
তেঁই সে তাহার বশ ;
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী—
আনে করে অপযশ।

সই, একথা বুঝিবে কে ?
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে ১০
কেমনে ধরিব দে'[২] ?
ধরম করম লোক-চরচাতে[৩]
একথা বুঝিতে নারে ;
এ তিন আঁখর[৪] যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে। ১৫
কহে চণ্ডীদাস, শুন হে নাগরি,—
পীরিতি রসের সার ;
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার।

—চণ্ডীদাস

(১) সাগর। (২) দেহ। (৩) চর্চ্চাতে। (৪) অক্ষর।

৮

রস-সন্ধান

ভ্রমরা সমান আছে কত জন—
মধু-লোভে করে প্রীত ;
মধু পান করি' উড়িয়া পলায়,
এমতি তাহার রীত।
হেন ভ্রমরার সাধ্য নাহি কভু ৫
এ রস করিতে পান ;
রসিক যে জন জানয়ে কেবল
এ রস-সন্ধান।
সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে
সদাই দুখের ঘর ; ১০
আপন সুখেতে যে করে পীরিতি
তাহারে বাসিব পর।

—চণ্ডীদাস

৯

প্রেমের দুঃখ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল ;
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি, কি মোর কপালে লেখি ! ৫
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,—
ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে ;
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল, ১০
মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল ;
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের পীরিতি
মরমে রহল শেল। ১৫

—জ্ঞানদাস

১০

দুঁহে সে জানয়ে

কোন কোন রামা পীরিতি না জানে—
সে জন আছয়ে ভাল ;
মুঞি তো পীরিতি করিয়া মজিনু—
এ দেহ হইল কাল।
আনের পরাণ আনের অন্তরে, ৫
আমার পরাণ তুমি ;
তিল আধ তাই নয়নে না হেরি
মরণ বাসিয়ে আমি।
চণ্ডীদাস কহে এমন পীরিতি
শুনিতে জগৎ বশ ; ১০
দুঁহে সে জানয়ে দুঁহাকার তত্ত্ব
আনে কি জানয়ে রস ?

—চণ্ডীদাস

১১

নিগূঢ় রহস্য

মরম না জানে ধরম বাখানে—
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই, সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তাঁরা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ৫
ভিতর দুয়ার খোলা ;
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না, সজনি,—
আঁধার পেরিলে আলা !

—চণ্ডীদাস

১২

আকৃতি

রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি' কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি' থির নাহি বান্ধে ॥

—জ্ঞানদাস

১৩

অতৃপ্তি

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সেহো পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ।
জনম অবধি হম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল ;
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ।
কত মধু যামিনীয় রভসে[১] গমাওল[২]
ন বুঝল কৈসন কেল ;
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল ১০
তইঁও[৩] হিয়া জুড়ন না গেল ।
কত বিদগধ জন রস-অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ[৪] ;
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে ন মিলল এক । ১৫

—বিদ্যাপতি

---

(১) হর্ষে । (২) অতিবাহিত করিলাম । (৩) তথাপি । (৪) দেখি ।

১৪

মিলনে বিচ্ছেদ

এমন পীরিতি কভু দেখি নাহি শুনি—
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি।
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনু মীন যনু কবহুঁ না জীয়ে, ৫
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।

—চণ্ডীদাস

১৮

বয়ঃসন্ধি

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল ;
চরণ চপল-গতি লোচন লেল।
অব সব খনে রহু আঁচরে হাত ;
লাজে সখীগণ না পুছয়ে বাত।
শুনইতে রস-কথা থাপয়ে চিত— ৫
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনয়ে সঙ্গীত।
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ[১]—
কেও না মানয়ে জয় অবসাদ।
অব ভেল যৌবন-বঙ্কিম দিঠ[২] :
উপজল লাজ, হাস ভেল মিঠ। ১০
খনে খনে দশন ছটাছট হাস[৩] ;
খনে খনে অধর-আগে করু বাস।
চঙকি[৪] চলয়ে খনে, খনে চলু মন্দ
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ।

—বিদ্যাপতি

(১) বিবাদ। (২) দৃষ্টি। (৩) হাস্য। (৪) চমকিয়া। (৫) চেষ্টা।

F. 2

১৬

সঞ্চারিণী

যহা যঁহা পদযুগ ধরই
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই !
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ
তঁহি তঁহি বিজুরি-তরঙ্গ !
যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ !
যঁহা লহু হাস সঞ্চার
তঁহি তঁহি অমিয়-বিকার[১] !

— বিদ্যাপতি

(১) বিকিরণ ।

১৭

চকিত দর্শন

গোধূলি পেখল বালা
যব মন্দির বাহর ভেলা,—
নব-জলধর বিজুরি-রেহা[1]
দ্বন্দ্ব পসারিয় গেলা[2] ॥

ধনি অলপ-বয়সী বালা, ৫
জনি গাঁথলি পুহপ-মালা[3]।
থোরি দরশনে আশ না পূরল
রহল বিরহজ্বালা ॥

—বিদ্যাপতি

(১) রেখা। (২) সন্ধ্যার অন্ধকারের গায়ে গৌরী রাধা যেন নবমেঘের গায়ে বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় বিপরীতত্বের বিরোধ প্রসারিত করিয়া গেল। (৩) গ্রথিত পুষ্পমালা।

১৮

প্রিয় নাম

সই ! কে বা শুনাইল শ্যাম নাম !
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো !
আকুল করিল মোর প্রাণ !
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো—
বদন ছাড়িতে নাহি পারে— ৫
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো !
কেমনে পাইব, সই, তারে !

—চণ্ডীদাস

১৯

প্রথম প্রেম

(১)

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা !
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন-তারা ; ৫
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস[১] পরে,
যেমত যোগিনী পারা ।

(১) গৈরিক ।

(২)

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন ১০
কদম্ব-কাননে চায়।
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে ;
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়া পড়ে। ১৫

—চণ্ডীদাস

২০

চিত্তহারা

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল ;
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান—
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা,[১] ৫
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা।

—জ্ঞানদাস

(১) চন্দনের কোঁটার মাঝে মৃগনাভির কোঁটার ঈষৎ স্পর্শ।

২১

বাঁশী

কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি[1] ! কালিনী-নই-কূলে[2] ;
কে না বাঁশী বাএ[3] বড়ায়ি ! এ গোঠ গোকুলে ;—
আকুল শরীর মোর, বেয়াকুল মন ;
বাঁশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ[4] রন্ধন।
কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি ! সে না কোন জনা ! ৫
দাসী হয়াঁ তার পায়ে নিশিবোঁ[5] আপনা !
কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি ! চিত্তের হরষে—
তার পায়ে, বড়ায়ি, মো কৈলোঁ কোন্ দোষে !
আঝর ঝরয়ে মোর নয়নের পানী ,
বাঁশীর শবদেঁ, বড়ায়ি ! হারাইলোঁ পরাণী। ১০

—চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

(১) বড়-আই। (২) কালিন্দী নদী। (৩) বাজায়। (৪) বন্ধ হইয়া গেল। (৫) নিক্ষেপ করিব, সমর্পণ করিব।

২২

বন মাঝে কি মন মাঝে

সেই বন কতই দূর !

বন-পথ কভু দেখি নাই গো !

আমি রাজার মেয়ে রাজার ঝি—

বন-পথ কভু দেখেছি ?

যে বনে শ্যাম বাজায় বাঁশী ৫

মনে বলে দেখে আসি !

তোরা বলিস্ বাঁশী বনে বাজে—

বাঁশী বাজে আমার হৃদয়-মাঝে !

—অজ্ঞাত

২৩

মুরলীসঙ্কেত

মুরলী করাও উপদেশ[১]—
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম ?
কোন্ রন্ধ্রে 'রাধা' বলি' ডাকে আমার নাম ?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি ? ৫
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-শব্দে নাচে ময়ূরিণী ?
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত ?
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে, প্রাণনাথ ?
কোন্ রন্ধ্রে ষড়্ঋতু হয় এককালে ?
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে ? ১০
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ?
একে একে শিখাইয়া দেহ, শ্যামরায় !

—জ্ঞানদাস

(১) শিক্ষা দাও।

২৪

মিলনাভাস

সখি ! আজি কুদিন সুদিন ভেল !
মাধব মন্দিরে
আওব ত্বরিতে—
কপাল[১] কহিয়া গেল !
চিকুর ফুরিছে, ৫
বসন উড়িছে,
পুলক যৌবনভার !
বাম অঙ্গ আঁখি
সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার ! ১০
মুখের তাম্বুল
খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথায় ফুল।
চণ্ডীদাস কহে—
সব ভেল শুভ ১৫
বিহি আজি অনুকূল !

—চণ্ডীদাস

(১) অদৃষ্ট, ভাগ্য।

২৫

মিলনসৌভাগ্য

আজু রজনী হম ভাগে গমাওল[1]
পেখল[2] পিয়া-মুখ-চন্দা ;
জীবন যৌবন সফল করি' মানল,
দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা[3]।
আজু মঝু[4] গেহ, গেহ করি মানল, ৫
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা ;
আজু বিহি[5] মোয় অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা !
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা ; ১০
পাঁচ বান অব লাখ বান হউ,
মলয়-পবন বহু মন্দা ;
অব মঝু যব পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা ;
বিদ্যাপতি কহ অলপ-ভাগি[6] নহ— ১৫
ধনি ধনি[7] তুয় নব লেহা[8] !
—বিদ্যাপতি

(১) ভাগ্যে যাপন করিলাম। (২) দেখিলাম। (৩) নির্বন্ধ, প্রসন্ন। (৪) আমার। (৫) বিধি, বিধাতা। (৬) সামান্য ভাগ্যবতী। (৭) ধন্য ধন্য। (৮) স্নেহ, প্রীতি।

২৬

শরৎশ্রী

গাদলা[১] নাই ঝড়ি নাই,
কাশিয়ার[২] ফুল ফুটে।
নাচিয়া বেড়ায় খঞ্জনগুলা
ইতি উতি ছুটে॥
নদীর জল টলমল ৫
দেখা যায় ভালা।
মাথার উপর আকাশখানি
খালি সব নীলা॥
সাঁঝের বেলা পূরুব দিগে
ঝলক দিয়া চান্দ। ১০
আকাশের গায় উঠে অই,
কেমন তার ছান্দ[৩]॥

সিঙ্গাহারের[৪] ফুলে ফুলে
ঢাকিল সব বন।
সুবাস পায়া ঘরে থাকির[৫] ১৫
কারো না হয় মন॥

(১) বাদলা। (২) কাশ। (৩) ছাঁদ। (৪) হরশৃঙ্গার, শেফালিকা। (৫) থাকিবার, থাকিতে।

সব ঠাঁই ছড়ায় বাস
ফুরফুরা বায়।
লাখে লাখে ভ্রমরা উড়ে
যুতি[1] ফুলের গায়॥ ২০
এমন সময় নদীর কূলে
বাঁশীত দিল সান[2]
গলে মালা চিকণ কালা
করে রাধা রাধা গান॥

(২)

রূপসী যতেক ছিল ব্রজের বউরী[3]। ২৫
সকলে বাহির হৈল, কেহ নাই বৈরী॥
সকলি মিলিল আসি নিকুঞ্জের বনে।
ডালি ভরি' তুলি' ফুল আনে জনে জনে॥

—রতিরাম দাস

(১) যূথি, জুঁই। (২) সঙ্কেত। (৩) সংস্কৃত বধূটী, বধূ।

২৭

রাস

একে সে মোহন যমুনাকূল,
আরে সে কেলি- কদম্বমূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আরে সে শরদ-যামিনী !
ভ্রমর ভ্রমরী করত রাব, ৫
পিক কুহু কুহু করত গাব[১],
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর-বোলনী,
বিবিধ-রাগ-গায়নী !
বয়স কিশোর, মোহন ঠাম[২],
নিরখি' মূরছি' পড়ত কাম, ১০
সজল-জলদ- শ্যাম ধাম[২]
পিয়ল[৩] বসন দামিনি[৪] !
শাঙল ধবল কালি গোরী,
বিবিধ বসন বনি[৫] কিশোরী,
নাচত গায়ত রস-বিভোরী, ১৫
সবহু বরজ-কামিনী !

(১) গান। (২) দেহ। (৩) হরিদ্রাবর্ণ, 'পীতল'—'পীত' শব্দে বাংলা 'ল' প্রত্যয়। (৪) দামযুক্ত, মাল্যভূষিত। (৫) সজ্জিত হইল।

নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল,
ঝনন-ননন নটন লোল,
হাসি হাসি কেহ করত কোল
ডালি ডালি দোলনী! ২০
বলরাম দাস পঢ়ত তাল,
গাওত মধুর অতি রসাল,
শুনত শুনত জগত উমত,
হৃদয়-পুতলি-দোলনি।

বলরাম দাস

২৮

ফুলবিলাস

ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু
ফুলময় আভরণ, করে ফুলধনু ॥
ফুলময় ক্ষিতিতল, ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুলপুঞ্জ ॥
ফুলতনু হেরি মুগধ ফুলবাণ। ৫
ফুলশরে হানল ফুলময় কান ॥
ফুলে উয়ল (১) বন, ফুলবায় মন্দ।
ফুলরসে গুঞ্জয়ে মধুকরবৃন্দ ॥
অপরূপ ফুলদোল, ফুলবিলাস।
ফুল করে (২) রহু যদুনন্দন-দাস ॥ ১০

—যদুনন্দন-দাস

(১) উজ্জ্বল। (২) ফুল হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত ভক্তকবি প্রস্তুত রহিয়াছেন।

২৯

ফাগ খেলা

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে,
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে।
কানু ফাগ দেয়ল সুন্দরী-অঙ্গে —
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে।
ফাগু-রঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া   ৫
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া।
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে,
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে।
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে, রাঙ্গা কোকিল গায় ;
রাঙ্গাফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়।   ১০
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি—
গগন ভুবন দিগ্‌বিদিগ না জানি।
"রতি জয়, রতি জয়" দ্বিজকুলে[১] গায় ;
জ্ঞানদাস-চিত-নয়ন জুড়ায়।

—জ্ঞানদাস

(১) পক্ষীসকল।

৩০

অভিসার-সাধন

কণ্টক গাড়ি' কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি[1] ঝাঁপি ;
গাগরী-বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি ৫
দূরতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে,
মন্দিরে যামিনী জাগি।
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক[2] আশে ;
কর-কঙ্কণ-পণ[3] ফণিমুখ-বন্ধন[4] ১০
শিখই ভুজগ-গুরু[5] পাশে।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই,—
আন শুনই, কহ আন ;
পরিজন-বচন মুগধ সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ। ১৫

—গোবিন্দদাস

(১) বস্ত্রদ্বারা। (২) প্রয়াণের। (৩) হাতের কঙ্কণ পণ বা মূল্য দিয়া। (৪) সর্পের মুখ বন্ধনের মন্ত্র ও ঔষধ, যাহাতে সাপের গায়ে পা পড়িলেও সে দংশন করিতে না পারে। (৫) সাপের ওঝা।

৩১

ঝর ঝর জলধর-ধার

ঝর ঝর জলধর-ধার ;
ঝঞ্ঝা পবন বিথার[১] ;
ঝলকত দামিনীমালা,
ঝামরি[২] ভৈ গেল বালা।
ঝুঠ কি কহব কানাই, ৫
ঝুরত[৩] তুয়া বিনু রাই।
ঝন ঝন বজর-নিশানে[৪]
ঝাঁপি রহত দুই কানে।
ঝিঙ্গি-ঝঙ্কর[৫] রাতি,
ঝঙ্ক[৬] সহনে নাহি যাতি। ১০

—গোবিন্দদাস

(১) বিস্তার। (২) ক্ষীণ, মলিন। (৩) ক্রন্দন করিতেছে। (৪) নিঃস্বনে, শব্দে। (৫) ঝিল্লি-ঝঙ্কৃত। (৬) ঝঙ্কার, জঞ্জাল।

৩২

বিলম্বিতা

"ঘরের ঘরণী জগৎমোহিনী
প্রত্যুষে যমুনায় গেলি ।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসে বিলম্ব করিলি ॥"
"প্রত্যুষ বেহানে কমল দেখিয়া ৫
পুষ্প তুলিবারে গেলুম ।
বেলা উদানে কমল মুদনে
ভ্রমরদংশনে মৈলুম ॥
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে
করের কঙ্কণ গেল । ১০
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল ॥
সীঁথের সিন্দুর নয়নের কাজল
সব ভাসি' গেল জলে ।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর ১৫
দারুণি পদ্মের নালে ॥"

—আলওয়াল

৩৩

বিরহে মিলন

মেওয়া মিশ্রী সকল মিঠা
মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ
শীতল ডাবের জল॥
তার থাক্যা মিঠা দেখ ৫
দুঃখের পর সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন
ভরে খালি বুক॥
তার থাক্যা মিঠা যদি
পায় হারানো ধন। ১০
তার থাক্যা অধিক মিঠা
বিরহে মিলন॥

—ময়মনসিংহ-গীতিকা

৩৪
ভাদর-বিরহ

সখি হে, হমর দুখক নহি ওর রে।
ই ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর রে॥
ঝম্পি[1] ঘন গর- জন্তি সন্ততি[2]
ভুবন ভরি' বরসন্তিয়া। ৫
কান্ত পাহুন[3] বিরহ দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ-কত-শত- পাত-মোদিত[4]
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহুরি[5] ডাকে ডাহুকি,[6] ১০
ফাটি' যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি' ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাওব
হরি বিনু দিন-রাতিয়া॥ ১৫

— বিদ্যাপতি

(১) ঘন অর্থাৎ মেঘ ঝাঁপিয়া আসিয়াছে। (২) চতুর্দ্দিকে বা সতত। (৩) প্রবাসী। (৪) আনন্দিত। (৫) ভেক, বেঙ। (৬) ডাহুক পাখী।

৩৫

বাসকসজ্জা

দ্বারের আগে ফুলের বাগ
কি সুখ লাগিয়া রুইনু;
মধু খাইতে খাইতে ভ্রমর মাতল
বিরহ-জ্বালাতে মৈনু।
জাতি[1] রুইনু যূথী রুইনু ৫
রুইনু গন্ধমালতী;
ফুলের বাসে নিদ নাহি আসে—
পুরুষ নিঠুর জাতি!

—চণ্ডীদাস

৩৬

অভিশাপ

সই, কেমনে ধরিব হিয়া!
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া•
এমতি করিল কে? ৫
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে!

—চণ্ডীদাস

(১) জাতি-ফুল।

৩৭

আশাহতা

সজনি, কে কহ আওব মধাই ?

বিরহ-পয়োধি- পার কিয়ে পাওব

মঝু মনে নহি পতিয়াই[১]।

এখন তখন করি দিবস গমাওল,

দিবস দিবস করি মাসা ; ৫

মাস মাস করি বরষ গমাওল

ছোড়লুঁ জীবনক আশা।

বরষ বরষ করি সময় গমাওল,

খোয়লুঁ তনুক আশে ;

হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব[২] ১০

কি করব মাধবীমাসে ?

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি

অব নহি হোত নিরাশ ;

সে ব্রজনন্দন হৃদয়-আনন্দন

ঝটিতে মিলব তুয় পাশ ! ১৫

— বিদ্যাপতি

(১) প্রত্যয় বা বিশ্বাস হয়। (২) জীর্ণ করিবে, নষ্ট করিবে।

৩৮

শ্যাম-শুকপাখী

শ্যাম-শুকপাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়নফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেমসুধানিধি দিয়ে 5
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়ে আকুষি[১]
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে ১০
কুব্জা রেখেছে ধ'রে॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব তজবিজে[২]
পেতে পারে কি না পারে॥ ১৫

—চণ্ডীদাস

(১) আকষী, শিকল। (২) গোচরে, সকাশে।

৩৯

মরণান্তে

মরিব মরিব, সখি, নিচয় মরিব!
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব?
তোমরা যতেক সখী থেকো মঝু সঙ্গে,
মরণ-কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে।
ললিতা প্রাণের সখি, মন্ত্র দিয়ো কানে,
মরা দেহ পড়ে জনু কৃষ্ণ নাম শুনে।
না পুড়াইও রাধার অঙ্গ, না ভাসাইও জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে,
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে!
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বরনারি,
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি।

বিদ্যাপতি (। [illegible])

৪০

জন্মজন্মান্তরে

বঁধু, কি আর বলিব আমি !
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি !
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী : ৫
আমি সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে :—
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই— ১০
দাঁড়াব কাহার কাছে ?
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায় ?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়। ১৫

—চণ্ডীদাস

৪১

অভেদাত্মা

ওহে পরাণ-বঁধু তুমি।
কি আর বলিব আমি॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার॥
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব। ৫
তোমারে তোমার দিয়া তোমার হইয়া রব॥

—সৈয়দ মর্ত্তুজা

৪২

শরীরাতীত

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল![১]
না সো রমণ, না হম রমণী—
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি![২]
এ সখি! সো সব প্রেম-কাহিনী
কানু-ঠামে কহবি বিছুরহ জানি।[৩]

—রামানন্দ রায়

(১) প্রথমে দেখিবা মাত্র অনুরাগ উৎপন্ন হইল এবং দিনে দিনে বাড়িয়া অসীম হইয়া গেল। (২) তন্ময়তাতে এখন আর আমাদের ভিন্ন-ভাব নাই, মনোভব যেন দুজনের মন পিষিয়া এক করিয়া দিয়াছে। (৩) কানুর স্থানে সব বলিবে, কিছু যেন বিস্মৃত হইও না।

৪৩

অচ্ছেদ্য মিলন

ললিতার কথা শুনি   হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই—
"আমারে ছাড়িয়া শ্যাম   মধুপুরে যাইবেন
এ কথা তো কভু শুনি নাই।
হিয়ার মাঝারে মোর   এ ঘর মন্দির গো,   ৫
রতন-পালঙ্ক বিছা[১] আছে ;
অনুরাগের তুলিকায়[২]   বিছান হয়েছে, তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে।
তোমরা যে বল, শ্যাম   মধুপুরে যাইবেন,
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে ?   ১০
এ বুক চিরিয়া যবে   বাহির করিয়া দিব
তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে !"
শুনিয়া রাইয়ের কথা   ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময় ;
চণ্ডীদাসের মনে   হরষ হইল গো   ১৫
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়।

—চণ্ডীদাস

(১) বিছানো। (২) তোষককে।

৪৪

পঞ্চবটীর গুহায়

কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া ;
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া।
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন,
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ।

একদিন গুহামধ্যে, পঞ্চবটী বনে,
ভিক্ষা হতে এসে মুঞি দেখি সঙ্গোপনে, —
নিথর, নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন,
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন,
ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর—
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ সুন্দর!
অঙ্গ হইতে বাহির হইছে তেজোরাশি,
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী!

— গোবিন্দদাস

(১) গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে

৪৮
নীলগিরি

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে—
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে।
কতশত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়;
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়।
বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া ৫
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া।
ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল—
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল।
পর্ব্বতের নিয়ড়েতে[1] ঘুরিয়া বেড়াই;
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই। ১০
কত শত লতা, বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন,
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি-বন্ধন।
ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে,
নানা জাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে।
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা; ১৫
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা।
রজনীতে কত লতা[2] ধগ্‌ধগি জ্বলে;
গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে।

(১) নিকটে। (২) ওষধি, স্বয়ংপ্রভা লতা।

ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে ;
তার ধারে ব'সে প্রভু[1] সন্ধ্যাপূজা করে। ১০

গোবিন্দদাস

৪৬
কন্যাকুমারী

তাম্রপর্ণী[2] পার হয়্যা, সমুদ্রের ধারে,
প্রভু কন্যাকুমারী চলিলা দেখিবারে।
পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই—
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই!
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর ; ৫
কি কব অধিক কথা সকলি সুন্দর।
দেখিবার কিছু নাই, তথাপি শোভন—
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন!

গোবিন্দদাস

(১) মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। (২) নদীর নাম।

৪৭

গোরার নয়ন

হরি হরি, গোরা কেন কান্দে !

নিজ সহচরগণ পুছই কারণ

হেরই গোরা-মুখ-চান্দে ।

অরুণিত লোচন প্রেমভরে ভেল দুন[1]

ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি ; ৫

ঐছন শিথিল গাঁথিল মতিফল[2]

খসয়ে উপরি উপরি ।

—বাসুদেব ঘোষ

(১) দ্বিগুণ । (২) গ্রথিত মুক্তাগুলি

৪৮

প্রিয়হারা

শুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত,
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা[1] করিয়া কান্দে কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
শচীর মন্দির কাছে গেল॥
শচীর মন্দিরে আসি' দুয়ারের কাছে বসি' 5
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়নমন্দিরে ছিল, নিশা-অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু-নয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা। 10
আলুথালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধুর মুখে কথা॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতিউতি,
কোনো ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে 15
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
তা-শুনি নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে-তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে ধায়, দশ জনে পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥ 20

— বাসুদেব ঘোষ

(১) করুণস্বরে।

৪৯

রামীর বিরহ

তুমি দিবাভাগে লীলা-অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটী[1] সম কাল মানি সুজঞ্জাল ৫
যুগ-তুলা হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে মন স্থির নহে,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল কত সুনির্ম্মল
শ্রীমুখমণ্ডলশোভা। ১০
হেরি হয় মনে এ দুই নয়নে
নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয় প্রাণনাথ বিনা ১৫
জগৎ দেখি আঁধার॥

—রামী

(১) পঞ্চক্ষণ পরিমিত কাল।

E. 4

৫০

ভক্তি-ব্যাকুলতা

আজ হাম পেখলুঁ[১] নবদ্বীপ চন্দ,
করতলে করই বয়ান অবলম্ব।
পুনপুন গতাগতি কর ঘর পন্থ,
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত[২]।
ছল ছল নয়ন-কমলে সুবিলাস[৩]
নব নব ভাব করত পরকাশ।
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ[৪]।
এ রাধামোহন কছু না পাওল থেহ[৫]।

রাধামোহন

(১) দেখিলাম (২) একাকী, একমনে। (৩) স্ফুরণ, শোভা, প্রকাশ। (৪) পুলক (রোমাঞ্চ)-রূপ মুকুল তাঁহার দেহতরু পূর্ণ করিল। (৫) অন্ত, স্থির-নির্ণয়।

৫৯

নৃত্যশ্রী

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি[1]
অবনী বহিয়া যায় ;
ঈষৎ-হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায় ।
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া ৫
নাচিয়া নাচিয়া যায় ;
নয়ন-কটাখে বিষম বিশিখে[2]
পরাণ বিন্ধিতে ধায় ।
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে ; ১০
উড়িয়া পড়িয়া মাতল[3] ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ।
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে ;
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল ১৫
না কহি লোকের লাজে ।

—গোবিন্দদাস

(১) লাবণ্য । (২) বাণ । (৩) মত্ত

৫২

গোচারণ

আজু বনে আনন্দ-বাধাই[1]।

পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইল ভোলা,—

দূর বনে গেল সব গাই।

ধেনু না দেখিয়া বনে স্থকিত[2] রাখালগণে,

শ্রীদাম, সুদাম আদি সবে ; ৫

কানাই বলিছে, "ভাই, খেলা ভাঙ্গা যাবে নাই,

আনিব গোধন বেণুরবে !"

সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া,

ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে ;

শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব ১০

পুচ্ছ ফেলি' পিঠের উপরে।

ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি'

দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে ;

দুগ্ধ স্রবি' পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে,

স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে। ১৫

—প্রেমদাস

(১) আনন্দবর্দ্ধন (২) স্থগিত, স্তম্ভিত।

কালকেতু

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু[১]।
জিনিয়া মাতঙ্গ গতি　　যেন নব রতিপতি
সভার লোচন-সুখ-হেতু।
নাক মুখ চক্ষু কান　　কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল ;　　৫
গুণ শীল রূপ বাড়া[২],　　যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল।
বিচিত্র কপালতটি　　গলায় জালের কাঁঠি
করযুগে লোহার শিকলী ;
বুক শোভে বাঘনখে　　অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে[৩]　　১০
তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলী।
কপাট-বিশাল বুক,　　জিনি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ-দীঘল বিলোচন ;
গতি জিনি গজরাজ　　কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন।　　১৫
দুই চক্ষু জিনি নাটা[৪]　　ঘুরে যেন কড়ি-ভাটা[৫]
কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল,
পরিধান বীরধড়ি[৬]　　মাথায় জালের দড়ী
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল।

(১) চণ্ডীর পূজা-প্রবর্ত্তক এক মহাবীর ব্যাধ (কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' দ্রষ্টব্য)। (২) অধিক। (৩) যোদ্ধারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে গায়ে রাঙ্গা ধূলা মাখিয়া লয়, যেন রক্তপাত হইলে শীঘ্র জানিতে না পারে। (৪) নাটা করঞ্জার (নক্তমাল) ন্যায় আরক্ত। (৫) গোলা। (৬) বীরের পরিধেয় ধটি বা কাপড়।

লইয়া ফাউড়া[১] ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা ২০
তার হয় জীবন সংশয় ;
যে জনে আঁকড়ি করে পড়য়ে ধরণী'পরে
ভয়ে কেহ নিয়ড়ে না রয় ।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে তাড়িয়া শশারু[২] ধরে,
দূরে গেলে ছুবায়[৩] কুকুরে, ২৫
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে লতায় জড়িয়া বান্ধে—
কান্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ।

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

৫৪

চাঁদ ধরা

গিরিবর, আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে !
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা "ধ'রে দে উহারে !"
কাঁদিয়ে ফুলাল' আঁখি মলিন ও মুখ দেখি' ৫
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ।

(১) দাণ্ডাগুলি (কউড়া, সংস্কৃত 'পর্ব্ব,' বাঁশের এক 'পাব') । (২) শশকরূপ জন্তু । (৩) লেলাইয়া দেয় ।

"আয়, আয়, মা, মা" বলি' ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়—"চাঁদ কি রে ধরা যায় ?"—
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে। ১০
উঠে বসে গিরিবর, করি' বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে'
সানন্দে কহিছে হাসি'—"ধর, মা, এই লও শশী।"—
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ ১৫
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

—রামপ্রসাদ সেন

৫৫

ননীচোরা

হেদে গো রামের মা, ননীচোরা গেল এই পথে ?
নন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে
সাজাই[১] করিব ভালো মতে ॥
শূন্য ঘরখানি পায়্যা সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি। ৫

(১) শাস্তি।

অঙ্গুলির চিনাগুলি[১] বেকত[২] হইবে বলি'
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানি ॥
ক্ষীর ননী ছেনা চাঁচী উভ করি শিকাগাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মথনদণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড ১০
নামতে[৪] থাকিয়া মুখ পাতে ॥
যশোদার মুখ হেরি' রোহিণী দেখায় ঠারি'
যে ঘরে আছয়ে যাদুমণি।
ঘর-আঁধিয়ারে পশি' বেকত হইল শশী,
ধাইয়া ধরিল নন্দরাণী ॥ ১৫

—যদুনাথদাস

৫৬

উমার বাল্যক্রীড়া

নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা,
রূপের নাহিক সীমা।
পঞ্চম বরিষ কালে,
কর্ণবেধ কুতূহলে।
নানা আভরণ অঙ্গে, ৫
সম-বয়সীর সঙ্গে,—

(১) চিহ্নগুলি। (২) ব্যক্ত। (৩) ঊর্দ্ধ। (৪) নিয়ে।

যশোদা, রোহিণী, রমা,
চিত্রলেখা, তিলোত্তমা,
হীরা, জীরা, সরস্বতী,
হরিপ্রিয়া, হৈমবতী, ১০
কৌশল্যা, বিজয়া, জয়া,
পদ্মাবতী, সতী, ছায়া,—
হরিষ হইয়া মনে,
সবাকার মধ্যমানে,
ধূলায় মন্দির করি ১৫
বকুলের তলে গৌরী,
ধূচানি, কুলাটি পাতি
সঙ্গে জয়া হৈমবতী।
রাঙ্গা ভাঁড়, রাঙ্গা টাটি,
রন্ধনের পরিপাটী; ২০
ধূলার ওদন[১] করি
সবাকারে দিলা গৌরী;
মিছা সে ভোজন-সুখে,
হাত না পরশে মুখে;
আচমন মিছা-জলে; ২৫
'তাম্বুল দেওনা' বলে।

(১) ভাত।

সকলে বালিকা-বুদ্ধি,
পাতখোলা মুখশুদ্ধি।
দণ্ডে দণ্ডে দিবা নিশি
আনন্দ-সাগরে ভাসি;
কেহ দেয় ছড়া ঝাঁটি,
যেন গৃহস্থের বাটী।

সহদেব চক্রবর্ত্তী

৫৭

ঘুম-পাড়ানীয়া গান

আয়, আয় রে, বাছা আয়!
কি লাগিয়া কান্দে বাছা? কি ধন চায়?
তুলিয়া আনিব গগন-ফুল,
একেক ফুলের লক্ষেক মূল;
সে ফুল গাঁথিয়া দিব যে হার— ৫
প্রাণের বাছা মোর, না কান্দ আর।
গগনমণ্ডলে পাতিব ফান্দ,
ধরিয়া আনিব গগন-চান্দ;
সে চান্দ আনি' তোরে পরাব ফোঁটা;
কালি গড়ায়ে দিব সোনার ভেঁটা। ১০

রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া,
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া ;
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনা'র নায়,
কুঙ্কুম কস্তুরী মাখাব গায় ;
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায় ১৫
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দ গায়।

— কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

৫৮

সতীহারা

মহারুদ্র-রূপে মহাদেব সাজে :
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে !
লটাপট্ট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল-টলট্টল-কলক্কল-তরঙ্গা :
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ণ গাজে : ৫
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে !
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে :
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে :
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা :
কটিকট্ট সদ্যোমরা হস্তীছালা ; ১০

পচাচর্ম্ম ঝুলী কাঁধে লোল ঝুলে ;
মহা ঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে !
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে .
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা 15
হুহুঙ্কার হাঁকে, উড়ে সর্পবাণা ;
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী,
মহাকাল, বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী :
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে,
চলে শাঁখিনী পেতিনা মুক্তকেশে : 20
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে—
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ।
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে—
"অরে রে, অরে দক্ষ, দে রে সতীরে !"

—ভারতচন্দ্র

৫৯

পরিচয়

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে—
"পার কর," বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি'।
ঈশ্বরীরে[১] জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী, ৫
"একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি ?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ;
ভয় কবি কি জানি কে দিবে ফেরফার[২]।"
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
"বুঝহ ঈশ্বরী[৩] আমি পরিচয় করি ; ১০
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ;
গোত্রের প্রধান[৪] পিতা মুখবংশ-জাত[৫] ;
পরম কুলীন[৬] স্বামী বন্দ্যবংশ[৭] খ্যাত ;

(১) দেবী অন্নপূর্ণাকে। (২) বিপদে ফেলিবে। (৩) দুই অর্থ—ঈশ্বরী পাটনী তুমি বুঝিয়া দেখ : আমাকে ঈশ্বরী বা দেবী বলিয়া জানিও। (৪) দুই অর্থ— কুল-শ্রেষ্ঠ : গোত্র বা পর্ব্বত-মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হিমালয় : গো অর্থাৎ পৃথিবীকে যাহা ভূমিকম্প হইতে (চাপিয়া রাখিয়া) ত্রাণ বা রক্ষা করে। (৫) দুই অর্থ—মুখোপাধ্যায়-বংশীয় : শ্রেষ্ঠ বংশে উৎপন্ন। (৬) দুই অর্থ, দ্বিতীয় অর্থ বাক্যময় (কু=বাক্য)। (৭) দ্বিতীয় অর্থ— পূজনীয়।

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ; ১৫
অনেকের পতি[১] তেঁই, পতি মোর বাম[২] :
অতি বড়[৩] বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে[৪] নিপুণ—
কোন গুণ নাহি তার[৫] কপালে আগুন[৬] !
কুকথায়[৭] পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ[৮],
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব[৯] অহর্নিশ ; ২০
গঙ্গা নামে সতা[১০], তার তরঙ্গ এমনি
জীবন-স্বরূপা[১১] সে স্বামীর শিরোমণি[১২] ;
ভূত[১৩] নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ[১৪] বাপ ! দিল হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই[১৫]। ২৫
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই ॥”

(১) দ্বিতীয় অর্থ—জগদীশ্বর। (২) দুই অর্থ—বিমুখ, প্রতিকূল বামদেব, স্বয়ম্ভূ, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ। (৩) দ্বিতীয় অর্থ—অনাদি পুরুষ। (৪) দ্বিতীয় অর্থ—যোগসিদ্ধ অথবা সিদ্ধিদাতা। (৫) দ্বিতীয় অর্থ—নির্গুণ ব্রহ্ম। (৬) দ্বিতীয় অর্থ—তৃতীয় নেত্র। (৭) কু—বাক্য : বাঙ্ময়। (৮) দ্বিতীয় অর্থ—নীলকণ্ঠ। (৯) দ্বিতীয় অর্থ—অভেদাত্মা। (১০) সপত্নী। (১১) দ্বিতীয় অর্থ—জলময়ী (জীবন=জল)। (১২) দ্বিতীয় অর্থ—জটায় বিরাজিতা। (১৩) দ্বিতীয় অর্থ—ভূত=পঞ্চভূতাত্মক দেহধারী সৃষ্ট পদার্থ ও জীব ; ইহাদিগকে লইয়া সর্ব্বত্র লীলা করিয়া ফিরেন। (১৪) দ্বিতীয় অর্থ—অমর, প্রস্তরময় হিমালয়। না মরে=অমর মরে না। (১৫) মৈনাক পর্ব্বত। ইন্দ্র সকল পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন করিলে মৈনাক অপমানের ভয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেন।

পাটুনী বলিছে--"আমি বুঝিনু সকল—
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।
শীঘ্র আসি নায়ে চড়। দিবা কিবা বল' ?"
দেবী কন,—"দিব ; আগে পারে ল'য়ে চল'।" ৩০
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ—
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটুনী বলিছে,—"মাগো, বৈস ভাল হ'য়ে,
পায়ে ধরি' কি জানি কুম্ভীরে যাবে ল'য়ে।"
ভবানী কহেন,—"তোর নায়ে ভরা জল,— ৩৫
আলতা ধুইবে—পদ কোথা থুব বল্।"
পাটুনী বলিছে—"মাগো, শুন নিবেদন—
সেঁউতি[1] উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।"
পাটুনীর বাক্যে মাতা, হাসিয়া অন্তরে
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে। ৪০
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।
সোনার সেঁউতি দেখি পাটুনীর ভয়—
"এ ত মেয়ে মেয়ে নয়—দেবতা নিশ্চয়।"
তীরে উত্তরিলা তরী, তারা উত্তরিলা, ৪৫
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।

- ভারতচন্দ্র

(১) সেঁউতি—সেচনী।

৬০

দরিদ্র ফুল্লরা

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী—
ভাঙ্গা কুঁড়েঘর, তাল-পাতার ছাউনী।
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্যঘরে,
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।
বৈশাখে অনল-সমান বসন্তের খরা,[১] ৫
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা[২]।
পায় পোড়ে[৩] খরতর রবির কিরণ;
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন[৪]।
বৈশাখ হ'ল বিষ গো, বৈশাখ হ'ল বিষ—
মাংস নাহি খায়—সর্ব্বলোক নিরামিষ[৫]। ১০
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস,
বেঙচের ফল[৬] খেয়ে করি উপবাস।
আষাঢ় পূরিল মহী, নব মেঘে জল,
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।
মাংসের পসরা ল'য়ে ফিরি ঘরে ঘরে, ১৫
কিছু খুদ কুঁড়া পাই— উদর না পূরে।

(১) রৌদ্র। (২) দোকান। (৩) পা'কে পোড়ায়। (৪) একপ্রকার কর্কশ রেশমী কাপড়। (৫) বৈশাখ মাসে আমিষ ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। (৬) বেঁচ নামক বন্য ফল।

শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী,
সিতাসিত[1] দুই পক্ষ একই না জানি।
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে, পড়ে মাংস-জল,—
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল ২০
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি—
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী[2]।
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল—
সকলে দরিদ্র বীর অন্নেতে বিরল।
কিরাত-নগরে বসি, না মিলে উধার[3], ২৫
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,—
বৃষ্টি হইলে কুঁড়েয় ভেসে যায় বান।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে,
ছাগ মেষ মহিষ করয়ে বলিদানে। ৩০
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা,
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।
মাংস কেহ না আদরে, মাংস কেহ না আদরে,
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম, ৩৫
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।

(১) শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ। (২) দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি সাপও দংশন করে না যে দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। (৩) উদ্ধার, ধার, ঋণ।

নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়,
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়[১]।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। ৪০
পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজন,
তুলি[২] পাড়ি[৩] পাছুড়ি[৪] শীতের নিবারণ।
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা[৫],
উড়িতে[৬] সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটী, ৪৫
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী[৭]।
সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে,
পোড়য়ে রমণীগণ বসন্ত-বাতাসে।
যুবতী-পুরুষ-অঙ্গ পোড়ায় মদনে,
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে। ৫০
অনল সমান পোড়ে চৈতের খরা,
চালু সেরে[৮] বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা;
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
আমানি খাবার গর্ত্ত[৯] দেখ বিদ্যমান।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(১) মৃগচর্ম্ম। (২) তুলা ভরা লেপ। (৩) পাড়িয়া বা পাতিয়া শয়ন করিবার তোষক। (৪) প্রচ্ছদ, গাত্রাবরণ। (৫) মোটা খসখসে কাপড়। (৬) গায় দিতে। (৭) সংস্কৃত আখেটিক, ব্যাধ। (৮) এক সের চালের বদলে। (৯) কারণ পান করিবার কোন পাত্র নাই মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তাহা হইতে খাইতে হয়।

৬৭

বিদায়-কালে

না যাইও, না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর—
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ?
নিদের স্বপনে, রাজা, হবে দরশন :
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত—নাই প্রাণের ধন !
দশ গৃহের মা-বহিন রবে স্বামী লইয়া কোলে, ৫
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে।
জীয়ব, জীবন-ধন, আমি কন্যা সঙ্গে গেলে :
বান্ধিয়া দিমু অন্ন (তোমার) ক্ষুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানী ;
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী। ১০
শীতলপাটী বিছাইয়া দিমু, বালিসে হেলান পাও ;
হাউস[১] রঙ্গে যাঁতিমু[২] হস্ত পাও।
গ্রীষ্মকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখা[৩] বাও,
মাঘ মাসের শীতে ঘেঁসিয়া রমু গাও।

—ময়নামতীর গান

(১) সংস্কৃত আবেশ, আরবী হাওয়াস—ইচ্ছা, আসক্তি। (২) চাপিয়া দিব।
(৩) দণ্ডযুক্ত পাখা।

৬২

পথে নারী বিবর্জ্জিতা

"আমার সঙ্গে যাবু, রাণি—পন্থের শোন কাহিনী,
খিদা লাগ্‌লে অন্ন পাবু না, পিয়াস লাগ্‌লে পানী।
শালবন শিমুলবন চলিতে মান্দার;
যে দিকে হাঁটে হাড়ি-গুরু[1] দিনতে আন্ধার[2]।
স্ত্রী আর পুরুষে যদি পান্থ বাইয়া যায় ৫
হেন বা দুষ্টের বাঘ আছে নারী ধরি' খায়।
খাইবে না খাইবে বাঘে ফ্যালাবে মারিয়া,
বৃথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে যাইয়া?"
রাণী কইছে, "শুন, রাজা, রসিক নাগর,
কায় কয় এগিলা[3] কথা, কে আর পইতায়[4]? ১০
এমন দুষ্ট বনের বাঘ স্ত্রী পুরুষ বাছিয়া খায়!
থাক্‌না ক্যানে বনের বাঘ, তাক না করি ডর—
নিষ্কলঙ্ক মরণ হউক সোয়ামির পদের তল।"

—গোপীচন্দ্রের গান

(১) গুরু হাড়িপা। (২) নিবিড় বনে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না (৩) এই-গুলা, এই-সকল। (৪) পত্যায় করে।

৬৩

ঠাকুরঝি

ঠাকুরঝি!
কি জন্য এমন কর রে ঠাকুরঝি?
একই খেলা খেলেছিলাম
ঠাকুরঝি গো।
তোমার মালা আমি পরাইয়া দিলাম যে ৫
ঠাকুরঝি,
দাড়িম্বের গাছে রে;
আমি তুমি জল আনিতে গিয়াছিলাম যে
ঠাকুরঝি,
সাধু সরোবরের জলে; ১০
একই দুধের বাটিতে, ঠাকুরঝি,
তুমি আমি খাইলাম যে তোমার পরসাদ রে;
একই আঁচল গায় দিয়া, ঠাকুরঝি,
আমরা কইলাম মনের কথা, মনের সাধ রে;
একই বিছানায় শুয়ে, ঠাকুরঝি ১৫
তোমার আমার নিশির বাতি গেছে রে
ঠাকুরঝি!

অজ্ঞাত

৬৪

মাতা যশোদা

মরি বাছা ছাড় রে বসন!
কলসী উলাইয়া[১]
তোমারে লইব এখন।
মরি তোমার বালাই লইয়া, আগে আগে চল ধাইয়া ৫
ঘাঁঘর নূপুর
কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে খেলাইও ছিদাম-সাথে
ঘরে গেলে
দিব ক্ষীর ননী।
মুই রইনু তোমা লইয়া গৃহকর্ম্ম গেল বইয়া ১০
মোর হইবে
কেমন উপায়,
কলসী লইয়া কাঁখে —ছাড় রে অভাগী মাকে—
হের, দেখ,
ধবলী পিয়ায়! ১৫

নরসিংহদাস

(১) নামাইয়া।

৬৫

সুন্দরী সন্দর্শন

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়॥
এই তো কেশ কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল॥
ডাগল দীঘল আঁখি যার পানে চায়। ৫
একবার দেখিলে তারে পাগল হইয়া যায়॥
এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি কর্‌ল মন॥
জাগিয়া দেখেছি কিবা নিশির স্বপন।
কার ঘরের সুন্দর নারী, কার পরাণের ধন॥ ১০
জলের না পদ্মফুল, শুকনায় ফুটে রইয়া।
আস্‌মানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া॥

—ময়মনসিংহ-গীতিকা।

৬৬

ফুল তোলা

বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে
মালতী বকুল ;
অঞ্চল ভরিয়া তুল্‌ব
তোমার মালার ফুল।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে ৫
রক্তজবা সারি ;
তোমারে করিব পূজা
প্রাণে আশা করি।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে
মল্লিকা মালতী : ১০
জন্মে জন্মে পাই যেন
তোমার মতন পতি।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে
কেতকী দুস্তর :
কি জানে লেখ্যাছে বিধি ১৫
কপালে আমার।

—নয়নচাঁদ ঘোষ
(ময়মনসিংহ-গীতিকা)

৬৭

প্রেমসঞ্চার

যে দিন হইতে দেখছি[1], বন্ধু

তোমায়

মৈষালের বাড়ী ;—

সেই দিন হইতে, বন্ধু,

আরে বন্ধু, ৫

পাগল হইয়া ফিরি।

আমি অন্ধাইরে ডুবাইছে[2], বন্ধু,

আরে বন্ধু,

চন্দ্র সূর্য্য তারা ;

তোমারে দেখিয়া, বন্ধু, ১০

আরে বন্ধু,

হৈছি আপন-হারা।

বাইরেতে শুনিলে, বন্ধু,

আরে বন্ধু,

তোমার পায়ের ধ্বনি ;

(১) দেখিয়াছি। (২) ডুবাইয়াছি।

ঘুম হইতে জাইগা উঠি, বন্ধু

আরে বন্ধু,

আমি অভাগিনী।

বুক ফাটিয়া যায় রে বন্ধু,

আরে বন্ধু, ২০

মুখ ফুটিয়া না পারি ;

অন্তরের আগুনে, বন্ধু

আমি

জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি।

পাখী যদি হইতা রে বন্ধু, ২৫

আরে বন্ধু,

রাখ্‌তাম হৃদ্‌পিঞ্জরে ;

পুষ্প হইলে বন্ধু,

আরে বন্ধু,

গাইথা রাখ্‌তাম তোরে। ৩০

চান্দ যদি হইতা রে, বন্ধু,

আরে বন্ধু,

জাইগা সারা নিশি

চান্দ-মুখ দেখিতাম, বন্ধু,

আরে বন্ধু, ৩৫

নিরালায় বসি'।

বাটা ভরি বানাইয়া পান, রে বন্ধু
তোরে
দিতে লাজ বাসি ;
আপনার চক্ষের জলে, বন্ধু, ৪০
আরে বন্ধু,
আপনি যাই ভাসি।
—দ্বিজ ঈশান
ময়মনসিংহ-গীতিকা)

৬৮

বিদায়-পত্র

(১)

"শুন রে প্রাণের চন্দ্রা,
তোমাবে জানাই—
মনের আগুনে দেহ
পুড়িয়া হইছে ছাই !
অমৃত ভাবিয়া আমি ৫
খাইয়াছি গরল :
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে
কাল হলাহল !
জলে বিষ, বাতাসে বিষ,
না দেখি উপায়— ১০

ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী,

ধরি তোমার পায়।

একবার দেখিব তোমায়

জন্ম-শেষ-দেখা!

একবার দেখিব তোমার ১৫

নয়ন-ভঙ্গী বাঁকা!

একবার শুনিব তোমার

মধুরস বাণী;

নয়ন-জলে ভিজাইব

রাঙ্গা পা দুখানি! ১০

না ছুঁইব না ধরিব—

দূরে থাক্যা খাড়া

পুণ্য মুখ দেখ্যা আমি

জুড়াইব অন্তরা!

শিশুকালের সঙ্গী তুমি, ১৫

যৌবন-কালের মালা।

তোমারে দেখিতে, কন্যা,

মন হইল উতলা।

ভাল নাহি বাস, কন্যা,

এই পাপিষ্ঠ জনে; ৩০

জন্মের মতন হইলাম বিদায়

ধরিয়া চরণে।

এই দেখা চক্ষের দেখা,
এই দেখা শেষ !
সংসারে নাহিক আমার ৩৫
সুখ-শান্তির লেশ।
একবার দেখিয়া তোমায়
ছাড়িব সংসার ;
কপালে লেখ্যাছে বিধি
মরণ আমার !" ৪০

(২)

না খোলে মন্দিরের কপাট
নাহি কয় কথা !
মনেতে লাগিল যেমন
শক্তি-শেলের ব্যথা।

(৩)

পাগল হইল জয়ানন্দ ৪৫
ডাকে উচ্চৈঃস্বরে—
"দ্বার খোল, চন্দ্রাবতী,
দেখা দেও আমারে !
না ছুঁইব, না ধরিব ;
দূরে থাক্‌ব খাড়া ; ৫০
ইহজন্মের মত, কন্যা,
দেও মোরে সাড়া।

দেব-পূজার ফুল তুমি,
তুমি গঙ্গার পানী;
আমি যদি ছুঁই, কন্যা, ৫৫
হইবা পাতকিনী।
নয়ন ভ'রে দেখ্যা যাই
জন্ম-শোধ দেখা;
শৈশবের নয়ান দেখি
নয়ান-ভঙ্গী বাঁকা।" ৬০

৯

না খোলে মন্দিরের দ্বার,
মুখে নাহি বাণী—
ভিতরে আছয়ে কন্যা
যৌবনে যোগিনী!

১০

চারিদিকে চাহিয়া নাগর
কিছু নাহি পায়; ৬৫
ফুট্যাছে মালতী-ফুল
সাম্‌নে দেখ্‌তে পায়।
পুষ্প না তুলিয়া নাগর
কোন কাম করে?
লিখিল বিদায়-পত্র ৭০
কপাট-উপরে;—

"শৈশব-কালের সঙ্গী তুমি,
যৌবন-কালের সাথী;
অপরাধ ক্ষমা কর,
তুমি চন্দ্রাবতী। ৭৫
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে
না হইলা সম্মত :—
বিদায় মাগি, চন্দ্রাবতী,
জনমের মত!"

—নয়নচাঁদ ঘোষ
(ময়মনসিংহ-গীতিকা)

৩৯

সীতা অন্বেষণ

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
"ভুলিতে পারিনা সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী ৫
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ দেখ দেখি!
বুঝি কোন মুনিপত্নী-সহিত কোথায়
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়?

গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ? ১০
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ?
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে, ১৫
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ;
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে—
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে !
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে। ২০
কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা ?
দিবাকর, নিশাকর, দীপ্ত তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ ;
তা'রা না হরিতে পারে তিমির আমার— ২৫
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে,
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে ;
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনা আমি যেন মণি-হারা ফণী। ৩০

দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ ;
সীতারে আনিয়া দেহ, বাঁচাও জীবন।
আমি জানি, পঞ্চবটি, তুমি পুণ্যস্থান ;
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে ৩৫
শূন্য দেখি তপোবন, সীতা নাই ঘরে !”

—কৃত্তিবাস

৭০

লীলার বিলাপ

আহা কঙ্ক ! কোথা গেলে ছাড়িয়া লীলায় ?
তোমার মালঞ্চে ফুল বাসি হৈয়া যায়।
পূবেতে উদয় রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও—
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কঙ্কের দেখা নি গো পাও ?
এমন অন্ধাইর নাই রে তোমার আলো নাহি পশে : ৫
যাওয়া আসা, ঠাকুর, তোমার আছে সর্ব্বদেশে ;—
কহিও কহিও, ঠাকুর, তুমি দিনমণি,
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী।
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও ;
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিয়ো। ১০

শুন রে বিদেশী ভাই, মাঝীমাল্লাগণ,
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচরণ ;
পাহাড়ে পর্ব্বতে যাও তরণী বাহিয়া,
লাগাল পাইলে বন্ধে আনিও কহিয়া !
যাহার লাগিয়া রে আমি হইলাম উন্মাদিনী, ১৫
নদীর কিনারে কান্দি বসি একাকিনী ;
দিবস না যায় রে মোর না পোহায় রাতি,—
মনোদুঃখ কইও বন্ধে, জানাইও মিনতি।
আর কইও কইও রে দুঃখ বন্ধে রে জানাই
মরিতে তাহার লীলা বেশী বাকি নাই। ২০
শুন, শুন, নদী, আরে শুন আমার কথা,
তুমি তো অভাগা লীলার জান মনের ব্যথা ;
তুমি তো দরিয়া রে নদী (আরে নদী) কূলে তোমার বাসা,
তুমি জান কঙ্ক-লীলার মনের যত আশা ;
তুমি জান কঙ্ক-লীলার ভালবাসাবাসি— ২৫
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি।
কত দেশে যাও রে নদী বহিয়া উজান—
কোথাও নি শুনিতে পাও, নদী, সেই বাঁশীর গান ?
পাহাড় পর্ব্বতে, রে নদী, তোমার যাওয়া আসা—
অভাগীরে ছাড়িয়া বন্ধে কোথায় লইল বাসা ? ৩০
লাগাল পাইলে রে তারে কইও লীলার কথা—
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা।

নিশ্বাসে শুকায় রে নদী, কান্দি গলে শিলা—
প্রাণে মাত্র এই ভাবে বেঁচে আছে লীলা।
সেও তো বেশী নয় রে নদী, দিন যায় চলি,— ৩৫
মরিবে অভাগী লীলা আজি কিম্বা কালি।
মরবার কালে দেখ্যা পাইতাম যুগল চরণ ;
লাগাল পাইলে কইও লীলার দুঃখের বিবরণ।
রজনীকালের সাক্ষী শুন চন্দ্র তারা—
কোথায় হারাইল আমার নয়নের তারা ? ৪০
জাগিয়া পোহাইছি নিশি—তোমরা ত জান—
কোন্ দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান।
সপ্ত সাগর-তীরে পর্ব্বত অচলে—
যথা তথা যাও তোমরা এই নিশাকালে।
অতি উচ্চে কর বাস, পাও ত দেখিতে— ৪৫
বল শুনি বন্ধু মোর গেল কোন্ পথে ?
নিশীথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন—
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন।
সে রত্ন খুঁজিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই ;
এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পোহাই। ৫০
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি—
কোন্ দেশে উড়িয়া গেল আমার পিঞ্জরের পাখী ?
এমন নিষ্ঠুর বিধি, নাহি দিল পাখা—
উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা।

দিবস রাত্রির সাক্ষী তোমরা, তরুলতা, ৫৫
তোমরা কি জান আমার কঙ্ক গেল কোথা ?
বল বল, তরুলতা, রাখ আমার প্রাণ,
দয়া করি বল তার পথের সন্ধান।
আর যদি জান রে, বল—যাইবার কালে
অভাগী লীলার কথা গিয়াছে কি ব'লে ? ৬০
পিঞ্জিরাতে সারীশুক গান করে ব'সে,
নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসে
" তোমরা ত পিঞ্জিরার পাখী, নাহি থাক বনে,
তোমরা তাহার কথা ভুলিলা কেমনে ?
ক্ষীর-সর দিয়া, পাখি, পালিল যে জন ৬৫
কেমনে তাহার কথা হইলে বিস্মরণ ?
এত যে বাসিয়া ভাল পালিল সকলে,—
কি বলিয়া গেল বঁধু যাইবার কালে ?
কোন্ দেশে যাবে রে বলি' কহিল ঠিকানা—
অবশ্য তোমাদের, পাখি, কিছু আছে জানা।" ৭০
ধরিয়া সারীর গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া—
"আগে আগে চল আমার পথ দেখাইয়া।
উড়িয়া যাইতে, রে পাখি, আছে তোমার পাখা,
একদিন অবশ্য পথে হবে তার দেখা।"
উড়ায়ে খাঁচার পাখী বলে লীলাবতী, ৭৫
"ফিরায়ে কঙ্করে মোর আনহ ঝটিতি।

উড়িয়া যাও, হীরামন তোতা, উঠ রে আকাশে,
শীঘ্রগতি চল মোর বন্ধু যেই দেশে।
দেখিলে শুনাইও আমার দুঃখের গান,
বলিয়া কহিয়া আনিয়া তারে বাঁচাও লীলার প্রাণ ; ৮০
সম্পদ কালেতে পাখি, পালিল তোমায়,
ভুলিতে এমন জনে কভু না যোয়ায় ;
পৃথিবী ভ্রমিয়া পক্ষী করিও সন্ধান,
বারতা আনিয়া তাহার বাঁচাও লীলার প্রাণ।

—ময়মনসিংহ-গীতিকা

৭১

সীতার প্রতি মন্দোদরী

মন্দোদরী বলে, "শুন, জনক-নন্দিনী,
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী।
পুরীসহ বিনাশ করিয়া কোপাগুনে
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে।
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ— ৫
বিষ-দৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ!
যদি সতী হ'য়ে থাকি, পতিপ্রতি মন,
কখন আমার শাপ না হবে খণ্ডন!"
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা ল'য়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি। ১০

—কৃত্তিবাস

৭২

সীতার পাতাল প্রবেশ

অদেখা হইব প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল—
সংসারের সাধ নাহি, যাইব পাতাল !
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ—
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ !
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে ৫
সভায় পরীক্ষা দিতে আনি বারে বারে।
জন্মে জন্মে, প্রভু, মোর হও তুমি পতি,
আর কোন জন্মে মোর কোরো না দুর্গতি !

—কৃত্তিবাস

৭৩

মলুয়ার বিদায়

ঘাটেতে আছিল বান্ধা
মন-পবনের[১] নাও ;
দুপুরিয়া কালে কন্যা
নাওয়ে দিল পাও।
ঝলকে ঝলকে উঠে ৫
—ভাঙ্গা নাও সে পানী ;

(১) মন ও পবনের ন্যায় দ্রুতগামী।

“কত দূরে পাতালপুরী
আমি নাহি জানি !
উঠুক ! উঠুক ! আরও জল
নায়ের বাতা বাইয়া !” ১০
বিনোদের ভগ্নী আইল
জলের ঘাটে ধাইয়া—
“শুন, শুন, বধূ, ওগো,
কইয়া বুঝাই তোরে —
ভাঙ্গা নাও ছাড়িয়া তুমি ১৫
আইস মোদের ঘরে ।”
“না যাইব ঘরে আর,
শুন হে ননদিনী—
তোমরা সবের মুখ দেইখ্যা
ফাটিছে পরাণী । ২০
উঠুক ! উঠুক ! উঠুক পানী
ডুবুক ভাঙ্গা নাও—
জন্মের মত মলুয়ারে
একবার দেইখ্যা যাও !”
দৌড়িয়া আইল শাশুড়ী, ২৫
আউলা মাথার কেশ,
বস্ত্র না সম্বরে মাও
পাগলিনীর বেশ ;—

“শুন গো পরাণ বধূ
কইয়া বুঝাই তোরে— ৩০
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার
ফিরিয়া আইস ঘরে।
ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো,
আন্ধাইর ঘরের বাতি !
তোমারে না ছাড়িয়া থাকিবাম ৩৫
এক দিবা রাতি !”
“উঠুক ! উঠুক ! উঠুক পানী
ডুবুক ভাঙ্গা নাও !
বিদায় দেও, মা, জননী.
ধরি তোমার পাও !” ৪০
ভাঙ্গা নায়ে উঠল পানী
করি কলকল--
পাড়ে কান্দে শাউড়ী- নাও
অর্দ্ধেক হইল তল !
একে একে দৌড়িয়া আইল ৪৫
গর্ব্ভ সোদর ভাই ;
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত
লেখা জোখা নাই !
পঞ্চ ভাইয়ে ডাকিয়া কয়
সোনা বইনের কাছে— ৫০

"ভাঙ্গা নায়ে উঠিয়া বইন
কোন্ বা কার্য্য আছে ?
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ[1] ?—
কও সত্য করিয়া—
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব ৫৫
সোনার পান্সী দিয়া।"
"না যাইবাম[2], না যাইবাম, ভাই,
আর সে বাপের বাড়ী,
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে
মলুয়া সুন্দরী। ৬০
উঠুক ! উঠুক ! উঠুক জল
ডুবুক ভাঙ্গা নাও—
মলুয়ারে রাখিয়া তোমরা
আপন ঘরে যাও !"
বাতা বাইয়া উঠে পানী— ৬৫
ডুবে ভাঙ্গা নাও,—
দৌড়িয়া আস চান্দ বিনোদ
দেখ্তে যদি চাও !
দৌড়িয়া আইস্যা চান্দ বিনোদ
নদীর পাড়ে খাড়া— ৭০

(১) সাধ। (২) যাইব।

"এমন করিয়া জলে ডুবে
আমার নয়নতারা!
চান্দ সুরুজ ডুবুক, আমার
সংসারে কাজ নাই;
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি 75
আর ত নাহি চাই।
তুমি যদি ডুব কন্যা
আমায় সঙ্গে নেও;
একটি বার মুখে চাইয়া
প্রাণের বেদন কও! ৮০
ঘরে তুলিয়া লইবাম তোমায়,
সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা,
ধর্ম্মের দোহাই!"
"গত হইয়া গেছে দিন ৮৫
আর ত নাই বাকী;
কিসের লাইগা সংসারে কাজ,
আর বা কেন থাকি?
আমি নারী থাক্‌তে তোমার
কলঙ্ক না যাবে— ৯০
জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায়
সদাই ঘাটিবে[১]।

(১) লঘু করিবে; নিন্দা বা অপমান করিবে।

কলঙ্ক-জীবন মোর
ভাসাইব সাগরে!
এখন হইতে সোয়ামী মোর ৯৫
চইল্যা যাও ঘরে।
ঘরে আছে সুন্দর নারী,—
তার মুখ চাইয়া
সুখে কর গৃহবাস
তাহারে লইয়া! ১০০
উঠুক! উঠুক! উঠুক পানী
ডুবুক ভাঙ্গা নাও!
অভাগীরে রাইখ্যা তুমি
আপন ঘরে যাও!”
বাতা বাইয়া উঠে পানী ১০৫
মাইজ দরিয়ার কোলে;
জ্ঞাতি বন্ধু জনে কন্যা
ডাক দিয়া বলেঃ—
“বড় দোষের দোষী যেই
সেও যায় চলি; ১১০
খোটা[১] উষ্টা[২] যত দোষ
আমার সকলি!

(১) মিথ্যা অপবাদ। (২) উচ্ছিষ্ট, নিন্দা।

কপালে আছিল দুঃখ
না যায় খণ্ডনে;
কোন দোষেব দোষী নয় ১১৫
আমার সোয়ামী !
শুন গো শাশুড়ী মোর,
শত জন্মের মাও,
এইখানে আইস্যা পরনাম আমি
জানাই তোমার পাও !” ১২০

সুন্দরী মলুয়া কয়
সতীনে ডাকিয়া—
“সুখে কর গৃহবাস
সোয়ামী লইয়া।
আজি হইতে না দেখিবা ১২৫
মলুয়ার মুখ:—
আমার দুঃখ পাসরিবা
দেইখ্যা স্বামীর মুখ !”
পূবেতে উঠিল ঝড
গর্জ্জিয়া উঠে দেওয়া[১] ! ১৩০
এই সাগরের কূল নাই
ঘাটে নাই খেওয়া।

(১) দেব, দেবতা, মেঘ।

"ডুবুক! ডুবুক! ডুবুক নাও—
আর বা কত দূর—
ডুইব্যা দেখি কত দূরে ১৩৫
আছে পাতালপুর!"
পূবেতে গর্জ্জিল দেওয়া,
ছুটল বিষম বাও—
কইবা গেল সুন্দর কন্যা,
মন-পবনের নাও! ১৪০

—ময়মনসিংহ-গীতিকা

৭৪

সুনাই হরণ

কইও, কইও, কইও দূতী,
কইও মায়ের আগে,
আমারে যে লইয়া যায়
দেওয়ান ভাবনার চরে!
(ভাবনায় লইয়া যায় রে!) ৫
কইও, কইও, কইও দূতী,
কইও মামীর আগে,

আমার কাখের কলসী পইড়া রইলা
আইনা নদীর ঘাটে !
(ভাবনায় লইয়া যায় রে !) ১০
কইও, কইও, কইও দূতী,
প্রাণ-বন্ধুর আগে,
বন্ধুরে জানাইও স্থনাই রে
খাইছে ভাবনা-বাঘে !
সাক্ষী হইও চান্দ সুরজ ১৫
দিবস রজনী !
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইও
দুঃখের কাহিনী।
উড়িয়া যাও রে, বনের পংক্ষী,
নজর বহু দূরে— ২০
বন্দেরে কইও 'স্থনাই,
লইয়া গেছে চোরে।'
গাঙ্গের পারের হিজল-গাছ,
শুন আমার কথা,
প্রাণ-বন্ধুরে লাগাল পাইলে ২৫
কইও যত কথা।
গাঙ্গের পারের কেওয়া-ফুল,
ফুটে রইছ ডালে,

দুঃখের কথা কইও মোর
বন্ধুর লাগাল পাইলে। ৩০
সাক্ষী হইয়ো নদী নালা
আব পশু পংক্ষী,
অভাগী সুনাইরে দিল
কাল বিধাতা ফাঁকি!
সত্য যুগের বায়ু সাক্ষী, ৩৫
আর তো সাক্ষী নাই,
বন্ধুর আগে কইও, 'তোমার
মইরাছে সুনাই!'
কি করিলাম দুঃখের কপাল,
কেন বা আইলাম জলে? ৪০
সেই কারণে যজ্ঞের ঘিরত
খাইল চণ্ডালে!
আগে যদি জান্তাম দুঃখ রে,
এই ছিল কপালে,—
কাঙ্খের কলসী গলাত বান্ধ্যা ৪৫
ডুবে মরতাম জলে!
(ভাবনায় লইয়া যায় রে।)
'আসিব' বলিয়া বন্ধু
না আসিল কেরে। ৫০

(১) কেন রে, কি জন্য।

না জানি পরাণের বন্ধু
পড়িল কি ফেরে !
না আইল না আইল বন্ধু,
ক্ষতি নাই সে তাতে ;—
না জানি বিপদে বন্ধু
পড়িল কি পথে ! ৫৫
বিষম নদীব ঢেউ,
অলছ-তলছ[১] পানী,—
কি জানি পন্থেতে বন্ধুব
ডুবেছে নাও খানি !
উইড়া যাও রে বনের পংক্ষী, ৬০
খবর দিও তারে,—
'তোমার স্থনাই লইয়া যায়
দেওয়ান ভাবনার চরে ।'
(ভাবনায় লইয়া যায় রে !)
স্থন্দর দেখিয়া, ভাবনায় ৬৫
লইয়া যায় রে—
লইয়া যায় ! লইয়া যায় !
লইয়া যায় রে !

—ময়মনসিংহ-গীতিকা

(১) থই থই ।

৭৫

মুনি-পত্নী

দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা,
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান, শুক্ল সর্ব্ব বেশ,
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ।
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা, ৫
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা।
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা,
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা।

—কৃত্তিবাস

৭৬

খেদ

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে[১];

(১) শুষ্ক প্রতপ্ত বালুকাময় ভূমিতে বারিবিন্দু পড়িবামাত্র যেমন শোষিত হইয়া যায়, তেমনি আমার মন পুত্র-মিত্র ও রমণীদিগের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছে।

তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল,
অব মঝু[১] হব কোন কাজে ?
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল, ৫
জরা-শিশু[২] কতদিন গেলা ;
নিধুবনে রমণীরস-রঙ্গে মাতল,
তোহে ভজব কোন বেলা !

—বিদ্যাপতি

৭৭

বিদ্যাপতির প্রার্থনা

এ হরি, বাঁধা তুয় পদ-নায় !
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায় ?
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার ;— ৫
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি,
জগ-বাহির নহ মোঞে ছার।
ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ;

(১) এই মোহ অন্তিমকালে আমার কি কাজে লাগিবে ? (২) জরাগ্রস্ত অবস্থায় এবং শৈশবে।

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন ১০
তিল এক দেহ, দীনবন্ধু!

মাধব, হম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীনদয়ামায়,
অতএ তোহারি বিশোয়াসা।
কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ১৫
ন তুয়া আদি অবসানা!
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা!
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমনভয়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা— ২০
আদি-অনাদিক নাথ কহাওসি,
অব তারণভার তোহারা!

—বিদ্যাপতি

বঙ্গ-বীণা
দ্বিতীয় স্তবক

৭৮

কবি

ধন্য আমি—বাঁশীতে তোর
আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাই রে কোন দুখ॥
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশী, ৫
আমি তোমার ফুঁক।
ভাল মন্দ রন্ধ্রে বাজি,
বাজি সুখ আর দুখ॥
সকাল বাজি, সন্ধ্যা বাজি,
বাজি নিশুইত বাত। ১০
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি,
তোমার মনের সাথ॥
একবারেই ফুরাই যদি
কোন দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজা ১৫
আর কি আমি চাই!

—বাউল

৭৯

স্বদেশী ভাষা

নানান দেশে নানান ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারা-জল বিনে কভু ৫
ঘুচে কি তৃষা ?

—রামনিধি গুপ্ত

৮০

স্বদেশ

মিছা মণি মুক্তা হেম   স্বদেশের প্রিয়-প্রেম[১]
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।
সুধাকরে কত সুধা   দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
স্বদেশের প্রেম যত   সেই মাত্র অবগত ৫
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে   চিত্ত-পটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(১) প্রিয়জনের ভালবাসা।

৮১

আমার বাড়ী

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার—
চারদিকে মালঞ্চ-ঘেরা ;
ভ্রমরাতে গুন্ গুন্ করে ;
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া ;
ভ্রমর ভ্রমরী সনে ৫
আনন্দিত কুসুম-বনে ;
আমার ঐ ফুলবাগানে
বসন্ত নয় তিলেক ছাড়া !

—গোপাল উড়ে

৮২

নয়নে-মনে

নয়নে নয়নে আলিঙ্গন
মনে মনে মিলিল !
দেখিতে অন্তর[১], নহে সে অন্তর—
অন্তরে অন্তর পশিল !
উভয়ের প্রেমগুণে[২] বাঁধা গেল দুইজনে, ৫
স্বভাবে স্বভাব মজিল।

—রামনিধি গুপ্ত

(১) স্বতন্ত্র। (২) প্রেমরূপ রজ্জু এবং প্রেমের গুণ।

৮৩

অটুট্

সই, যে যার মরমে লাগে
সে কি তারে ত্যজিতে পারে ?
না ঘুচে আঁখির আশা
ও-মুখ হেরে ।
যার যাতে মজে মন,   ৫
সে তার পরম ধন,
সতত সে প্রাণপণ
করে তাহারে ।

—কালী মির্জ্জা (মুখোপাধ্যায়)

৮৪

স্বপ্নমিলন

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন ।
না করি বিচ্ছেদভয়ে আঁখি উন্মীলন ।
নিদ্রাতে তাহারে দেখি
মনপ্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হ'লে না র'বে জীবন ॥   ৫

—আশুতোষ দেব

৮৫

প্রতীক্ষা

তোমার আশাতে এ চারি জন—
মোর মন প্রাণ শ্রবণ নয়ন।
আছে অভিভূত হয়ে সর্ব্বক্ষণ—
দরশ পরশ শুনিতে সুভাষ
করিতেছে আরাধন॥ ৫
অন্য রূপ আঁখি না হেরে আর,
শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার!
শয়নে স্বপনে মন ভাবে মনে—
কবে হইবে মিলন॥

—হরু ঠাকুর

৮৬

দর্শনে

যবে তারে দেখি, অনিমিষ আঁখি
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন হয় মোর মন,
শুন লো সজনি।

তৃষিত চাতকী যেন ৫
নিরখিয়ে নবঘন—
বিনা বারি পানে কত সুখী মনে
কে জানে না জানি !

—রামনিধি গুপ্ত

৮৭

অভ্যর্থনা

বঁধু, তোমায় করব রাজা ব'সে তরুতলে।
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে ॥
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোর গলে।
সিংহাসনে বসাইতে
দিব এই হৃদয় পেতে, ৫
পীরিতি মরম-মধু দিব তোরে খেতে।
বিচ্ছেদেরে বেঁধে এনে ফেল্‌ব পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুট্‌বে কেয়ার ডালে ॥

—অজ্ঞাত

৮৮

সকলি তোমার

তোমা বিনা প্রাণ আমার,
বলো আর কেবা আছে ?
সদা এই ভয় হয়
তুমি পর ভাবো পাছে ॥
তোমারে করেছি সার, ৫
মনে কেহ নাহি আর,
দেহ প্রাণ যে আমার
সকলি তোমার কাছে ॥

—মহারাজ মহতাবচাঁদ

৮৯

পরখ

ও প্রাণ কানাই রে !
তেলের বাটি গামছা হাতে,
আমার বন্ধু যায় যমুনার ঘাটে ;
আমার কলসী ভাসাইয়া নিল সোঁতে রে,
ও প্রাণ কানাই রে ! ৫

বন্ধু যদি আমার হৈত,
কলসী আনিয়া দিত,
আমার মুখের মুছায়ে দিত ঘাম !
(আমার মুখেতে তুলিয়া দিত পাণ)
ও প্রাণ কাণ কানাই রে ! ১০

—অজ্ঞাত

৯০

হেঁয়ালী

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ ॥"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ ॥"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ। ৫
চার ধলো দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ ॥"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ ॥"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ !
চার রাঙা দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ ॥" ১০
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোর মাথার সিঁদুর ॥"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥"
"নিম তিতো, নিসিন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল। ১৫
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতীনের ঘর॥"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটী।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥" ২০

—ছড়া

৯১

প্রেমতত্ত্ব

কহ, সখি, কিছু প্রেমেরি কথা,
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা;—
করিলে শ্রবণ হয় দিব্যজ্ঞান,
হেন প্রেম-ধন উপজে কোথা?
আমি এসেছি বিবাগে মনের বিরাগে ৫
প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা[১]।

(১) সর্ব্বস্ব ত্যাগের চিহ্নস্বরূপ।

আমি রসিকের স্থান পেয়েছি সন্ধান—
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা ?
কাপট্য ত্যজিয়ে কহ বিবরিয়ে—
ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা ! ১০
হায়, কোন্ প্রেম লাগি' প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কোন্ প্রেমে ?
কি প্রেম-কারণে ভগীরথ-জনে
ভাগীরথী আনে ভারতভূমে !
কোন্ প্রেমে হরি বধে' ব্রজনারী ১৫
গেল মধুপুরী হ'য়ে অনাথা ?
কোন্ প্রেম-ফলে কালিন্দীর কূলে
কৃষ্ণ-পদ পেলে মাধবীলতা ?

— রাসু ও নৃসিংহ

৯২

যদি

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত—
আমি যারে ভালবাসি
সে যদি ভালবাসিত !

প্রেম-সাগরের জল
তবে হইত শীতল, ৫
বিচ্ছেদ-বাড়বানল
যদি তাহে না থাকিত !

—শ্রীধর কথক

৯৩

প্রেমছলনা

কে তোরে শিখায়েছে বল্, প্রেম-ছলনা ?
যে তোমারে শিখায়েছে সে বুঝি প্রেম জানে না ?
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান,
এমন ক'রে কত জনার বধেছ প্রাণ, বল না !

—শ্রীধর কথক

৯৪

পলাতকের প্রতি

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালোবাসি তাই
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছুকাল থাকো থাকো ব'লে ৫
ধ'রে রাখব না।

শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল ;
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, ১০
আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হ'ল এ পথে আগমন,
কও কথা, একবার কও কথা, ১৫
তোলো ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙেছে, ভেঙেছে,
তায় লজ্জা কি।
এমন তো প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, ২০
বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলেম না॥

—রাম বসু

৯৫

অহেতুক প্রেম

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে।
আমার স্বভাব এই—তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
সেজন্য দেখিতে আসি, ৫
দেখা দিতে আসিনে॥

—শ্রীধর কথক

৯৬

বিচার

বলো কার অনুরোধে ছিলে, প্রাণ?
ছিলে আমার বশ? কি যৌবনের বশ?
কি প্রেমের বশে প্রেমরসে তুষ্‌তে প্রাণ?
রাখিতে হে অধিনীর সম্মান?
অভিমানী হতেম হে তোমায়— ৫
কার সোহাগে, অনুরাগে
ধরতে আমার পায়?
তুমি আমি যে সেই আছি,
তবে কিসে গেল সে সম্মান?

—রাম বসু

৯৭

ভ্রষ্ট লগ্ন

মনে রইল, সই, মনের বেদনা !
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি-বলি বলা হ'ল না—
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না !
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে ৫
নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাসিত লোকে ;
সখি, ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে—
নারী-জনম যেন করে না !

—রাম বসু

৯৮

মান

মনে মনে সাধ রে :
কে আগে সাধিবে বলো ? ঘটিল প্রমাদ রে !
নয়নেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল,
উভয়ে ছাড়িতে নারে মান-অনুরোধ রে !

—শ্রীধর কথক

৯৯

সর্ব্বময়

মান ক'রে মান রাখ্‌তে পারিনে—
আমি যে দিকেতে ফিরে চাই
সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই
সজল আঁখি জলধর-বরণে !
হৃদয় মাঝে শ্যাম বিরাজে ৫
বহে প্রেমধারা দুনয়নে !

—রাম বসু

১০০

ব্যর্থমান

'সাধিলে করিব মান'
কত মনে করি ;
দেখিলে তাহার মুখ
তখনি পাসরি ।
মন মানে, কহে আঁখি ৫
'আর না হইব সুখী',
দরশনে হয় পুনঃ
অধীন তাহারি !

—রামনিধি গুপ্ত

১০১

প্রতিশোধ

এবার প্রাণান্ত হ'লে রমণী হব!
পুরুষের কত দুঃখ নারী হয়ে জানাব!
মান ক'রে ব'সে র'ব, সাধিলে না কথা কব,
অভিমান তার ফিরে লব, পায় ধ'রে সাধাব।

—রামনিধি গুপ্ত

১০২

প্রেমানল

নয়নের নীরে কি নিবে মনের অনল :—
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল।
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারা-জল বিনে তার সকলি বিফল!

—রামনিধি গুপ্ত

১০৩

নিরাশা

করেছি পীরিতি বিসর্জ্জন—যাবজ্জীবন!
প্রেমতত্ত্ব উত্থাপনে আর নাহি প্রয়োজন!
হয়েছি প্রেমসন্ন্যাসী নিরাশা-কাননবাসী,
বিচ্ছেদের ভস্মরাশি অঙ্গে করেছি ভূষণ!

—শ্রীধর কথক

১০৪

পঞ্চশরের ভুল

হর নই হে! আমি যুবতী ;
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ?
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি।
হায় শুন শম্ভু-অরি ভেবে ত্রিপুরারি ৫
বৈরী হ'য়োনা আমার—
বিচ্ছেদে এ দশা বিগলিত-কেশা,
নহে এ তো জটাভার!
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর,
মাখি নাই, মাখি নাই বিভূতি! ১০

—রাম বসু

১০৫

আশাধিনী

দাসী ব'লে অভাগীরে আজও কি তার মনে আছে ?
তাহার যে আশাধিনী, আশা-নীরে ভাসিতেছে।
বাসে না বাসে না ভাল, সে ভাল থাকিলে ভাল,
দেখা হ'লে সুধাস্ লো, সে ত আমার ভাল আছে ?

—রামনিধি গুপ্ত

১০৬

তদ্গতচিত্তা

সখি, সে কি তা জানে—
আমি যে কাতরা তারি
বিরহবাণে ?
নয়নেরি বারি নয়নে নিবারি
পাসরিতে নারি ৫
সেই জনে ;
এখনও রয়েছে প্রাণ
তাহারি ধ্যানে।

—রামনিধি গুপ্ত

১০৭

শেষ সাধ

এই খেদ—তারে দেখে মরতে পেলেম না।
আমায় চা'ক না চা'ক
সখা সুখে থাক,
কেন দেখা দিয়ে একবার, ফিরে গেল না॥

—রাম বসু

১০৮

মধুভিখারী

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ,
কহ অলিরাজ সবিশেষ।
কেতকী-সৌরভ অঙ্গে তব অশেষ।
রজ লেগেছে কালো গায়,
হয়েছে, প্রাণ, বিভূতির প্রায়, ৫
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
রূপের না দেখি শেষ।
ধুতুরাপীযূষ বঁধু করেছ হে পান,
হেরিয়ে তোমার মুখ করি অনুমান।
তাহাতে হয়েছে, প্রাণধন, ১০
আঁখি দুটি ঊর্দ্ধে উন্মীলন।
মধু ভিক্ষা ক'রে বঁধু ভ্রমিতেছ নানা দেশ।

—রাম বসু

১০৯

কোকিলের প্রতি

কোকিল! কর এই উপকার—
যাও নাথের নিকটে একবার ;
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার।

নিঠুর নাগর আছে যথায়
পঞ্চস্বরে গান শুনাও গে তায়— ৫
শুনে তব ধ্বনি বলিয়ে দুঃখিনী
অবশ্য মনে হইবে তার !
হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথ
কোকিল বুঝি নাই সে দেশে ?
তা যদি থাকিত তবে সে আসিত ১০
বসন্ত-সময়ে—নিবাসে !

—রাম বসু

১৭০

সেই বাঁশী

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
সই, কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরষিল শ্রবণে ?
বৃক্ষডালে বসি' পক্ষী অগণিত ৫
জড়বৎ কোন্ কারণে ?
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে ॥

একি একি সখি, এ কি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে ১০
তুলিয়ে বদন নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীনচেতনে ॥
হায়, কিসের লাগিয়ে বিদরে এ হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ এ কি প্রেম উপজিল, ১৫
সলিল বহিল নয়নে ॥
আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী
বেজেছিল সই কাননে।
কুল লাজ ভয় হরিল তাহাতে,
মরিতেছি গুরুগঞ্জনে ॥ ২০

—নিত্যানন্দ বৈরাগী (নিতাই দাস)

১১১

জলভরা

আর তো যাব না আমি যমুনারি কূলে।
যে হেরিছে রূপ তার
কুলে থাকা হ'ল ভার,
নাম যে জানি না তার,
সে থাকে গোকুলে।

যখন সে চায় ফিরে,
আসিতে না পারি ফিরে,
নিয়ে নাহি দেয় ফিরে
মন যে হরিয়ে নিলে ॥
গুরুজন ছিল সাথে, ১০
মরেছিলাম মরমেতে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ
নয়নেরি জলে ॥

—কালী মির্জ্জা (মুখোপাধ্যায়)

১১২

মনের ছায়া

জলে কি জ্বলে,
কি দোলে,
দেখ গো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে স্থির নির্ণয় করিতে ॥ ৫
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি
নির্ম্মল যমুনাজলেতে ॥
নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি।
জল-মধ্যে কি আজ একি দেখি দেখি ॥

জলে কি এমন দেখেছ কখন, ১০

বলো দেখি ওগো ললিতে ?

সই দেখ দেখি শোভা,

কিসের আভা হেরি জল-মাঝেতে ?

প্রস্ফুটিত তমালবৃক্ষ যাহা কালো.

ঐ ছায়া কি ইথে ? ১৫

আরে সখি, কালোচাঁদ কি আছে ?

গগনমণ্ডলে কি পাতালে রয়েছে ?

বলো দেখি সখি,

কালাচাঁদ কি

উদয় হয় দিবসেতে ? ২০

—রাম বসু

১১৩

শ্যামসুন্দর

কিবা দলিত-কজ্জল-কলিত-উজ্জ্বল,

সজল-জলদ-শ্যামল-সুন্দর,

যেন বকালী-সহিত[১] ইন্দ্রধনু-যুত[২],

(১) চন্দন-বিন্দুর তিলকাবলী দেখিতে হইয়াছে যেন নবীন মেঘের গায়ে বক-শ্রেণী উড়িয়া চলিতেছে। (২) চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ যেন মেঘে ইন্দ্রধনু উদিত হইয়াছে।

তড়িত-জড়িত[১] নব জলধর।
স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে ৫
মনে হয় যেন বকপাঁতি চলে ;
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনী-কান্তি ধরে পীতাম্বর।

—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

১১৪

অশ্রুপ্লাবিত

সলিলে কমল হয়, সই, সদা সবে কয়।
হেরি পদ্মের উপর পদ্ম[২],
আবার তাতে বারি বয়।
আমরা এ পথে আসি যাই,
এমন রূপ দেখি নাই, ৫
কমলের জলে কমল ভেসে যায়[৩]।

(১) পরিধানে পীতবসন যেন বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। (২) করপদ্মের উপর মুখপদ্ম।
(৩) নয়নকমলের জলে বদনকমল ভাসিয়া যাইতেছে।

তোরা দেখে যা গো সখি,
হ'ল এ কি দায়,
তোরা দেখ ওই প্রাণসই,
এ তো বারি নয়, ১০
অনল[১],
শ্রীমুখকমল
শুখাল,
বলো করি কি উপায়॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১১৮

শুক-সারী-সংবাদ

রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন। ৫
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন।

(১) অনল সদৃশ প্রতপ্ত।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ুরপাখা।
সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, ১০
ঐ যে যায় গো দেখা।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,
চূড়া তাইতে হেলে।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদাজীবন। ১৫
সারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি।
সারী বলে, আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানে। ২০

শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
সারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছে সে গান।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
সারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু, ২৫
নৈলে কে কার গুরু।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
সারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা। ৩০
সারী বলে, আমার রাধা করে আনাগোনা,
নৈলে যেত জানা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের আলো।
সারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আঁধার কালো। ৩৫
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
সারী বলে, সত্য বটে! সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হতো কাশীবাসী।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ।
সারী বলে, আমার রাধা স্থগিত পবন, ৪০
সে যে স্থির পবন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
সারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান,
থাকে কি আপনি প্রাণ?

—গোবিন্দ অধিকারী

১১৬

সুখস্মৃতি

চন্দ্রা-সখি বল্ বল্ বৃন্দাবনের সুমঙ্গল—

কুশলে ত আছে বন্ধুগণ ?

পিতা নন্দমহাশয়, পরম করুণাময়,

কিরূপে বা রেখেছেন জীবন ?

মাতা মোর যশোমতী যেন স্নেহ মূর্ত্তিমতী ৫

মন বেঁধে আছেন কি মতে ?

না দেখিয়ে একক্ষণ বৎস-হারা ধেনু যেন

কাঁদিয়ে ফিরিতেন পথে পথে !

কেমন আছে সখাগণ যাদের সনে গোচারণ

করিতাম কানন-মাঝে সুখে ? ১০

মরি ! তাদের কতই প্রীতি ছিল যে আমার প্রতি—

খেয়ে ফল দিত মোর মুখে।

যত ব্রজ-গোপ-রামা আমার পরাণ-সমা

কেমন আছে আমা-হারা হ'য়ে ?

কেমন আছে শ্রীরাধিকা, সে যে মোর প্রাণাধিকা, ১৫

হিয়ার হেম-হার কোথা প্রিয়ে !

—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

১১৭

বৃথা দৌত্য

তোরা যাস্‌নে, যাস্‌নে, যাস্‌নে দূতী !
গেলে কথা কবে না সেই নব-ভূপতি।
কথা না কয় তোদের সনে ফিরে আস্‌বি অভিমানে,
আমি শুনে মরবো প্রাণে—শ্যামের কি ক্ষতি !
দয়ামায়াহীন কৃষ্ণ মনেতে জেনেছি স্পষ্ট, ৫
যাওয়া-আসা মিছে কষ্ট কেন পাবে, সই ?
যদি যাস্‌ সে মধুপুরে আমার কথা কস্‌নে তারে,
বৃন্দে, তোমার ধরি করে—রাখ মিনতি !

—গোবিন্দ অধিকারী

১১৮

শূন্য বৃন্দাবন

করতে গোচারণ যে বনে,
সে বন, বন হয়েছে এক্ষণে,
(তোমা বিহনে)
বনের শোভা গিয়াছে।
দেখে এলাম শ্যাম
তোমার বৃন্দাবন-ধাম— ৫
কেবল নাম আছে।

তথায় বসন্ত নাই,

কোকিল নাই,

ভ্রমর নাই,

শুধু রাইকমল ১০

ধূলায় প'ড়ে রয়েছে।

—সীতানাথ মুখোপাধ্যায়

১১৯

হৃদি-বৃন্দাবন

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস

যদি কর কমলাপতি,

ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার

ভক্তি হবে রাধা সতী।

মুক্তি-কামনা আমারি ৫

হবে বৃন্দে গোপনারী,

দেহ হবে নন্দের পুরী,

স্নেহ হবে মা যশোমতী।

আমার ধর ধর জনার্দ্দন—

পাপভার-গোবর্দ্ধন, ১০

কামাদি ছয় কংসচরে

ধ্বংস কর সম্প্রতি।

বাজায়ে কৃপাবাঁশরী
মন-ধেনুকে বশ করি'
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে ১৫
পূরাও ইষ্ট এই মিনতি।
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে
আশা-বংশীবট-মূলে
সদয়ভাবে স্বদাস ভেবে
সতত কর বসতি। ২০
যদি বল রাখাল-প্রেমে
বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি।

—দাশরথি রায়

১২০

সুখস্বপ্ন

ওহে গিরি! গা তোল হে—
মা এলেন, হিমালয়!
গত নিশিযোগে, আমি হে,
দেখেছি যে সুস্বপন
এলো হে সেই আমার তারাধন! ৫

দাঁড়ায়ে দুয়ারে

বলে, 'মা কই? মা কই? মা কই আমার?

দেও দেখা দুঃখিনীরে।'

অমনি দু-বাহু পসারি'

উমা কোলে করি' ১০

আনন্দেতে আমি আমি নয়।

—রাম বসু

১২১

ভিখারীর পরিবর্ত্তন

১

কও দেখি, উমা, কেমন ছিলে মা,

ভিখারী হরের ঘরে?

জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,

ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা ক'রে!

২

শিবের সেদিন আর এখন নাই। ৫

যারে "পাগল, পাগল" ব'লে বিবাহের কালে

সকলে দিল ধিক্কার—

এখন সেই পাগলের সব অতুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার !
এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় না মেনে,[১] ১০
আনন্দ-কাননে জুড়াবার ঠাঁই !

—রাম বসু

১২২

ইঙ্গিত

আস্‌মানে উঠেছে রে
শ্যামার গায়ের আলো ফুটে।
তাই দেখ্‌তে সবে সাঁঝের কালে
লোক এলো ছুটে ॥
কত শলক[২] কত রশ্মি ৫
শ্যামা মায়ের পায়,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে
কালী কালের ঢেউ দেখায় ॥

—কাবেল-কামিনী

(১) বেড়ায় না বটে। (২) ফার্সী শব্দ, অর্থ শলাকা, চাবুক ; এখানে অর্থ রশ্মি, কিরণ।

১২৩

প্রতীক্ষা

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহুনে ?
দেখ্‌না আমার পরমগুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া-হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, ৫
তাই ভরসা দণ্ড,
এর আছে কোন্ উপায় ?
কয় যে মদন,
শোন নিবেদন,
দিস্‌নে বেদন ১০
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজ ধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে।
রে গরজী। ১৫

—মদন বাউল

১২৪

চরিত্র

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে ;
তাই ভয় পেয়ে, মা, ডাকি তোরে।
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে—
আছে কালী-নামের জোরে !
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে ৫
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ;
তাদের দমন ক'রব কি, মা,—
ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি সরে'।
প্রসাদ বলে, কোন বেচালে[১]
তারাই পাছে কয়েদ করে ! ১০

—রামপ্রসাদ সেন

১২৫

অকূলে

আমায় কোথায় আনিলে !
আনিয়ে সাগর-মাঝে তরী ডুবালে।
নাহি দেখি পারাপার,
চারিদিক অন্ধকার,

(১) অসতর্কতায়।

প্রাণ বুঝি যায় এবার
ঘূর্ণিত জলে। ৫
কোথা রইল মাতা পিতা,
কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়া রইল কোথা,
বন্ধু সকলে॥

—রামমোহন রায়

১২৬

ঢেউ

ঢেউ খেলে রে! ঝিল্‌মিলি সায়রে[১] ঢেউ খেলে!
ঢেউয়ের আড়ি ঢেউয়ের পাড়ি[২]
ঢেউয়েরি কারখানা—
(গোঁসাই, ঢেউয়েরি কারখানা)
(আর) ঢেউ কাটিয়ে ধর পাড়ি, ৫
ওরে মাঝি সোনা!
আগা দিয়ে উঠে ঢেউ
পাছা দিয়ে যায়—
(গোঁসাই, পাছা দিয়ে যায়)
জীবনের কাণ্ডারী নেয়ে ১০
ব'সে পাল ঘুরায়।

(১) সাগরে। (২) 'আড়ি' 'পাড়ি'—দাঁড়ের টানা ও পোড়েন।

বাঙ্গলা মুলুকের মাঝি
ভাইটাল পাল খাটায়[1]
(গোঁসাই, ভাইটাল পাল খাটায়)
জাহাজে খালাসী নেয়ে[2] ১৫
উজান বেয়ে যায় !

—বাউল

১২৭

মত্ততা

মন তুমি কি রঙ্গে আছ—
ও মন রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ !
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা—
দুঃখে রোদন, সুখে নাচ !
রঙের বেলা— রাঙে কড়ি[3]— ৫
সোনার দরে তা' কিনেছ ;
ও মন, দুঃখের বেলা—রতন মাণিক
মাটির দরে তাই বেচেছ।

(১) ভাটির দিকে যাইবার পাল। (২) যে নাবিকেরা নৌকার মাল খালাস করে।
(৩) সুখের বেলা মূল্যহীন বস্তুকে মহামূল্য মনে করিতেছ।

সুখের ঘরে রূপের বাসা—
সেই রূপে মন মজায়েছ ;
যখন সেরূপে বিরূপ হবে,—
সে রূপের কি রূপ ভেবেছ ?[২]

—রামপ্রসাদ সেন

১২৮

অজানিতের টান

ওগো দরদি ! আমার মন কেন
উদাসী হতে চায় !
এগো ডাক নাহি হাঁক নাহি গো—
আপনে আপনে চ'লে যায় !
এগো ধৈরজ না ধরে অন্তরে—
কেঁদে উঠে মন শিহরি' নয়ন ঝরে—
যেন নীরবে সুরবে সদা
বলিতেছে 'আয় গো আয় !'
(আমার মন কেন উদাসী হতে চায় ?)

(১) বিলাসের মধ্যে যে মোহন আকর্ষণ আছে। (২) যখন বিলাসে অশক্ত হইবে তখনকার অবস্থা কি চিন্তা করিয়াছ ?

এগো ভাটী সোঁতে ভাটারি গড়ান[১] ; ১০
এগো সাগর যেমন সদা টানে নদীর পরাণ—
সে টান এতই সবল—মনের গরল
অমৃত হইয়ে যায় !
সে যে কেমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা
এগো উড়ায়ে দেয় মনের পাখী ; মানা মানে না। ১৫
সে যে উড়ে যায় বিমানের পথে
শীতল বাতাস লাগে গায় !

— অজ্ঞাত ভাটিয়াল গান

১২৯

মনের মানুষের সন্ধান

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে ৫
বেড়াই ঘুরে,

(১) জলের নিম্নগতি ।

লাগি' সেই হৃদয়শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হতো খুশী,
দেখ্‌তাম নয়ন ভ'রে! ১০
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন ক'রে,
মরি হায়, হায়, রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
ওরে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে!
দিব তার তুলনা কি, ১৫
যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে!
তারে যে দেখেছে
সেই মজেছে ২০
ছাই দিয়ে সংসারে!
'মরি হায় হায় রে'!
ও সে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে।
কুল মান সব গেল রে ২৫
তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে।
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে।

ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায় ৩০
গগন ভেবে মরে।
মরি হায় হায় রে!
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস্
কৃপা ক'রে,
আমার সুহৃৎ হ'য়ে, ৩৫
ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে,
আমায় ব'লে দে রে!

—গগন হরকরা

১৩০

অন্তরের পূজা

মন, তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী ব'লে ব'স রে ধ্যানে।
জাঁকজমকে করলে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা ৫
জান্‌বে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে?

তুমি মনোময় প্রতিমা করি'
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে। ১০
আলোচাল আর পাকা কলা
কাজ্ কি রে তোর আয়োজনে ;
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে
তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো ১৫
কাজ কি রে তোর সে রোস্‌নাইয়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে'
দেও না—জ্বলুক নিশিদিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে ? ২০
তুমি জয় কালী! জয় কালী! ব'লে
বলি দাও ষড়্ রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাকে ঢোলে—
কাজ কি রে তোর সে বাজনে ?
তুমি জয় কালী বলি', দেও করতালি
মন রাখ সেই শ্রীচরণে।

—রামপ্রসাদ সেন

১৩১

মনের তরঙ্গ

আমি মজেছি মনে।

না জানি মন মজ্‌ল কিসে, আনন্দে কি মরণে[১]!

ওগো এখন আমায় ডাকা মিছে,

আমার নাই যে হিসাব আগে পিছে,

আনন্দে এই মন নাচিছে ৫

তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে!

আজব ব্যাপার তাজব লেগেছে,

কই সে সাগর, কই এ নদী,

তবু চল্‌ছে খবর নিরবধি,

এ তরঙ্গ দেখ্‌বি যদি ১০

মিলা নয়ন হৃদয় সনে।

এত রঙ্গ দেখ্‌বি যদি, মিলা মন হৃদয়-নয়নে[২]।

—বাউল

(১) অনুভবাতীত অনন্নুমেয় অনির্ব্বচনীয় ভাবে। (২) মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্যনিরন্তর যোগ ঘটিতেছে, এবং সেই আনন্দ-তরঙ্গের রঙ্গ বা লীলা দেখিতে হইলে ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তরের সহিত এক সুরে বাঁধিয়া তুলিতে হইবে।

১৩২

জীবন-প্রদীপ

পরাণ আমার সোতের দীয়া[১] !

(আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে ?)

আগে আন্ধার,[২] পাছে আন্ধার,

আন্ধার নিশুইত ঢালা,—

আন্ধার মাঝে কেবল বাজে ৫

লহরেরি মালা[৩] ! (গো)

তারার তলে কেবল চলে

নিশুইত রাতের ধারা ;

সাথের সাথী চলে বাতি

নাই গো কূল-কিনারা ! ১০

(দিবা রাতি চলে গো)

(বাতি জ্বলে সাথে সাথে গো)

অচিন্ ফুলে[৪] নদীর কূলে

ডাকে গো কারা !

("কূলে ভিড়া," "ক্ষণেক জিরা") ১৫

অকূল পাড়ি থাম্‌তে নারি—

(আর) চলে যে ধারা !

(১) সংসার-স্রোতে ভাসমান মানুষের জীবন-প্রদীপ। (২) জীবনের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য রহস্য। (৩) সংসারের ঘটনার স্রোত। (৪) ভোগ-সুখ।

(আমি চলি বে-ঠিকান্)

অকূলের কূল গো !

দরিয়ার সাগর[1] ! ২০

"আয়" কয় বা কে ? কেমন ডাকে ?

পাইমু গো লাগর[2] !

তোমার কোলে লইবা তুলে

জুড়াইমু গিয়া !

তোমার বুকে নিবুম[3] সুখে ২৫

জুড়াইমু গিয়া !

—বাউল

১৩৩

কাণ্ডারী

আরে মন-মাঝি, তোর বৈঠা[4] নে রে—

আমি আর বাইতে পার্‌লাম না ।

আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে—

তরী ভাইটায় সয় আর উজায় না[5] ।

(১) যে অনন্তে গিয়া জীবন মিশিয়াছে । (২) লাগাল । (৩) নির্ব্বাণ । (৪) ছোট দাঁড় । (৫) নৌকা কেবল ভাটির দিকেই যাওয়া ব্যতীত উজান দিকে যায় না । সয়=সওয়ায়, ব্যতীত ।

ওরে জাঙ্গী[১] রশি যতই কসি,

ওরে হাইলেতে জল মানে না।

নায়ের তলী খসা, গুরা[২] ভাঙ্গা রে,

নায় তো গাব গয়নি[৩] মানে না।

—অজ্ঞাত, ভাটিয়াল গান

১৩৪

বেলা শেষে

সামাল্ সামাল্! ডুব্‌লো তরী!

আমার মন রে ভোলা, গেল বেলা,

ভজ্‌লে না হর-সুন্দরী।

প্রবঞ্চনার বিকি কিনি

ক'রে ভরা কৈলে ভারী; ৫

সারা দিন কাটালে ঘাটে ব'সে—

সন্ধ্যাবেলা ধর্‌লে পাড়ী!

একে তোর জীর্ণ তরী

কলুষেতে হ'ল ভারী,—

যদি পার হ'বি, মন, ভবার্ণবে ১০

শ্রীনাথে কর্ কাণ্ডারী।

(১) দড়ি, কাছি। (২) নৌকার খোলের উপর সমান্তরালে যে কাঠের বাতা থাকে। (৩) গাব-কষের প্রলেপ।

তরঙ্গ দেখিয়া ভারী
পলাইল ছয়টা দাঁড়ি ;—
এখন গুরুব্রহ্ম সার কর, মন,
যিনি হন ভব-কাণ্ডারী ! ১৫

—রামপ্রসাদ সেন

১৩৮

ভগ্ন তরী বাওয়া

ওরে ডুব্‌ছে নাও ডুবাইয়া বাও
ওরে রসিক নাইয়া[১]।
ওরে ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া।
ওরে হাল ছেড়ো না, ভয় কোরো না, ৫
পার্‌বারে যাইতে বাইয়া।
ও তোর ভাঙ্গা নাও লোণা পানি
ছাইড়া দিছে খাইয়া[২]।
ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পেতেছে
বাজীকরের মাইয়া[৩]॥ ১০

—সুধারাম বাউল

(১) ভক্ত। (২) নৌকার খোলে যতখানি জল ধরে তাহা লইয়া শেষ করিয়াছে। (৩) মায়া-স্বরূপিণী।

১৩৬

আবির্ভাব

আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল্, বল্ রে শ্রবণে—
'সে এসেছে, সে এসেছে পূরব গগনে!'
তোরা বল্ গো ঘ্রাণে বল্, বল্ রে শ্রবণে— ৫
'তোর বন্ধু এসেছে, এসেছে সে পূরব গগনে!'
কমল মেলে কি আঁখি
তারে[1] সঙ্গে না দেখি,
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে।
আমি মেলুম না নয়ন ১০
যদি না দেখি তায় আমার প্রথম চাওনে।

—বাউল

(১) অরুণকে।

১৩৭

দেবাভাস

আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে,
এবার দয়াল ফুটেছে আখীর,[১]
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি
দয়াল আমার সম্মুখে জাহির,
রে সম্মুখে জাহির। ৫
ফুল ঝরে, পাখী উড়ে, পাতায় শিশির,
গলে রে রোদের তাপে আলোক নিশির,[২]
দয়াল আলোক শশীর।
তাই ভেবে[৩] কান্দে ঈশান, যাতনা গভীর,
বড় যাতনা গভীর॥ ১০

—ঈশান ফকীর

(১) অবশেষে। (২) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের আলোক। (৩) উষার আভাস মিলাইয়া যাইতে দেখিয়া। অর্থাৎ দেবতার আবির্ভাব সংসারে আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া।

১৩৮

পথের বাধা

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চল্‌তে না পাই,—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে[1] মুর্‌শেদে॥
ডুইব্যা যাতে[2] অঙ্গ জুড়াই
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই, ৫
তবে অভেদ-সাধন মর্‌লো ভেদে॥
ওরে প্রেম-দুয়ারে নানান্ তালা—
পুরাণ কোরান তসবী[3] মালা,
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা,
কাঁইন্দ্যা মদন মরে খেদে॥ ১০

—সেখ মদন বাউল

(১) গুরু, ধর্ম্মোপদেষ্টা। (২) যে ধর্ম্মেতে শান্তি মৈত্রী অভেদজ্ঞান লাভ হয়।
(৩) জপমালা।

১৩৯

রস-স্বরূপ

চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি,
প্রাণ-রসনায়[১] দেখ্‌রে চাইখ্যা রসের সাঁই[২] খাঁটি!
রূপের রসের ফুল ফুট্যা যায়,
মরম-সূতা কই?
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশী ৫
আমি শুইন্যা আকুল হই।
আমার মিলনমালা হইল না রে,
আমি লাজে পথ হাঁটি।
আমি চলি দূর আর দূর,
তবু সমান শুনি সুর, ১০
কত দূর আর যাবি বান্দা,
সবই সাঁইয়ের পুর।
আরে যেই সমুদ্র সেই দরিয়া, সেই ঘাটের ঘাঁটী[৩]।

—বাউল

(১) অন্তরের অনুভূতির দ্বারা। (২) স্বামী। (৩) মাঝি।

১৪০

রহস্যময়ী

তোমার কে মা বুঝ্‌বে লীলে ?

তুমি কি নিলে—কি ফিরিয়ে দিলে ?

তুমি দিয়ে, নিচ্ছ তুমি,

বাছ্ রাখ না সাঁঝ-সকালে—

তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য— ৫

মাপাও যেমন যার কপালে !

তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী

ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে ;

তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি

জলেই তুমি ভাসাও শিলে ! ১০

তোমার জারিজুরি আমার কাছে

খাট্‌বে না, মা, কোন কালে ;—

ও-সব ইন্দ্রজালের যন্ত্র[১] জানে—

রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে !

—রামপ্রসাদ সেন

(১) তোমার লীলার কৌশল ।

১৪১

অভিমান

মা মা ব'লে আর ডাক্‌বো না !
ওমা দিয়েছ—দিতেছ—কতই যন্ত্রণা !
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,—
আর কি ক্ষমতা রাখ, এলোকেশী ?
না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষে মেগে খাব, ৫
মা ব'লে আর কোলে যাব না !
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে—
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে ?
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে—
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ? ১০

—রামপ্রসাদ সেন

১৪২

রসের তিমির

আমার ডুব্‌লো নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে !
গভীর কালোয় যমুনাতে চল্‌ছে লহরী,
—রসের লহরী—
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী ! ৫

—সাঁইয়ের বাঁশরী—

আমি বাইরে ছুটি বাউল হ'য়ে সকল পাসরি

—ঘর ছাড়িয়ে—

শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে।

আমার চোখ্ ডুবেছে রসের তিমিরে! ১০

—বাউল

— —

১৪৩

নিরাকারা তারা

এমন দিন কি হবে তারা!

যবে 'তারা, তারা, তারা' ব'লে

তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা!

হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,

তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা!

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ছুটে যাবে মনের খেদ,

ওরে শত শত সত্যবেদ—তারা আমার নিরাকারা!

শ্রীরামপ্রসাদ রটে— মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,

ওরে আঁখি অন্ধ! দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা!

—রামপ্রসাদ সেন

১৪৪

কমল ও ভ্রমর

হৃদয়-কমল[১] চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি',
তাতে তুমিও[২] বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তায় বিশেষ[৩]।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই, ৫
তাই তুমিও বাঁধা[৪], আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই

—বাউল

(১) যুগযুগান্তের বিকাশশীল মানব-হৃদয়। (২) স্রষ্টা ভ্রমররূপে। (৩) প্রস্ফুটিত মানব-হৃদয়ের মাধুর্য্য। (৪) ভক্তাধীন ভগবান্‌।

বঙ্গ-বীণা

[তৃতীয় স্তবক]

১৪৫

মাতৃভাষা

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন

তা' সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি',

পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

পর-দেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'[১]।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি' ৫

অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায় মন,

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি';

কেলিনু[২] শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে—

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, ১০

এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?—

যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি' ঘরে!"

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে

মাতৃ-ভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১) বিদেশী নানা ভাষা শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। (২) ক্রীড়া করিলাম।

১৪৬

কল্পনার গতি

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখী, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে, ৫
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণু-রবে দেশ। কিংবা শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে[1]
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি। ১০
কিংবা সে ভীষণ ক্ষেত্রে যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে
নাহি স্থল যথা, দেবি, নাহি তব গতি।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১) দুর্গাপূজার প্রশস্ত কাল বাসন্তী সপ্তমী ; রামচন্দ্র শারদ সপ্তমীতে নিদ্রিতা দুর্গার বোধন করিয়াছিলেন।

১৪৭

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ॥

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,

ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্, ৫

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে ! ১০

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্

রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। ১৫

বাহুতে তুমি মা শক্তি,

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে[১] ॥

(১) মাতৃভূমি শক্তি-স্বরূপিণী : মন্দিরে যত শক্তি-প্রতিমা পূজিত হন সে-সকলই কবির চক্ষে মাতৃমূর্ত্তি।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী, ২০
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্। ২৫
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪৮

যমুনা-লহরী

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও!

কত কত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি' ও;
পড়ি' জল নীলে ধবল সৌধ-ছবি ২৫
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।

যুগযুগবাহী প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও;
তব জলবুদ্বুদ সহ কত রাজা
পবকাশিল লয় পাইল ও। ১০

কলকল ভাষে বহিয়ে, কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও;
স্মরণে আসি' মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত-গাথা ও।

তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা ১৫
গরজিল কোন দিন সমরে ও;—
আজি শব-নীরব, রে যমুনে, সব
গত যত বৈভব কালে ও!

শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও; ২০
কাঁপিল দেশ তুরগ-গজ-ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

তব জল-তীরে পৌরব যাদব
পাতিল রাজসিংহাসন ও;
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি' ২৫
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ-পতাকা
উড়িতে দেশবিদেশে ও,
তিব্বত চীনে ব্রহ্ম তাতারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ? ৩০

এ জল-ধারে ধারে বহিল কভু
প্রেম-বিরহ-আঁখিনীব ও—
নাচিল গাহিল কত সুখ-সম্পদে
এ তব সৈকত-পুলিনে ও !

এ তনু-মুকুরে আসি' পূর্ণশশী ৩৫
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও,
ভাসিত দশদিশি উৎসব-রঙ্গে
প্লাবিত চিত সুখ-উৎসে ও !

সে তুমি, সে শশী, ধীর অনিল সেই,
তবু সব মগন বিষাদে ও ; ৪০
নাহিক সে সব প্রমোদ-উৎসব—
গ্রাসিল সকলে কালে ও ।

যে মুরলী-রবে নিবিড় নিশীথে
উন্মাদিত ব্রজবালা ও ;
আকুল প্রাণে তব তট পানে ৪৫
ধাইত রব-সন্ধানে ও ;

বৰ্দ্ধিত বিরহে শ্বাস-পবন কত
বিরচিত বলি তব হৃদয়ে ও ;
সুহৃদ সমাগমে পুনঃ এই দর্পণে
প্রতিবিম্বিত সিত হাসি ও ! ৫০

সে সব কৌতুক কাল-কবল আজি
লেশ না রাখিল শেষ ও।
কোথা সেই গৌরব নিকুঞ্জ-সৌরভ ?
হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও !

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয় ৫৫
ভাতিল কত শত রাজা ও ;
আসিল স্থাপিল শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

কত শত দুৰ্জ্জয় দুৰ্গম দুর্গে
বেড়িল তব তটদেশে ও ; ৬০
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে
চিরযুগ সম্ভোগ-আশে ও।

উপহাসি সৰ্ব্বে মানব-গৰ্ব্বে
কাল প্রবল চিরকাল ও—
গৃহ-গড়-পুঞ্জে কতিপয় তুঞ্জে ৬৫
রাখিল করি' বিকলাকৃতি ও !

ঐ পুরোভাগে ভগ্নবিভাগে
গৃহবর শেষ শরীরে ও,
দেখিছ যে সব উজ্জ্বল রেখা,
সে গত-যৌবন রেখা ও। ৭০

এর অলিন্দে সুন্দরীবৃন্দে
মোগল নরপতি-কেশরী ও,
বসি' ও মর্ম্মরে উল্লাস অন্তরে
তৌলিত মোহন রূপে ও।

কভু এ গবাক্ষে কৌতুক চক্ষে ৭৫
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও,
নিম্ন প্রদেশে সে গজ-যুদ্ধ
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।

যে গৃহ-অঙ্গে বহুবিধ রঙ্গে
বিখচিত ছিল মণি-রাজি ও, ৮০
সে সব কালে, হরি' এক কালে,
ঢাকিল লূতাজালে ও।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

১৪৯

নির্জীব ভারত

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে ;
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে—
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় !
অই দেখ সেই মাথার উপরে, ৫
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্‌ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত, ১০
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপে ছিল;
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দুবীরদর্প, বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে সাগর জঙ্গম ১৫
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?
সকলি তো আছে—সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই ?

প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথারে আজি সে জাতিমহিমা ? ২০
হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি—
আর কি ভারত সজীব আছে ?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত, ২৫
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত—
হায়রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮০

ধর্ম্মহীনতা

চাই না সভ্যতা, চাষা হ'য়ে থাকি ;
দাও ধর্ম্মধন প্রাণে পূরে রাখি।
হায় জন্মভূমি ! পুণ্যভূমি তুমি,
দাও পুণ্যবারি দগ্ধপ্রাণে মাখি।
ধর্ম্মহীন হ'ল ভারত-সন্তান ! ৫
কারে ডেকে বলি ? পশুর সমান

ইন্দ্রিয়-সেবায় সবে মগ্নপ্রায় ;—
তবে তোর, মাতা, কই পরিত্রাণ ?
শুধু চক্ষু-জলে কি হবে ভাসিলে
তা'তে কি রজনী হ'বে অবসান ? ১০
সুদৃঢ় সংকল্পে আজ প্রতিজন
করুক উৎসর্গ নিজের জীবন ;
দেখি দেখি তায় যায় কি না যায়
এ ঘোর দুর্দ্দশা রজনী সমান !

—শিবনাথ শাস্ত্রী

১৫১

গঙ্গার উৎপত্তি

হরি-নামামৃত পানে বিমোহিত
সদা আনন্দিত নারদ ঋষি,
গাহিতে গাহিতে অমরাবতীতে
আইল একদা উজলি দিশি।

"হিমাদ্রি অচল, দেবলীলা-স্থল, ৫
যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত পবিত্রস্থান ;
অমর, কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি' জুড়ায় প্রাণ ;

যাহার শিখরে   সদা শোভা করে
  অসীম অনন্ত তুষাররাশি ;   ১০
যাহার কটিতে,   ছুটিতে ছুটিতে,
  জলদ-কদম্ব[1] জুড়ায় আসি।

যেখানে উন্নত   মহীরুহ যত
  প্রণত উন্নত শিখর-কায়
সহস্র বৎসর   অজর অমর   ১৫
  অনাদি ঈশ্বর-মহিমা গায় !

সেই হিমগিরি-   শিখর উপরি
  অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ
আসিত প্রত্যহ   ভকতির সহ
  ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদিকারণ।   ২০

চারিদিকে স্থিত,   দিগন্তবিস্তৃত,
  হেরিত উল্লাসে তুষাররাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত   বিস্ময়ে ভাবিত
  অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি !”

বলিতে বলিতে   আনন্দ-বারিতে   ২৫
  দেবর্ষি হইল রোমাঞ্চ-কায়—
ঘন ঘন স্বর   গভীর প্রখর
  তানপুরা-ধ্বনি বাজিল তায়।

(১) সমূহ।

গাহিল নারদ ভাবে গদ-গদ—
"এমন ভজন নাহি রে আর— ৩০
ভূধর-শিখরে ডাকিয়া ঈশ্বরে
গাহিতে অনন্ত মহিমা তাঁর।

ইহার সমান ভজনের স্থান
কি আছে মন্দির জগৎমাঝে,
জলদ-গর্জ্জন তরঙ্গ-পতন ৩৫
ত্রিলোক চমকি' যেখানে বাজে?

কিবা সে কৈলাস, বৈকুণ্ঠনিবাস,
অলকা[১] অমরা[২] নাহিক চাই—
জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই!— ৪০

ঋষি কয়জন সন্ধ্যা সমাপন
করি' একদিন বসিলা ধ্যানে;
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে—

'রাখ ঋষিগণ, সমূলে নিধন ৪৫
মানব-সংসার হ'লো এবার;
হ'লো ছারখার ভুবন আমার
অনাবৃষ্টি-তাপ সহে না আর।'

(১) মেঘদূতকাব্যে বর্ণিত কল্পলোক। (২) স্বর্গ।

শুনে ঋষিগণ ক'রে দৃঢ় পণ
যোগে দিল মন একান্ত চিতে ; ৫০
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধনা
করিতে লাগিলা মানব-হিতে।

মানব-মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে ৫৫
হইল অসীম করুণোদয়।

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময় ;
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয় ! ৬০

ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর নাহি কোনো স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিত-প্রায় ;
নিবিড় আঁধার জলধি-হুঙ্কার
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে ৬৫
গগনে হইল কিরণোদয় ;
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয় ।

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা,
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়— ৭০
ব্রহ্ম-সনাতন- অতুল-চরণ,
সলিল-নির্ঝর বহিছে তায়।

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী ;
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে ৭৫
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

গভীর গর্জ্জনে দেখিনু গগনে
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু হ'তে আবার
জলস্তম্ভ ধায় রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি' বিদার। ৮০

ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে
সেই বারিরাশি পড়িল আসি'
ভূধর-শিখর সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিল-রাশি।

ছুটিল গর্ব্বেতে গোমুখী-পর্ব্বতে ৮৫
তরঙ্গ সহস্র একত্র হ'য়ে,
গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ ল'য়ে।

পালকের মতো ছিঁড়িয়া পর্ব্বত
কুঁদিয়া চলিল ভাঙিয়া বাঁধ, ৯০
পৃথিবী কাঁপিল তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশরী-নাদ।

তরঙ্গ-নির্গত বারিকণা যত
হিমানী-চূর্ণিত আকার ধরে,
ধূমরাশি-প্রায় ঢাকিয়া তাহায় ৯৫
জলধনু-শোভা চিত্রিত করে।

ছাড়ি' হরিদ্বার শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা,
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতী-জল
বহিল তরঙ্গ পারার পারা। ১০০

অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে
হইল সকলে আনন্দে ভোর,
'জয় সনাতনী পতিত-পাবনী'
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫২

সমুদ্র

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু ; সুনীল সলিলরাশি
রবির সুবর্ণ করে বিকাশি' সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেনপুষ্পমালা ঢালি'।
অনন্ত সিন্ধুর এই অনন্ত অস্ফুট গীত ৫
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত সুখ-দুঃখ-বিজড়িত—
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর বিমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর! ১০
খেলিছে তরঙ্গমালা—শিরে ফেনপুষ্পরাশি—
সমুদ্র-মন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি'।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরল হৃদয়-সিন্ধু, তরঙ্গ অনন্তোচ্ছ্বাস।

—নবীনচন্দ্র সেন

১৫৩

সাগরে তরী

হেরিনু নিশায় তরী অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি' ধীরে ধীরে চলে,
সুধবল পাখা মরি বিস্তারি অম্বরে।
রতনের চূড়ারূপে শিরোদেশে জ্বলে   ৫
দীপাবলি মনোহরা নানাবর্ণ করে,[১]
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে—
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।   ১০
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে-ব্যস্তে সরি',
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি',
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১) আলোকে।

১৫৪

প্রভাত-চিত্র

হেরে আলো চোখ জুড়ালো, কোকিল করে গান ;
বৌ-কথা-কও ক'রে বিনয় ভাঙ্ছে বৌয়ের মান।
মাথা তুলি' মরালগুলি নদীর কূলে ধায়,
চরণ দিয়ে জল কাটিয়ে সাঁতার দিয়ে যায়।
ঘোম্টা দিয়ে ঘাটে বসিয়ে ছোট বৌয়ের কুল   ৫
মাজ্ছে বাসন বাজ্ছে কেমন তাবিজ্ লঙ্গফুল ;
পরস্পরে মধুর স্বরে মনের কথা কয় ;
ঘোম্টা থেকে, থেকে থেকে, হাসির ধ্বনি হয় ;
অনেক মেয়ে গামছা দিয়ে, ঘষ্ছে কোমল গা,
পশি' জলে মুখে বলে 'নিস্তার' গো মা !'   ১০
উঠে কূলে এলো চুলে বসে' সুলোচনা
মাটি দিয়ে শিব গড়িয়ে কচ্চে উপাসনা ;
কত কুমারী, সারি সারি, দুল্‌চে কানে দুল্,
কানন হ'তে, কচুর পাতে, আন্‌ছে তুলে ফুল।
আস্তে ঝাড়ি তুঁষের হাঁড়ি আগুন ক'রে বা'র,   ১৫
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, যাচ্ছে চাষার সার।
পান্তা খেয়ে, শান্ত হ'য়ে, কাপড় দিয়ে গায়,
গরু চরাতে, পাঁচন হাতে, রাখাল গেয়ে যায়।

গাভীর পালে দোয় গোয়ালে, দুধে কেঁড়ে ভরে ;
গজগামিনী গোয়ালিনী বসে বাছুর ধ'রে। ২০
হাস্‌ছে বালা, রূপের ডালা, মুচ্‌কে মধুর মুখ,
গোপের মনে, দুধের সনে, উঠ্‌চে কেঁপে সুখ।
গাছের তলে, বেড়ে অনলে, ব'লে "ববম্‌ বম্‌",
জটাশিরে সন্ন্যাসীরে মার্‌ছে গাঁজায় দম্‌।
তাড়ী বগলে, ছেলের দলে পাঠশালাতে যায় ; ২৫
পথে যেতে, কোঁচড় হ'তে, খাবার নিয়ে খায়।

—দীনবন্ধু মিত্র

১৫৫

মধ্যাহ্ন

চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগদিগন্তর উদাস মূরতি
উদার স্ফূরতি পায়।
বিমল নীল নিথর শূন্য ৫
শূন্য-শূন্য—অগম শূন্য ;
দূর—অতি দূর দুপাখা ছড়ায়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম্,
নত-মুখ ফুল-ফল, ১০
নত-মুখী লতা নেতায়ে পড়েছে
স্তবধ সরসী-জল ;
শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম মূঢ় পশুপ্রাণী,
ঘুঘুঘু—ঘুঘুঘু কাতরা কপোতী ১৫
করুণা[১] করিয়া গায়।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

১৫৩

সন্ধ্যারাণী

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে,
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেম-বাণী। ৫
নব নীলোৎপল মত
আঁখি দুটি অবনত,
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ।

(১) কাতর স্বরে।

পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে— ১০
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন।
আসে ধনী আথিবিথি,[১]
কপালে তারকা-সীঁথি,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দীনান্ত-তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে ১৫
স্তব্ধ অন্ধকার ঢুলে,
দিগন্ত-বসনাঞ্চলে কত না রতন।
ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে, তুলসী-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে হেরিছে ধরণী। ২০
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

(১) অস্তেব্যস্তে, সত্বর।

১৫৭

নিশীথ

গভীর নিশীথ মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তিসুধাপানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি' দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার। ৫
গাছ-পালা ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় পড়ি' আছে কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই॥
কীট-পতঙ্গের মাঝে খদ্যোৎ কেবল,
পঞ্চভূত মাঝে বায়ু শিশির শীতল, ১০
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছে রে জীবের লক্ষণ॥

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮

অরণ্যে

কভু বাদুড়ের পাখা, ঝাপটি তরুশাখা,
গতি করিয়া বাঁকা ব্যজিয়া[১] যায়!

(১) বাতাস করিয়া।

কভু বা বনবিড়াল বাহিয়া উঠি ডাল
ল'য়ে লুটের মাল লাফায় গায় !
গরজন সুবিকট হইল সন্নিকট ৫
গোমৃগ ঝট্ পট্ খুঁজে আড়াল ।
কখনো বা ঝোপ-ঝাড় করিয়া তোলপাড়
পালায় হুদ্দাড় মৃগের পাল !

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৯

যমুনাতটে

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল !
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুল-মধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল !
কুসুম, পল্লব, লতা, নিশার তুষারে ৫
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখা'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে, জগৎ ঘুমায় ;—

হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায় । ১০

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ, ১৫
কতই বিষাদ আসি' হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি', কত গড়ি', কত করি' সাধ,
কত হাসি', কত কাঁদি', প্রাণ জুড়াইল!
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্ত-ভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল! ২০

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬০

গ্রাম্য-ছবি

মাটীতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটীর উঠান।
খড়ো চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে করেছে উথান।
পিঁজারায় বস্ত্র-বাঁধা বউ-কথা কহে কথা, ৫
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে,
মঞ্চে তুলসীর চারা গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।

কানে দুল দুল্‌দুল্‌, গাছ-ভরা পাকা কুল
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে, ১০
ছোট হাতে জোর ক'রে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে, হাত লয় টেনে।
পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁসী দুটি করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন। ১৫
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখীদল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরণ।
লুটায় চুলের গোছা, বালাদুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে ২০
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে,
তরুতলে রাখাল শয়ান,
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে,
সাথে মিশে ঘুঘুর সে তান। ২৫

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১৬১

নিদ্রামগ্ন জগৎ

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশান্ত দশ দিশি !
জোৎস্নায় ঘুমায় তরুলতা ;
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,
নাই কোন সাড়া শব্দ, ৫
পাপিয়ার মুখে নাই কথা ।
ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে,
জ্যোৎস্নার আলোক আসি' ফুটেছে অধরে ।
সাদা সাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা-দেলা ভুলি ; ১০
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে—
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে ।
দূরে দূরে নীল জলে
দু'একটি তারা জ্বলে,
আমার মুখের পানে দীপ্‌ দীপ্‌ চায়, ১৫
ওদের মনের কথা বুঝা নহি যায় ।
একা বসি' নির্জ্জন গগনে
বল শশী, কি ভাবিছ মনে ?

একটু বাতাস নাই
তবু যেন প্রাণ পাই ২০
তোমার এ অমৃত কিরণে।
ফুলবনে ফুল ফুটে আছে,
কেহ না সঞ্চরে কাছে কাছে,
তেমন আমোদ ভবে
কে আর আদর করে— ২৫
আজি সমীরণ কোথা গেছে!
মানবেরা ঘুমায়ে এখন,
মোহ-মন্ত্রে হ'য়ে অচেতন,
নিসর্গের[1] ছেলেমেয়ে
কেন গো রয়েছে চেয়ে— ৩০
তোমরা কি সাধের স্বপন?
সব চেয়ে, সুধাকর,
তব মুখ মনোহর,
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায়।
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে ৩৫
কত কথা জাগে প্রাণে—
জানকী অশোকবনে দেখেছে তোমায়।
কেকয়ী-বিষাক্ত-শর-
জরজর-মরমর-

(১) বিশ্বপ্রকৃতির।

থরথর-কলেবর পাগলের প্রায়— ৪০
কি চক্ষে হে, দশরথ দেখিল তোমায়,
তুমিই বলিতে পার,
তুমিই বলিতে পার,
ভাবিয়া বিহ্বল মন, বুঝা নাহি যায়।
ওই রে জীবনদীপ নিবু-নিবু-প্রায়— ৪৫
ওই রে অন্তিম আশা আঁধারে মিশায়—
মনের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়—
কোথা রাম রাজা হবে, বনে কেন যায়!
জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস-বাল্মীকিরে,
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটীরে। ৫০
তপোবনে ছেলে দুটি
কচিমুখে হাসি ফুটি',
জননীর কোলে বসি' দেখিত তোমায়,
কি যে সে কহিত বাণী
জানে তাহা ফুলরাণী, ৫৫
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায়;
করি' সে অমৃত পান
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ
ভারত পাতাল আজো অমরার প্রায়!

(১) লব ও কুশ।

উথলে অমৃতরাশি ৬০
মুখেতে ধরে না হাসি,
বিশ্বের প্রেমিক, ওহে প্রিয় সুধাকর,
প্রেয়সীর ও থরথর
হাসিমাখা বিম্বাধর,
সাধের স্বপনময়ী মূর্ত্তি মনোহর ! ৬৫
আর কিছু নাই সুখ
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দু-ই পাই ;
যাই আমি যেই খানে
যেন আমি খোলা প্রাণে ৭০
একমাত্র পবিত্র প্রেমেব গান গাই !

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

১৬২

বাসন্তী পূর্ণিমা

বসন্তের পৌর্ণমাসী ; কি শোভা ফুটিছে !
সুধার সাগরে যেন তরঙ্গ উঠিছে।
সুনীল আকাশ, নাই একটুকু রেখা ;
ডুবেছে নক্ষত্র কত, নাহি যায় দেখা।

উঠিছে জ্যোৎস্নার ঢেউ কানায় কানায়, ৫
না ধরে ব্রহ্মাণ্ডে যেন উছলিয়া যায় !
চন্দ্র যেন প্রেমে হেসে ঢালিয়া কিরণ
প্রসুপ্ত ধরার মুখে দিতেছে চুম্বন !
প্রাণের আরামে কিম্বা দিবস ভাবিয়া
তরুকুঞ্জে কভু পাখী উঠিছে ডাকিয়া। ১০
ফুটেছে অগণ্য ফুল ; বায়ু মাতোয়ারা ;
খুলিয়া গিয়াছে যেন সুখের ফোয়ারা।
সে আলোকে শোভে শত কুসুম-কলিকা ;
আশে পাশে হাসে যেন সরলা বালিকা।
অঙ্গে লাগে জ্যোৎস্না-রস, নাসাতে সুঘ্রাণ, ১৫
কি অপূর্ব্ব সুধা-রসে ডুবাইছে প্রাণ।
কতই হইল রাতি ; উড়িয়া বাদুড়
পড়িছে কলার গাছে করি' হুড়হুড় ;
অদূরে আমের বনে বায়ু সরসর ;
চিকিমিকি খেলে পত্রে সুধাংশুর কর ; ২০
মর্ম্মরিয়া শুষ্কপত্র বনজন্তু যায় ;
স্বপনে ডাকিয়া পাখী আবার ঘুমায়।
ব্রহ্মাণ্ডের সাঁ সাঁ রব ব'হে আসে কানে ;
পরাণ ডুবিছে তাহে, সে ডোবে পরাণে।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

১৬৩

অশোক তরু

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা চরণ চুম্বনে[1]
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল ?
কোন্ দোল পূর্ণিমায়, নববৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ, প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন্ চির-সধবার ব্রত উদযাপনে ৫
পাইলি বাসন্তী শাড়ী, সিন্দূর-বরণ ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ?
বৃথা চেষ্টা ; হায়, এই অবনী মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর[2] তরু-জীব-প্রাণী ! ১০
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !
শৈশবের আব্‌ছায়ে শিশুর 'দেয়ালা' ;
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১) সংস্কৃত কবিরা বলেন, সুন্দরী রমণীর পদস্পর্শ না পাইলে অশোকের ফুল ফুটে না। (২) যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে।

১৬৪

আতা

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রুর,
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজ-সুন্দরীর !
চাহিনাক 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন রুচির !
একটুকু রসে-ভরা চাহি না আঙ্গুর, ৫
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটির !
চাহি না 'গন্না'[১]র স্বাদ, কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতীর !
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া ; ১০
চঞ্চলা বেগম্ কোন্ হ'য়ে উল্লসিতা
ভাঙ্গিত ; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া !
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু—আনন্দে গুমরি',
যেত মরি রসিকার রসনা-উপরি !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১) লক্ষ্ণৌ সহরে ইক্ষুকে 'গন্না' বলে। গাঙ্গেরী।

F. 13

১৬৮

বাঙ্গালার ফল

রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তা'র ?
সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তা'র তার।
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর
কারণ-সলিলে[১] পূর্ণ তাহার উদর।
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ? ৫
পানমাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর।
কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাসে,
পথিকের শ্রান্তি, ক্লান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাশে।
আর এক ফল আছে নাম আনারস,
নন্দন-কানন থেকে বুঝি আনা রস। ১০
নন্দন-পতির ন্যায় সহস্র লোচন,[২]
উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-বরণ।

(১) ব্রহ্মার হিরণ্ময় অণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড। সৃষ্টি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহার মধ্যে বস্তু উৎপত্তির কারণ দ্বারা পূর্ণ জল থাকে, পরে সেই কারণ-সলিল হইতে বস্তু উৎপন্ন হয়। নারিকেলের জলের মধ্যে তেমনি ভাবী নারিকেল-গাছের সম্ভাবনা নিহিত থাকে।
(২) ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু।

শিরেতে পল্লবগুচ্ছ পুচ্ছের আকার,
হেমময় কিরীট কাননে অবতার।
অপূর্ব্ব সৌরভামোদে মেতে উঠে মন ১৫
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যুটে মধুকরগণ।
বিফলে ছুটিয়া আসা, বিফল সে বোঁটা,
অলির অসাধ্য খেতে রস এক ফোঁটা।
যথা কৃপণের ধনে যাচক বঞ্চিত
গতায়াত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিত। ২০

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৬

পাখীর প্রতি

ওহে পাখী, বল দেখি, কে তোমায় শিখালে গান।
তব সুললিত তানে উদাস হইল প্রাণ।
লুকাইয়ে তরুশাখে,
বারে বারে ডাক যাঁকে,
বলিতে কি পার তাঁর কোথায় পাব সন্ধান? ৫
ইচ্ছা হয় তোমা সনে,
ডেকে ডেকে বনে বনে,
ফিরি তাঁর অন্বেষণে দোঁহে মিলি ধরি তান।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল
(চিরঞ্জীব শর্ম্মা)

১৬৭

আঁখির মিলন

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন।
ভুলিল রে ধূলি-খেলা, ভুলিল সঙ্গীর মেলা,
বাহু পসারিয়া করে আত্মসমর্পণ।
আঁখিযুগ বিস্ফারিয়া হাসিরাশি ছড়াইয়া, ৫
জননীর কম্বকণ্ঠ করিল ধারণ।
নাচে সিন্ধু শশিকরে, টানে রবি ধরণীরে,
যাদুরে করিল যাদু জননী-বদন।
ওই আঁখির মিলন।

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে, ১০
আঁখির মিলন!
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতীর হ'ল তবু শত আলাপন।
হ'ল মন জানাজানি, হ'ল প্রাণ টানাটানি,
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন, ১৫
বিজয়ার কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন লেপন—
ওই আঁখির মিলন।

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন ! ২০
পাখী, শাখী, তরঙ্গিণী, করে সুমধুর ধ্বনি,
"আয় ক্ষ্যাপা, ধেয়ে আয়, পাবি দরশন !"
ফেল্ ফেল্ করি চায়, ভেবে নাহি ঠিক পায়,
কোন্ দিকে ? হায় ও যে সকলি মোহন !
প্রকৃতির সাথে হয় কবি-চিত্ত-বিনিময় ২৫
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন—
ওই আঁখির মিলন !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৬৮

ফুলের প্রণয়

ফুলের প্রণয়-ভাষা মরি কি মধুর রে !
আঁধারে আঁধারে থাকি',
পাতায় পাতায় ঢাকি',
আপনার মনে ফুটি মরে' থাকে সরমে ।
হৃদয়ে সৌরভ আছে, ৫
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে, উহু ! বাজে তার মরমে—
কিবা নব অনুরাগ কামিনী-কুসুমে রে !

—নবীনচন্দ্র সেন

১৬৯

শিশুর হাসি

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে !
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্তে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে কি হে, করিলে সৃজন ? ৫
সৃজিলে কি নিজ সুখে ?
কিংবা, বিধি, নর-দুখে
মনে ক'রে, ও হাসিটি করেছ অমন ?

জানি না, তুমিই কি না আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি ? ১০
গড়েছ ত এত নিধি—
উহার মতন বল কি আর গড়িলে ?
কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন ? ১৫
ফুলের লাবণ্য বাস,
অথবা শিশুর হাস,
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ !

দেখায়েছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে ? ২০
কি বলিল তারা সবে ?
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?
কিংবা চেয়েছিল তারা, তুমিই না দিলে ;
দিয়াছ এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়, ২৫
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?
কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭০

নারী-সৃষ্টি

নবীন জনমে নর জাগি' সচকিতে
শ্যাম কান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে,
চরাচর বিরহে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল, ৫
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখী গায় বসি' শাখী'পরে,
সবে সুখী, নর শুধু কাতর অন্তরে !

শূন্য মনে বসি' শূন্য আকাশের তলে
শূন্য দেখে শোভিত সংসার ! ১০
নিরখিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধিবলে
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার !—
বুঝি ভাব মানবের
ধাতা তার মানসের
করিলেন প্রতিমা রচনা;— ১৫
ভূলোক পুলক-পূর্ণ—জন্মিল ললনা !

াবার তরে ফুল ঝরে' পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী, মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে ! ২০
স্পর্শে পদ রাগ-ভরা
অশোক লভিল ধরা;—
এলোকেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বন-ফুল, কোন্ গগনের শশী !

চন্দ্রোদয়ে হয় যথা তিমির তাড়িত, ২৫
টুটিল মালিন্য মানবের !
অজানিত হর্ষভরে ব্যাকুলিত চিত
ঘুচিল বিরাগ জীবনের !

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৭১

স্বভাবসুন্দরী

বসন্তের উষা আসি রঞ্জি' দিল যুগল কপোলে ;
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার !
নিদাঘের রৌদ্র আসি' বিলসিল ললাট নিটোলে ;
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা ছটার !
ঘনঘোর বর্ষারাত্রি বিহরিল অলক নিচোলে; ৫
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার !
নাচিল শরৎ-শশী রূপ-হ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ ফুলে ফুলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !
রাহু-কেতু, দুই ঋতু শীত ও হেমন্ত শুধু, হায়,
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি' ছড়াইল কঠিন তুষার ; ১০
তাই, প্রিয়ে, তাই বুঝি, সুকঠিন হৃদয় তোমার ?
উপাসনা আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায় !
আমি গো বুঝিতে নারি, দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী,
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিংবা ঘোরা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী !

— দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৭২

বঙ্গনারী

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম-হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল, ৫
হৃদে পূরি' পরিমল,
থাকে প্রিয়-মুখ চেয়ে মধু-মাখা শরমে ?
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

কি ফুলে তুলনা দিব বল,—চূত-মুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল ১০
খুঁজিলে এ ধরাতল
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস
নবরসে পরকাশ
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে— ১৫
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৩

পরিচয়

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল্!
উঠিছে পড়িছে ফিরে, নামিছে উঠিছে কি রে
রূপ-হর্ম্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্ত গৃহে খুলিয়া অর্গল? ৫
সুন্দরীর উচ্চ হাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে ফিরে আনন্দে চঞ্চল?
ঝমর ঝমাৎ ঝম্ ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্—
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল?
মল্ বলে, "আমি যার 'বধূ' সে গো নহে আর, ১০
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল!"—
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে,
চঞ্চল-চরণ দাসী সহসা নিশ্চল!
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল্!

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল্! ১৫
ঝিল্লি সাথে নিশি বায় ঝাঁপতালে গীত গায়,
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল,

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ ঝমর্ ঝমর্ ঝম্
তেমতি কাহার পায় বাজে ওই মল্?
মল্ বলে, "আমি যার, বধূ সে গো নহে আর, ২০
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল।"
'খোকার ঝিনুক কই?' মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার নয়নে অনল।
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ বাজে ওই মল্!

ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমু বাজে ওই মল্! ২৫
পদ্মদলে পরবেশি' হারাইয়া দশ দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে ফিরে হইয়া পাগল?
কেন হেন ম্রিয়মাণ হেমন্তে পাখীর প্রাণ,
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল?
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমু বাজে ওই মল্! ৩০
মল্ বলে, "আমি যার চিরলজ্জা সখী তার,
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ-হলাহল!"
ঘোম্‌টা টানি মাথায় সেজো বউ চলি যায়,
পদ্মদলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল!
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু, ঝুমুর ঝুমুর্ ঝুমু বাজে ওই মল্! ৩৫

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্ বাজে ওই মল্!
মিলন-লজ্জার বুকে মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরা "হেথা হ'তে চল্, সখি, চল্!"

প্রগল্‌ভা হাসিতে চায়, গুরুজন ! এ কি দায় !
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল ! ৪০
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
মল্ বলে, "বল্, ওরে সরে' যেতে বল্ !"
কবি বলে, "আসে ওই আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু, ভরমে বিকল !"
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্ ওই বাজে মল্ ! ৪৫

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৭৪

সুধা না গরল ?

বুঝিতে পারি না, সখা, বল
এ কি প্রেম ?— সুধা না গরল ?
শিরা উপশিরা যায় জ্ব'লে,
জুড়ায় না প্রলেপন দিলে ।—
বুঝি তবে প্রণয় গরল ! ৫
বল, সখা, বল মোরে তবে,
প্রেম যদি কালকূট হবে,
ত্যজিতে পারি না কেন তারে ?
রাখি কেন বুকের মাঝারে ?

মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া ? ১০
—তবে বুঝি প্রণয় অমিয়া ?—
পড়িয়াছি সন্দেহের ঘোরে,
দেহ সখা বুঝাইয়া মোরে।

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১৭৮

বংশীধ্বনি

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি' দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি, সজনি শুনি জলধর-ধ্বনি ৫
কেমনে ধৈরজ ধরি' থাকি লো এখন্ ?
যাক্ মান, যাক্ কুল— মন-তরী পাবে কূল,
চল ভাসি' প্রেম-নীরে ভেবে ও চরণ !

মানস-সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল-কাননে ! ১০
কমলিনী কোন্ ছলে থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শঙ্কর-অরি, ১৫
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে !

ওই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন রে
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে,
আমি শ্যাম-দাসী। ২০
জলদ-গরজে যবে ময়ূরী নাচে সে রবে—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে ভ্রমে সদানন্দ মনে—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকা-বিলাসী ?

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে রে, ২৫
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদে পিরীতের ফুল-ফাঁদে
পাতিছে ধরণী।
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে ! ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে রমণী। ৩০
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই—
মণি-হারা ফণিনী কি বাঁচে লো সজনি ?

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে
অবিরাম-গতি,—
গগনে উদিলে শশী হাসি যেন পড়ে খসি’, ৩৫
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে র’ব আমি—ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশুনিধি দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ-আঁধারে আমি—ধিক্ এ যুকতি ! ৪০

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি’ দেখি গে প্রাণের হরি,
গোকুল-রতন।
মধু কহে, “ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙ্গা চরণে, ৪৫
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন !
যৌবন মধুর কাল আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেম-মধু করিয়া যতন !”

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৭৬

প্রেমের চক্ষু

কালার রূপে জগৎ আলো।
আমার শ্যামের রূপে জগৎ আলো।
ভালো বাসার অনুরাগে
ভালোবাসায় ভালো লাগে,
ভালোবাসার ভালো সব,—　　　　৫
কালোকে না লাগে কালো।
নিয়ে আমার যুগল আঁখি
শ্যামের পানে চাও দেখি,
ভালো লাগে কি লাগে কালো
এই চোখেতে দেখে বলো॥　　　　১০

—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

১৭৭

যৌবন-নদী

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে!
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

জলেতে তুফান হয়েছে—
আমার নূতন তরী ভাস্‌লো সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে ! ৫
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !
ভেঙ্গে বালির বাঁধ
পূরাই মনের সাধ !
আমার জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, রোধিবে কে !
হরে মুরারে ! হরে মুরারে ! ১০

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭৮

বসন্তে

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল,
চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, ৫
চল লো বনে,
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !
ধূপরূপে পরিমল ১০
আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুল-কল-
মঙ্গল-ধ্বনি ।
চল লো নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, সজনি !
সখি রে,— ১৫
এ যৌবন-ধনে দিব উপহার রমণে !'
ভালে যে সিন্দূর-বিন্দু,
হইবে চন্দন-বিন্দু ;
দেখিব, লো, দশ ইন্দু
সুনখ-গগনে । ২০
চির-প্রেম-বর মাগি লব, ওলো ললনে !
সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল,
চঞ্চল অলিদল, ২৫
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে,
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি মধুসূদনে !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৭৯

অনুসন্ধান

মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি রে।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি', কাহে বিবাগিনী রে?
বৃন্দাবন-ধন, গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে?
দেশ দেশ পর সো শ্যামসুন্দর ফিরে তুয়া লাগি রে।
বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে—বহুত পিয়াসা রে। ৫
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধু যামিনী—না মিটিল আশা রে?
সা নিশা সমরি কহ লো সুন্দরি—কাঁহা মিলে দেখা রে?
শুনি, যাওয়ে চলি, বাজায়ে মুরলী বনে বনে একা রে!

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮০

বৃথা

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হ'লে, পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে ৫
ব্রজের বালা?

আর কি পরিবে কভু ফুল-হার
ব্রজ-কামিনী ?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ? ১০
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?
হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো তমালের তলে ১৫
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর ভাঙ্গি পিকবর
গেছে উড়িয়া !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮১

বিরহিণী

কামিনী-কোমল-মনে বিরহ কি যাতনা !
অনাথিনী জানে, সখি, অনাথিনী-বেদনা ।
যেন ফণী মণি-হারা, নয়নে সলিল-ধারা,
দীনা, হীনা, ক্ষীণাকারা,—অবিরত ভাবনা !

—দীনবন্ধু মিত্র

১৮২

বিরহের সখিত্ব

মৃদু-কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ, ভাল ক'রে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ কাঁদে তব, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ? ৫
এস, সখি, তুমি আমি বসি' এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে।
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে। ১০

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮৩

আর না

প্রেমের কথা আর বোলো না,
আর বোলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা।

ভালো থাকো, সুখে থাকো হে,
আমারে দেখা দিও না। ৫
দেখা দিও না,
নিভানো অনল আর জ্বেলো না।
আর বোলো না, আর বোলো না,
আর তুলো না!
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা। ১০

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪
বিরাগ

সাগর-কূলে বসিয়া বিরলে
হেরিব লহর-মালা।
মন-বেদনা কব সমীরণে,
গগনে জানাব জ্বালা।
প্রতারণাময় মানব-প্রাণ, ৫
আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর,
বহিব না দুখ-ডালা॥

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৫

ভুলিলে কেমনে?

ভুলিলে কেমনে?
এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে?
এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে এই নিবিড় কাননে, ৫
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী-কলে,
বলেছিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে?

যথা ওই গিরিবর
ঢালিতেছে নিরন্তর ১০
সরসী-হৃদয়ে বারি—ভুলিলে কেমনে?
তেমতি হৃদয়ে মম,
ওই বারিধারা সম,
ঢালিলে যে প্রেমধারা প্রেম-প্রস্রবণে,
সেই প্রেম-প্রবাহিণী ১৫
আজি কূলবিপ্লাবিনী,

প্লাবিয়া হৃদয়-সর বহিছে নয়নে ;
ওই স্রোতস্বতী মত
বহিতেছে অবিরত
অশ্রুধারা অবিরল প্রণয়-প্লাবনে। ২০
এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে,
পড়ি' এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী-কলে, ২৫
বনের কুসুম-কলি শুকাইবে বনে।
ভুলিলে কেমনে ?
এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে ?

—নবীনচন্দ্র সেন

১৮৬

প্রেমের দুঃখ

কেন দুখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল। ৫

বিদ্যুৎ-প্রতিম প্রেম দূর হ'তে মনোরম
দরশনে অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জল পাইতে চায়— ১০
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিব প্রেম মনে করি' সুধা যেন,
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে
কালি হবে অশ্রুজল।

—নবীনচন্দ্র সেন

১৮৭

কাণ্ডারীহীন

সাধের তরণী আমার
কে দিল তরঙ্গে ?
কে আছে কাণ্ডারী হেন
কে যাইবে সঙ্গে ?
ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল-খেলা,— ৫
মধুর বহিবে বায়ু
ভেসে যাব রঙ্গে।

গগনে গরজে ঘন বহে খর সমীরণ—
কূল ত্যজি' এলাম কেন
মরিতে আতঙ্কে! ১০
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি' তরী ধীরি ধীরি,—
কূলেতে কণ্টক-তরু
বেষ্টিত ভুজঙ্গে!
যাহারে কাণ্ডারী করি' সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু দিল না পদ ১৫
তরণীব অঙ্গে!

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮

অতৃপ্তি

কোমল প্রণয়-বৃন্তে, কুসুম-যৌবনে,
ফুটিয়াছে যেই ফুল—সাধ ছিল মনে
নিরখিয়া জুড়াইব তৃষিত নয়ন।—
দেখিয়াছি, কিন্তু আশা হ'লো না পূরণ।

—নবীনচন্দ্র সেন

১৮৯

আগে যদি জানিতাম

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার !
যত পেল আঁখিজল, তত হইল প্রবল,
এখন লতাভরে তরু মরে, কে কবে বিহিত তার !

—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯০

স্মৃতি

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফুলহার !
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার ! ৫
কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর !

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

১৯৭

বিধবার আর্শি

বিধবার আর্শিখানি, প'ড়ে আছে একপাশে,
কালি-ঝুল মাখিয়া শরীরে ;
মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে চুপে কয় কথা,
মনোদুঃখে গুমরে গুমরে :—
"সধবা আছিল যবে, এ মুখ নেহারি মোর ৫
কতই সে পাইত গো সুখ ;
আমার এ সরসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ,
তার সেই টুক্‌টুকে মুখ ।

গিয়াছে সোহাগ জানা, বোঝা গেছে ভালবাসা,
এ ধরায় কেহ কারো নয় ; ১০
ছ'মাস চলিয়ে গেল, একবারো নাহি এল—
দেহ মোর কালি-ঝুলময় ;

ভুল, ভুল ! 'সখী' নয়, সে মোর 'সতীন' হয়—
সব কথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হয়েছে ভোর, ভেঙেছে স্বপন-ঘোর— ১৫
একদিনে দু'সতীনে হারায়েছি স্বামী!"

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৯২

প্রতিজ্ঞাপূরণ

কহ সখি! কোথায় প্রেয়সী—
কোথা সে পাণ্ডব-প্রিয়া সখী মুক্তকেশী?
বারেক দেখিব সেই বন-সহচরী,
করিব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ; কোথা সে সুন্দরী?
কোথা প্রিয়ে অশ্রুমুখী পাঞ্চাল-নন্দিনি! ৫
তব ভীম ভীমবেশে; দেখসে মানিনি!
পূরিতে তোমার, প্রিয়ে, প্রতিজ্ঞা দুষ্কর,
করেছি রঞ্জিত কুরু-রক্তে কলেবর।
যে উরুতে বসাইতে প্রেয়সী তোমারে
চেয়েছিল কুরুপতি সভার মাঝারে, ১০
সেই উরু ভাঙি' ভীম-গদার প্রহারে
দাঁড়াইয়া বৃকোদর, প্রিয়ে, তব দ্বারে।
পূর্ণিমার শশি-সম মেঘ-অন্তরালে
আবরিত মুখ-শশী মুক্ত কেশজালে;
এস, প্রিয়ে, এলোকেশি, বেঁধে দি' কবরী— ১৫
প্রতিজ্ঞা-শৃঙ্খলে ভীম আবদ্ধ সুন্দরি!

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১৯৩

চৈতন্যের সন্ন্যাস

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে ?
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে ?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু নিমু' ব'লে
দ্বার খুলে মাতা কেন বাহিরিলে ?

বউমা, বউমা ! ঘুমায়ো না আর ৫
উঠ অভাগিনি ! দেখ একবার,
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই,
বুঝি বা পলাল করি' অন্ধকার।

তাই বটে, হায় ! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিতা, সরলা কামিনী ; ১০
শূন্য প'ড়ে ঘর। "কোথা প্রাণেশ্বর !
গেছে, গেছে !" ক'রে ওঠে বিনোদিনী।

"সে কি বলো বউ ! ওমা সে কি কথা !
হা মোর নিমাই পলাইল কোথা ?"
পাগলিনী-প্রায় দ্বারে গিয়া হায়, ১৫
নাম ধ'রে কত ডাকিলেন মাতা।

ডাকেন জননী "নিমাই নিমাই !"
প্রতিধ্বনি বলে "নাই নাই নাই" ;
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া ওঠে ; কোথা রে নিমাই ! ২০

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে
সেই প্রতিধ্বনি "যাই যাই" করে ;
ভাবেন জননী আসে গুণমণি ;
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে।

নিমাই ! নিমাই ! হা মাতা সরলে ! ২৫
পাগলিনী হ'লে সকলেই ছলে ;
কাঁদ মা জননী তব গুণমণি
আঁধারে লুকায়ে, ওই গেল চ'লে।

ওই গেল চ'লে পাগলের প্রায়,
জানো না তো মাতা কে তা'রে লওয়ায়। ৩০
উন্নত আকাশে খধূপ প্রকাশে,
আপনার বেগে সে কি সেথা যায় ?

প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে,
আর তা'রে হেথা কেবা রাখে ধ'রে ?
তাই মহা বেগে যায় অনুরাগে, ৩৫
পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে।

(১) হাওয়াই বা হাউই বাজী।

ধরেছ জঠরে, তাই ব'লে তা'রে
পারো কি রাখিতে আপন আগারে ?
যে কাজ সাধিতে আসা অবনীতে,
নিলেন ঈশ্বর সে কাজে তাহারে ৪০

নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই,
আজ সে হইল পাপীদের ভাই ;
জগতের তরে সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না মাতা, কাঁদিতেছ তাই।

এ দিকেতে গোরা নিজ-বেগে ধায়, ৪৫
কেশব-ভারতী আছেন যথায় :
হরি-গুণ-গান করি' পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

'নিশি'তে ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ-মনে গোরা চলিয়াছে তথা . ৫০
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ,
আরবার ভাবে জননীর কথা।

বলেন সঘনে "ওহে দয়াময় !
রহিলা জননী, কোরো যাহা হয়
আমি দ্বারে দ্বারে ঘুষিব তোমারে ৫৫
এ দেহে জীবন যত কাল রয়।

নির্ম্মল-প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী ;
তা'রে দয়া করি' দেখো তুমি হরি ;
কোরো কোরো নাথ! তাহার সদ্গতি। ৬০

প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি, দাও অনুমতি।
হরি-সংকীর্ত্তনে তোমা দুই জনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি।

প্রিয় হরিনাম ঘুষিব বিদেশে, ৬৫
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে ;
নিজে পায়ে ধরি' ভজাইব হরি,
হরিনামে পাপী ঘুচাইবে ক্লেশে।"

এত বলি' গোরা নদে ছাড়ি' যায় ;
নদেপুরী শোকে করে হায় হায় !
কারে কি যে করো, জানো হে ঈশ্বর !
দেখে শুনে কবি হতবুদ্ধিপ্রায়।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

১৯৪
অজানিতের টান

না জানি কেমন সে কুসুম!
মধুর আঘ্রাণে যার মোহিত ভুবন।
ফুটেছে ফুল কোন্ বনে
না হেরি কিছু নয়নে,
বহে গন্ধ মৃদু সমীরণে; ৫
মধু-লোভে মত্ত হ'য়ে ধায় যত অলিগণ!
সে দেশে যাবার তরে
প্রাণ যে কেমন করে,
ভ্রমি তাই আকুল অন্তরে;
মাতিল হৃদয় গন্ধে, উদাস হইল মন! ১০

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল
(চিরঞ্জীব শর্ম্মা)

১৯৫
শ্মশান

বড় ভালবাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,

বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে ৫
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে :—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে .
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান বিফল সকলে :

কি সুন্দর অট্টালিকা—কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা,—হেথা উভয়ের গতি— ১০
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি—
পত্র-পুঞ্জে—আয়ুঃকুঞ্জে কাল, জীবরাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পারে তাড়ায় তেমতি :

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৯৬

পুনর্মিলন

তোমা ছেড়ে পরলোকে যেতে যদি হয়,
তবু জেনো, কভু আমি তোমা ছাড়া নয় ;—
অলক্ষ্যে চরিব সদা নিকটে তোমার,
তব ভাবী বিঘ্ন যাহা,
আমি যদি জানি তাহা, ৫
আগেতে সঙ্কেতে দিব সমাচার তার ,
উপস্থিত বিপদে সাধিব প্রতীকার।

কালের নিষ্ঠুর ক্রিয়া ভুলিয়া যখন,
অবশ নিদ্রায় তুমি ভুঞ্জিবে স্বপন,
তুমি আমি সেই যেন পূর্ব্বের সংসার— ১০
সেই পূর্ব্ব আলাপন,
সেই প্রেমময় মন ;—
অলীক ভেবো না হেন মিলনে আত্মার।
আমি কি ভুলিতে পারি প্রণয় তোমার ?
হে প্রিয়ে, অন্তরে তুমি হৈও না নিরাশ, ১৫
পায় না প্রেমীর প্রেম কখন বিনাশ ;
কাম, লোভ, কোপ, হেয় বৃত্তি সমুদয়
এরা চিরস্থায়ী নয়,
দেখ তার পরিচয়,
উদয় হইয়া পুনঃ ত্বরা লয় পায় ;— ২০
চিরবৃদ্ধিশীল প্রেম পাই পরীক্ষায়।
প্রেম যদি রয়, রবে অবশ্য ভাজন ;
আছে ক্ষুধা, নাই অন্ন—না হয় এমন।
তুজনার প্রেমের ভাজন তুইজন ;
যে ভাবে থাকিব যথা ২৫
থাকিব তুজনে তথা,
বিশেষ বিশ্বাস ইথে ধরে মম মন ;
আশা ছাড়া প্রেম হায় ! রহে কতক্ষণ !

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৯৭

পরলোকের সঙ্গী

যে ভাবের ভাবুক, পথের পথিক,
সেই তো আপনার ;—
দেহের সম্বন্ধ যত ক্ষণিক অসার।
পরলোকের সঙ্গী যারা
আত্মার আত্মীয় তারা ;
তা' বিনা সকল মিছে, কেহ নহে কার।
হায় তবে কোথা যাব,
মনের মানুষ কারে পাব—
যে হবে প্রাণের সখা, আমি হব যার ?

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল
(চিরঞ্জীব শর্ম্মা)

১৯৮

আহ্বান

হের, প্রিয়া, এই ধরা— তরু-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে,
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।

হের, ওই মহাকাশ— ল'য়ে মেঘ রাশ রাশ, ৫
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে,
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।
শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প কল্প বিকাশ-বারতা! ১০
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা!
আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ,
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায় ১৫
উঠিতে পড়িতে আজীবন।
আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়া!
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব।
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য,
আত্মায় আত্মার অনুভব! ২০
বুঝিছ কি এ আনন্দ— এত আলো এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতি গান!
কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান!
বিস্ময়ে কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে ২৫
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া!

শত শত ভগ্ন স্তূপ— কি বিরাট্—অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া !
চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি কালের গরিমা ! ৩০
পাষাণে পাষাণে রেখা— তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা !
আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্ব্বাক্,
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে, ৩৫
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক ।
এস এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমে স্নিগ্ধ, স্তব্ধ করুণায় ।
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে ছড়ায়ে আপনায় ! ৪০

—অক্ষয়কুমার বড়াল

১৯৯

পিঞ্জরমুক্ত

আর কেন বাঁধি তোরে—শিকল দিলাম খুলি' ;
কত বর্ষ অনভ্যাসে উড়িতে গিয়াছে ভুলি' ।
ঝাপটি' পড়িল ভূমে, ভয়ে কাঁপে পাখাত্বটি ;
পুত্র কন্যা দেয় তাড়া—করে ঘরে ছুটাছুটি ।

ল'য়ে গেনু গৃহ-শিরে অতি সন্তর্পণে ধরি', ৫
সর্ব্বাঙ্গে বুলানু কর কত না আদর করি' ;
ক্রমে সুস্থ, তুলি' গ্রীবা চাহিল আকাশ-পানে—
মুখরিত উপবন কূজনে গুঞ্জনে গানে।

স্ফুরিল কাকলী মুখে, সহসা উড়িল টিয়া—
উড়িছে হরিৎ-পক্ষে স্বর্ণ-রৌদ্র আলোড়িয়া। ১০
কি আলোক, পরিপূর্ণ! কি বায়ু পাগল-করা!
প্রকৃতি মায়ের মত হাস্যমুখী মনোহরা!

ধায় ছাড়ি' গ্রাম, নদী ; দূর মাঠে যায় দেখা,
দিগন্তে অরণ্য-শীর্ষ শ্যামল বঙ্কিম রেখা।
ল'য়ে শত শূন্য নীড় ডাকে ধ্বা অবিরত— ১৫
নীল স্থির নভস্তলে ভাসে ক্ষুদ্র মরকত।

চকিতে সরিল মেঘ—কোথা কিছু নাহি আর!
চকিতে ভাতিল মেঘে অমরার সিংহদ্বার!
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্বনি—
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে' যেন তার হারা মণি! ২০

এই মৃত্যু—এই মুক্তি! হে দেব, হে বিশ্বস্বামী!
আমিও ত বদ্ধজীব, আমিও ত মুক্তিকামী!
আমিও কি ফেলি' দেহ —বিস্ময়ে আতঙ্ক-হীন—
অসীম সৌন্দর্য্যে তব হইব আনন্দে লীন?

—অক্ষয়কুমার বড়াল

২০০
অমরতা

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে !
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
সেই ধন্য নরকুলে — ৫
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ, গো শ্যামা জন্মদে[1] ? — ১০
তবে যদি দয়া কর',
ভুল' দোষ, গুণ ধর',
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে — ১৫
মধুময় তামরস[2] কি বসন্ত, কি শরদে !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১) জন্মদায়িনী মাতৃভূমি বঙ্গদেশ। (২) পদ্ম।

বঙ্গ-বীণা

চতুর্থ স্তবক

২০৬

জাগরণী

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন 'পরে।
প্রভাত কমলসম
ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ তরে!

জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি'।
কোথা হ'তে সমীরণ
আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে—
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে!

লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব, না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি
ত্রিভুবনে উঠে বাজি',
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে—
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে!

—রবীন্দ্রনাথ

২০২

ভারত-বী

সেথা আমি কি গাহিব গান,

যেথা গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে

কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা

বাণী শুভ্রকমলাসীনা ৫

রোধি' তটিনী-জলপ্রবাহ

তুলিত মোহন তান।

যেথা আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ

কবি' হরিগুণগান নারদ

মন্ত্রমুগধ করিত ভুবন, ১০

টলাইত ভগবান।

যেথা যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে

মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে,

মুগধ কমলাকান্ত-চরণে

জাহ্নবী জনম পান। ১৫

যেথা বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র, ২০
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ।

—রজনীকান্ত সেন

২০৩
বাল্মীকি

স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব্ব উদ্বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্ত্তিয়া মুখে
নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত ৫
মুহূর্ত্তে নিল সে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত।
অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটা-রশ্মিজালে

স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি', উত্তরিলা তপোভূমি 'পরে। ১০

নমস্কার করি' কবি, সুধাইলা সঁপিয়া আসন—
"কী মহৎ দৈবকার্য্যে, দেব, তব মর্ত্তে আগমন?"
নারদ কহিলা হাসি'—"করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি'
আমারে কহিলা ডাকি', "যাও তুমি তমসার তীরে, ১৫
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক সুধায়ে এসো,—বোলো তারে, 'ওগো ভাগ্যবান্!
এ মহা সঙ্গীতধন কাহারে করিবে তুমি দান?
এই ছন্দে গাঁথি' ল'য়ে কোন্ দেবতার যশঃ-কথা
স্বর্গের অমরে, কবি, মর্ত্তলোকে দিবে অমরতা?'" " ২০

কহিলেন শির নাড়ি' ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
"হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
'স্বর্গ হ'তে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।'" ২৫
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে,
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো, ৩০
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে হয়নিকো নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক্,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম,— ৩৫

কহ মোরে, সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে—"অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"
"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তি-কথা",
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,

সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে ? ৪০
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"
নারদ কহিলা হাসি', "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম-স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
এত বলি' দেব-দূত মিলাইল দিব্য-স্বপ্ন-হেন ৪৫

সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০৪

কুমারসম্ভব গান

যখন শুনালে কবি, দেব-দম্পতীরে
কুমারসম্ভব গান,—চারিদিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ,—শিখরের পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর,—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জ্জন-বিরত,
কুমারের শিখী করি' পুচ্ছ অবনত
স্থির হ'য়ে দাঁড়াইল পার্ব্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত-গ্রীবা। কভু স্মিত হাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ,—কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল—কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি' দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০৫

বৈষ্ণব-কবিতা

সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি' কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে? ৫
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি'? এত প্রেম-কথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা ১০
চুরি করি' লইয়াছ কা'র মুখ, কা'র
আঁখি হ'তে? আজ তা'র নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে? তা'রি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তা'র ভাষা হ'তে তা'রে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন? আমাদেরি কুটীর-কাননে ১৫
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার

গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়। ২০
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০৬

প্রেমগীতি

ভাগবত বক্ষে রাখি', গীতা শিরে ধরি',
চণ্ডীর মঙ্গল কথা নিত্য করি পাঠ ,—
গীতগোবিন্দের লোভ তবু চিত্ত ভরি',
গোষ্ঠে আজো মুগ্ধ মন হেরি বাল্য নাট !
ব্রহ্মমুহূর্ত্তের স্নিগ্ধ পাবন আলোকে, ৫
ঋক্ মন্ত্র দেখা দেয়, ঊষার সমীরে
সামচ্ছন্দ আন্দোলিয়া ওঠে মনোলোকে
প্রশান্ত গম্ভীর, মধ্যাহ্নের দীপ্ত তীরে
প্রোজ্জ্বল পৃথ্বীর বুকে স্বর্ণ হোমানল,
অভিষিক্ত নিশীথের নিঃশব্দ তিমিরে ১০
ডুবে যায় অথর্ব্বের সর্ব্বকর্ম্ম-ফল !—

রাসলীলা তবু জানি প্রেমের গৌরব,
ফাল্গুনের ফুলদোল মানি ভ্রান্তি নয়,
শ্রাবণে ঝুলন-গাথা, রাখীর বিভব,
সার্থক বুঝেছি, বন্ধু, আজি সমুদয় ! ১৫

—প্রিয়ম্বদা দেবী

২০৭
স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী-পারে
মোর পূর্ব্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তা'র লোধ্ররেণু, লীলা-পদ্ম হাতে, ৫
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে। ১০
মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি,—ঊর্দ্ধে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্ম্য'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

প্রিয়ার ভবন ১৫
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণপথে দুর্গম নির্জ্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্ত্তি বসি' দম্ভভরে। ২০
প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড'পরে।
হেনকালে হাতে দীপ-শিখা
ধীরে ধীরে নামি' এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে ২৫
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা-করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশ-ধূপবাস
ফেলিল সর্ব্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।
প্রকাশিল অর্দ্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে। ৩০
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।
মোরে হেরি' প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি' ৩৫
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,

'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?'—মুখে তা'র চাহি'
কথা বলিবারে গেনু,—কথা আর নাহি।
সে-ভাষা ভুলিয়া গেছি,—নাম দোঁহাকার ৪০
দু'জনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর।
দু'জনে ভাবিনু কত চাহি' দোঁহাপানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।
দু'জনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি' ৪৫
আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়-প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মতো; মুখখানি তা'র
নতবৃন্ত পদ্ম সম এ বক্ষে আমার
নামিয়া পড়িল ধীরে; ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি' নিশ্বাসে নিশ্বাস। ৫০
রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি' দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদী-তীরে ৫৫
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০৮

দেব-নিঃশ্বসিত

আছয়ে পড়ি' শঙ্খ এক মহাসাগর-তীরে
জীবনহীন, শুষ্ক কায়া, বালুকা তা'রে ঘিরে—
অদূরে তা'র সিন্ধু নাচে,
আকাশ নানা বরণে সাজে,
স্তব্ধ হ'য়ে পাতাল পানে নুইয়া-পড়া শিরে— ৫
শঙ্খ পড়ি' আছয়ে সহি' আতপ হিম নীরে!
একদা এক জ্যোৎস্না রাতে অপ্সরীরা মেলি',
আইল নামি' সাগরতীরে করিতে স্নান-কেলি।
সহসা এক মরতবাসী
যুবারে লখি', প্রণয়রাশি ১০
উথলে এক অপ্সরার—মায়ার জাল ফেলি'
অমনি ফেলে ধরিয়া তা'রে অপ্সরীরা মেলি'!
সেদিন সুখ-উৎসবেতে বাজন লাগি' সবে
শুষ্ক শাখে সহসা তুলি' বাজাল ঘন রবে।
মোদিত হিয়া উর্ব্বশীর ১৫
মুখের ফুঁয়ে সুগম্ভীর
বাজিল শাখ—তুলিয়া বাহু ফেলিয়া দিল তবে;
অপ্সরীরা আকাশ-পথে চলিয়া গেল সবে।

চন্দ্রালোকে চমকি কায়া শবদে পিয়া জল
সার্থকতা জানাতে যেন ভাষিয়া গলগল ২০
ডুবিয়া গেল শঙ্খখানি—
কাহিনী এত রেখেছি জানি—
তাই ত আছি আঁকড়ি পড়ে’ বালুর তটতল—
যুগান্তরে আসিবে কবে স্বরগ-সখীদল !

—সতীশচন্দ্র রায়

২০৯

গীতি-কবিতা

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকণ
কিঙ্কিণীতে— ৫
কল্পনাটি গেল ফাটি’
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়

পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে ১০
কণায় কণায়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭০

ভাবপতঙ্গ

মনোবাতায়ন-তলে উড়ে আসে দলে দলে
ভাবরাশি পতঙ্গের প্রায়,
অশোক কিংশুক রাঙা ইন্দ্রধনু ভাঙা ভাঙা
বরণের বিচিত্র ছটায়,
স্বচ্ছ ক্ষীণ পক্ষ মেলি' কাঁপিয়া পড়িয়া হেলি' ৫
এসে শুধু দেখা দিয়ে যায়,—
ধরিতে, রাখিতে নারি হায়!
ওগো বাতায়ন-তলে হেন কি আলোক জ্বলে,
যার লাগি' আস বারবার?
দেখা যদি দাও এসে, একাকী ফেলিয়া শেষে ১০
ফিরে তবে কেন যাও আর?
নয়ন, অধর, মম কক্ষ, বক্ষ—শিশুসম
এসো সবে কর' অধিকার,
নাহি ভয় অনল-শিখার!

—প্রিয়ম্বদা দেবী

২১১

কবিপ্রকৃতি

সদা ভাবে-ভোলা মন, কিবা পর—কি আপন,
সে চাহে না কোনোদিন কারো পরিচয় !
নাহি জানে কোনো ভেদ, নাহি তা'র কোনো খেদ,
প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা হৃদে সদা বয় !

তরু-লতিকার সনে কথা তা'র নিরজনে, ৫
পুষ্পগুচ্ছ বুকে ধরে সোহাগে আদরে।
দলিতে দূর্ব্বার দল আঁখি তা'র ছলছল,
করুণার উৎস যেন উথলে অন্তরে।

চাঁদ দেখি' ভরে বুক,— মনে ভাবে চাঁদ-মুখ,
মেঘে এলোকেশ দেখে, চপলায় হাসি ! ১০
কুলুকুলু নদী ধায়, তারি সনে গীত গায়,
কত কথা বলে তা'রে, ফুটে ভাবরাশি !

তা'র যে প্রাণের বীণা, বাজে সে বিরাম-হীনা,
শুনে কেহ, নাহি শুনে, মিশে সন্ধ্যাকাশে !
সে কোন্ আরাধ্যা লাগি' সারা নিশি রহে জাগি', ১৫
যদি তা'র শুভ-স্পর্শ একবার আসে।

হোক সে ধরার প্রাণী, নাহি তা'র জানাজানি,
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে স্তুতি নিন্দা যশ,
গর্ব্ব তা'র—দীনতায়, ঘৃণা তা'র—হীনতায়,
বসুধা কুটুম্ব তা'র, সর্ব্ব ভূত বশ।

—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

২১২
কবি

আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার ?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীত-ঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্ম-মাঝে।
আমার মাঝারে করিছ রচনা ৫
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় সাজে ?
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার ১০
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে ?

নাহি জানি, তাই কার লাগি' প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশি-দিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান ১৫
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে ?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১৩

উৎসবময়ী

তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা,
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা, ৫
ধায় মত্ত হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা-কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়-মালিকা, ১০
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব গগনে

কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি' ডাকিছে সুপ্তি-মগনে,
নিদ্রালস-নয়নে এখনও র'বে কি শয়নে।
জাগাও বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা। ১৫

—রজনীকান্ত সেন

২৭৪

ভারতলক্ষ্মী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী!
জনক-জননী-জননী!
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল, ৫
অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে ১০
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ! ১৫

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১৮

আশার স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে, ৫
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন্ কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে
পুণ্য-দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে, ১০
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী—
পঞ্চনদ-কূলে একই প্রথা।

আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্ ১৫
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি
বীরশিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি' যত বালা গাঁথি' জয়-মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা। ২০

—কামিনী রায়

৯৬

আমাদের বাংলাদেশ

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল;
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল;
কোথায় ফলে সোনার ফসল
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা,
ফিঙে গাছে গাছে নাচে? ১০
কোথায় জলে মরাল চলে,
মরালী তা'র পাছে পাছে?

বাবুই কোথা বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ— ১৫
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ ভাষা মরমে পশি'
আকুল করি' তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব
বাউল সুরে মধুর গান? ২০

চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,—
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা ২৫
সবার অধিক পাই রে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে উঠে মোদের বুক?

মোদের পিতৃপিতামহের
চরণধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৯৭

শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে ।
পারে না বহিতে নদী জলধার, ৫
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে ।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে । ১০

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার, ১৫
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম-পথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে। ২০

তুলি' মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরণী ;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে ২৫
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী। ৩০

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মালা
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক কিরণে, ৩৫
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী! ৪০

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯৮

ছিন্ন-তন্ত্রী

পুরানো মোর মরম-বীণায়
একটি তার আর বাজে না রে;
একটি তারের নীরবতায়
বিকল করে সকল তারে!

যে সুর বাজাই বেসুর লাগে, ৫
কোথায় যেন কসুর থাকে ;
জমে না হায়—গান থেমে যায়
পরাণ-ভরা হাহাকারে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২১৯
মধু-ব্রত

এ ধরণী বরতনু আঁধারে মাজিয়া
আলোকে প্রত্যহ উঠে রসস্নান করি' ;
নিত্য নবপুষ্পদামে বাঁধিয়া কবরী
বনে শিহরিয়া উঠে, সমুদ্রে নাচিয়া !
অসীমের পানে ফেলে' দৃষ্টি প্রেমাতুর ৫
তারাগণ চেয়ে' কহে—"মধুর—মধুর !"

আকাশ-সরসী-জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া
সাঁতারে উজলমুখী জ্যোতির্বালাগণ ;
পরস্পরে আঁখিঠারে কাহারে লইয়া,
কৌতুকে আলোক-মুষ্টি করিয়া ক্ষেপণ ! ১০
হাসির অন্তরে প্রেম-রাগিণী-বিধুর
ধরণী চাহিয়া কহে—"মধুর—মধুর !"

আকাশ ও ধরণীর উপান্তে বসিয়া
চিরদিন মধুজীবী কবির হৃদয়
আধ জাগরিত-স্বপ্নে, বিভোর হইয়া ১৫
উভয়ের প্রেম-রসে হয়েছে তন্ময়!
অতর্কিতে প্রাণে ফোটে প্রেমাকৃতি ফুল!
দেবতা নামিয়া কহে—"মধুর—মধুর!"

শশাঙ্কমোহন সেন

২২০

দর্পহরণ

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথায় ধরা পড়ে, কে জানে!
গরব সব হায়
কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে' যায় নয়নে! ৫

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৭

সোনার কাঠি

সোনার কাঠির পরশে সখি লো,
কে আমারে আজি জাগালো!
নিমীলিত আঁখি নিলীন শয়নে,
মগ্ন স্বপন-কুসুম চয়নে,
নীল অঞ্জন কে আসি নয়নে ৫
লাগালো!
কে আমারে সখি জাগালো!

বকুল মালার কুসুম কণ্ঠে
কে আমার সখি দোলালো!
সে ফুলগন্ধ সুরভি সুবাস ১০
গায়ে লাগে যেন তারি নিশ্বাস,
সখি লো আমারে আকাশ বাতাস
ভোলালো!
কণ্ঠে কুসুম দোলালো!

মোর যৌবনবন পুষ্পে পাতায় ১৫
সখি লো কে আজ ফোটালো !
নুয়ে পড়ি সেই সৌরভভারে,
লুব্ধভ্রমর কানে ঝঙ্কারে,
এসে দুটি পায়ে বারে বারে বারে
লোটালো !
যৌবন মম ফোটালো !

—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

২২২

উর্ব্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী !
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত-দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল' সন্ধ্যাদীপখানি ;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে ৫
স্মিতহাস্যে নাহি চলো সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' ১০
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী !
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে ,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
প'ড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত ১৫
করি' অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা !

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী ? ২০
আঁধার পাথারতলে কা'র ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা ল'য়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে ? ২৫
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা !

যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল, ৩০
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে!
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা ৩৫
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা!

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল, ৪০
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে! ৪৫

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী,
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা.
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার ৫০
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী !

ওই শুন, দিশে দিশে তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী,— ৫৫
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী,
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হ'তে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব অখিলের নয়ন-আঘাতে ৬০
বারিবিন্দু-পাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
র'বে তরঙ্গিতে।

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী। ৬৫
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে!
পূর্ণিমা-নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী,
ঝরে অশ্রুরাশি। ৭০
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৩

নিবেদিতা

ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থ ছায়ায়, সে-বালিকা-বক্ষে তা'র
রাখিবে সঞ্চয় করি' সুধার ভাণ্ডার ৫
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া ল'বে বর। সন্ধ্যা হ'লে

জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি' একমনা ১০
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণন।
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে, রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীতে। ত''র পরে ১৫
সুদিনে দুর্দ্দিনে কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দূরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র-শিয়রে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৪

রূপ

কেন গো আসি' হেথা
শুনিবে সখি?
কেন গো আসি' হেথা?—
ঘুচাতে হৃদি-ব্যথা,
রূপের ফোয়ারাতে ৫
জুড়াতে আঁখি;

দেখিতে কালো চুলে,
দেখিতে আঁখি-কোলে
কেমনে খেলে তারা
ভ্রমর-ভাতি ; ১০

কেমনে রাঙা ঠোঁটে
মোহন হাসি ফোটে,
সাজায়ে চুনি-মাঝে
মুকুতা-পাঁতি ;

সুরভি-শ্বাস-ভরে ১৫
কেমনে হৃদি-থরে
সাগরে ঢেউ যেন
উঠিয়া পড়ে ;

ভুরুর বাঁকা টানে
আকুলি' মন-প্রাণে ২০
কেমনে ক্ষণে নব
সুষমা গড়ে ;

দেখিতে চলে' যাওয়া,
শুনিতে কথা কওয়া,—
স্বপনে দেখা রূপ ২৫
দেখিতে চোখে ;

লুটাতে রাঙা পায়
কুসুম-দল-প্রায়
সুরভি ভাব-গুলি
ফুটাতে বুকে। ৩০

—বরদাচরণ মিত্র

২২৫

ঘোম্‌টা খোলা

ঘোম্‌টা গিয়াছে সরে', এত লাজ তা'য়,
মু'খানি দেখাতে বালা এতই নারাজ!
বায়ু, দেখ, অপ্রতিভ মুখপানে চায়,—
বিস্ময়-বিহ্বল ভাবে করেছি কি কাজ!
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-হ্রদ মথিয়া মথিয়া ৫
তুলিল এ রূপরাশি কোন্ যাদুকর?
ছুটিছে সলিলরাশি দু'কূল প্লাবিয়া,
বহিছে শোভার স্রোতে রূপের নির্ঝর।
কোন্ দোল-পূর্ণিমার আবীরে, আ মরি!
আনন মণ্ডিত হ'ল লোহিতে লোহিতে? ১০

কোন্ বাসন্তীর স্পর্শ-পুলকে শিহরি'
ফুটিল অশোক পুষ্প গুচ্ছে আচম্বিতে ?
বৃথা ও ঘোম্‌টা টানা—বসন-সীমায়
এ রূপ-ফোয়ারা কভু রুদ্ধ রাখা যায় ?

—সুরেন্দ্রনাথ সেন

২২৬

নয়ন-বিহঙ্গ

সে চোখের কালো দুটি তারা !
সেই চমকভরা উজল চোখের কালো দুটি তারা !
দুটি কি পাখীর ছানা,
ছড়িয়ে কোমল ডানা
সঘনে পাতার দোলে দিচ্ছে পাখা নাড়া ?
নয়নের রেখার ঘেরে
ঝলকে নেচে ফেরে—
গায়ে কি বসবে উড়ে ? পোষাপাখী তা'রা ?

যখনি ভুলি' নাচে—
খাঁচাটি পাতি কাছে, ১০
বসে সে উঁচু গাছে! বনের পাখীর বাড়া!
ডেকে গায় কভু ছলে,
—নীরবে কথা বলে!
এগোলেই পাতার আড়াল! পাইনে কোনো সাড়া।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

২২৭

চুলবাঁধা

সকলি তোমার, সখি, হেরি অভিনব,
দেখিতে এসেছি আজি চুল বাঁধা তব।
এক হস্তে কঙ্কতিকা, অপরে সম্বরি'
দীর্ঘ-কৃষ্ণ কেশ-পাশ, সারাবেলা ধরি'
বিনায়ে বিনায়ে বেণী কি করি' কেমনে ৫
নিবিড় কবরীবন্ধ বাঁধ আনমনে।
কি মন্ত্রে ফুটিয়া উঠে স্বর্ণ সীঁথিরেখা
দু'টি করতল-চাপে স্মর-পথ লেখা

যেন অভিসার লাগি'। কি পরশভরে
কুন্তল কুঞ্চিয়া আসে ললাটের পরে— ১০
মদনে বাঁধিয়া রাখ যার শত পাকে।
অবাক্ বিস্ময়ভরে আঁখি চেয়ে থাকে ;
ভাবিয়া না পায় চিত্ত এ কি মায়াবিনী.
অথবা পুরানো সেই ঘরের কামিনী !

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারী-প্রতিমা

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি, নারী,—
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে। বসি' কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন ;
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা ৫
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা ;
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত না,—
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে, খনি হ'তে সোনা,
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্পভার,

চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তা'র— ১০
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ
তোমারে দুর্লভ করি' করেছে গোপন ;
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,—
অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৯

রমণীর মন

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু-ঢাকা,
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ-আবরণ,
কি যে সে মোহিনী-মন্ত্র রয়েছে গোপন !
কি যে সে অক্ষর দুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি', ৫
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন ?
কত চেষ্টা যত্ন করি', উলটি' পালটি' পড়ি,
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ।
কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদ্গিরণ ! ১০

অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু, অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয়-প্লাবন !
ত্রিদিবের সুরা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙাড়িয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে, মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে, ১৫
পারিনি তেমন আর করিতে গঠন,
রমণীর মন !

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

২৩০

রহস্য-দীপ

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে, কাঁপিছে তেমনি ৫
আত্মার রহস্য-শিখা।
তাই চেয়ে আছি—
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩১

প্রিয়ের প্রতীক্ষা

মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে,
প্রিয়তম, তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর-ব্যথা সযতনে তুমি নাশিবে।
রবি শশী তারা সুনীল আকাশ,
সকলে দিয়েছে তোমার আভাস, ৫
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ,
তুমি এসে ভালবাসিবে।
মম মর্ম্মমুকুরে দূর হ'তে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
সেথা অন্তরলোকে প্রেমপুলকে গড়েছি স্বপন-কায়া!
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি' ১০
তোমারই লাগিয়া উঠেছে উছসি'
কবে তুমি আসি' অধর পরশি'
মুখপানে চেয়ে হাসিবে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২৩২

প্রিয়াস্মৃতি

অন্ধকার নিশীথিনী ঘুমাইছে একাকিনী,
অরণ্যে উঠিছে ঝিল্লিস্বর ;
বাতায়নে ধ্রুবতারা চেয়ে আছে নিদ্রাহারা,
নতনেত্রে গণিছে প্রহর।
দীপ-নির্ব্বাপিত ঘরে শুয়ে শূন্য শয্যা'পরে ৫
ভাবিতে লাগিনু কতক্ষণ—
শিথানে মাথাটি থুয়ে সেও একা শুয়ে শুয়ে
কি জানি কি হেরিছে স্বপন,
দ্বি-প্রহরা যামিনী যখন।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৩

অন্তঃপুরিকা

আর যে আমার সইছে না রে সইছে না আর প্রাণে,
এমন ক'রে কতদিন আর কাট্‌বে কে তা জানে।
দিন গুণে দিন ফুরায় নাকো নিমিষ গণি তাই,
বুকের ভিতর হাঁফিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই।

যেখান্‌টিতে বস্‌ত সে-জন বস্‌ছি সেথায় গিয়ে, ৫
দেখ্‌ছি খুলে চিঠিটি তা'র ঘরে দুয়োর দিয়ে ;—
বেশী আমি পাইনি যে গো পাইনি বেশী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি একটি চিঠি তা'র।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে, হাস্‌ছি মনে ক'রে ;
দেখ্‌তে হঠাৎ ইচ্ছে হ'য়ে চক্ষু এল ভ'রে। ১০
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তা'র লিখি,
হয় না কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভ'রে দেখি।
নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও কেন ছাই,
মনটা ওঠে আকুল হ'য়ে, উদাস হ'য়ে যাই।
ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চ'লে, ১৫
সকল ব্যথা সইত, মাথা রাখ্‌তে পেলে কোলে।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী, —প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি দুখ অযোধ্যায়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৩৪

সেকাল ও একাল

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্ !
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা !

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে' ৫
ওই তব আঁখি তুলে' চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে' যাওয়া ?

কেন আন বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল, ১০
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

মনে আছে সেই একদিন—
প্রথম প্রণয় সে তখন—
বিমল শরৎ কাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল, ১৫
মৃদু শীত-বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ ;

কাননে ফুটিত শেফালিকা
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল,
পরিপূর্ণ সুরধুনী কুলুকুলু ধ্বনি শুনি'
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল ; ২০

আমাপানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি ;
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জান না তাহা—আমি তাহা জানি !

সে কি মনে পড়িবে তোমার— ২৫
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

ক্ষণিক বিরহ অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা ;
মাঝে মাঝে সব ফেলি' রহিতে নয়ন মেলি', ৩০
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা !

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া ;
নীরবে চরণ ফেলে চুপি চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে—ফিরিতে হাসিয়া। ৩৫

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও !
কাছে আস' আশা ক'রে আছি সারাদিন ধ'রে,
আন্‌মনে পাশ দিয়ে তুমি চ'লে যাও !

দীপ জ্বেলে দীর্ঘছায়া ল'য়ে ৪০
ব'সে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা,
হয় ত বা কাছে এস, হয় ত বা দূরে ব'স,
সে সকলি ইচ্ছাহীন—দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে ; ৪৫
সর্ব্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি',
হৃদয়ের প্রান্ত-দেশে, ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে !

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণ মন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই ৫০
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ।

তুমিই ত দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা,)
প্রেমে দেয় কতখানি কোন্ হাসি, কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা ! ৫৫

তোমারি সে ভালবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালবাসা,
আজি এই দৃষ্টি, হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে চ'লে যাওয়া, এই কাছে আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে ৬০
তবুও কি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা' কি? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা!

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৮

সীতা-হরণ

কানাই বলাই ওরা, দুটি ছোট ছেলে,
লব কুশ সেজে দোঁহে মোর ঘরে আসে,
রামায়ণ গান ক'রে কিছু চাল পেলে'
গাহিতে গাহিতে দেখি আঁখি-জলে ভাসে
সব চেয়ে এ-বিস্ময় মনে মনে মানি—
সীতার হরণ-কথা যবে তা'রা গায়,

কণ্ঠ যেন বুজে আসে, নাহি ফোটে বাণী,
গানেরে মধুরতর করে বেদনায়।
একদা ডাকিয়া আমি ঘরেতে ওদের
"কে শিখালো এই গান" শুধাই আদরে। ১০
বলে তা'রা—" শিখায়েছে যে-গুরু মোদের,
মায়েরে সে নিয়ে গেছে কোথা চুরি ক'রে ;
মা'র ব্যথা শুধু যেন ভ'রে থাকে মন,
পারিনে গাহিতে তাই সীতার হরণ॥"

—উমা দেবী

২৩৬

কুণ্ঠিতা

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তা'রে গিয়া কি দিয়ে!
আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান ৫
ঝরে তো ঝ'রে যাক শুকায়ে,
হৃদয়-মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

আমি সে শোভা কাহারে ত দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে' যায়। ১০
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনেরি অন্ধকূপে থেকে যায়!
আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না ত অপমান;
অমরাবতী ত্যজে হৃদয়ে এসেছে যে, ১৫
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।
পাছে কুরূপ কভু তা'রে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহ মাঝে উদিয়া,
প্রাণের একধারে দেহের পরপারে
তাই ত রাখি তা'রে রুধিয়া। ২০
পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাণে 'এও কি প্রেম জানে!
আমি তো এর পানে চাহিনি।'
তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে ২৫
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তা'রে গিয়া কি দিয়ে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৭

শেষ বিদায়

আনন্দে অমৃত-গন্ধ আছিল তখন,
তীব্র ছিল দুঃখ অভিমান,
অনুভূতি তীক্ষ্ণ ছিল, পুষ্পসম মন,
ভালবাসা ছিলনাক' ভাণ।
তখনি সে পরিচয় তোমায় আমায়, ৫
কতদিন, কতদিন গেছে :
এত ঘনিষ্ঠতা—শেষে, কে জানিত হায়,
অচেনার মত র'ব বেঁচে ?
তুমি ডুবিয়াছ পঙ্কে, আমি সশঙ্কিত,
মজি নিজে কখন কে জানে ; ১০
পাছে এ কাহিনী হয় অন্যের বিদিত,—
ফিরে নাহি চাই তোমা 'পানে।
হয় তো হ'তাম সুখী আমরা দু'টিতে,
হেলা ভরে তুমি গেলে চলি';
প্রেম-শতদল, হায়, ফুটিতে ফুটিতে— ১৫
মনে পড়ে ?—গিয়েছিলে দলি'।
মানুষ পাষাণ হয় কর কি প্রত্যয় ?

চেয়ে দেখ, সাক্ষী তা'র আমি ;
ঠেকিয়া শিখেছি এবে, কেহ কার' নয়,
সত্য কি না জানে অন্তর্য্যামী। ২০
ভেব' না যন্ত্রণা দিতে, গঞ্জনা, ধিক্কারে,
আজ আমি এসেছি হেথায়,
আপনার মত ভালবেসেছিনু যা'বে
তা'র কথা কা'রে কহা যায় ?

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৩৮

অভিসার

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত ;—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে, ৫
নিশীথের তারা শ্রাবণ-গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুর-শিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে।

সন্ন্যাসিবর চমকি' জাগিল, ১০
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
    ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

নগরীর নটী চলে অভিসারে
    যৌবনমদে মত্তা। ১৫
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ :
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
    থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার ২০
    নবীন গৌরকান্তি।
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান
    ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি। ২৫

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
    নয়নে জড়িত লজ্জা ;--
"ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া করো যদি গৃহে চল মোর,

এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, ৩০
এ নহে তোমার শয্যা।

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
"অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী, ৩৫
সময় যেদিন আসিবে, আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে ॥"

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে, ৪০
প্রলয়-শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য ॥

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা। ৪৫
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা ॥

অতি দূর হ'তে আসিছে পবনে ৫০
বাঁশীর মদির-মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি' নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র॥ ৫৫

নির্জ্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরু-বীথিকার
কোকিল কুহরি' উঠে বার-বার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর ৬০
আজি অভিসার-রাত্রি?

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি' পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে, ৬৫
কে ওই রমণী প'ড়ে একধারে
তাঁহার চরণোপান্তে॥

নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায়
ভ'রে গেছে তা'র অঙ্গ।

রোগমসী-ঢালা কালী তনু তা'র ৭০
ল'য়ে প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি' পরিহার
বিষাক্ত তা'র সঙ্গ ॥

সন্ন্যাসী বসি' আড়ষ্ট শির
তুলি নিলো নিজ অঙ্কে। ৭৫
ঢালি' দিলো জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিলো শির-পরে,
লেপি' দিলো দেহ আপনার করে
শীত চন্দন-পঙ্কে ॥

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, ৮০
যামিনী জ্যোছনা-মত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা ॥" ৮৫

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৯

কল্যাণী

প্রভাতে দেখেছি তোমা' স্নাত-শুচি বেশে
তুলিতে পূজার ফুল পট্টাম্বর পরি' ;
পূজা-শেষে নিরমাল্য ধরি' সিক্ত কেশে
পশিতে রন্ধন-গৃহে দেখেছি, সুন্দরি ;
পুনঃ অন্নপূর্ণারূপে, দেখিয়াছি, বালা,—
অতীত মধ্যাহ্নে তোমা' তুষিতে যতনে
গৃহাগত অতিথিরে—রিক্ত করি' থালা,
আপনি অভুক্ত থাকি' প্রসন্ন আননে।
আবার দেখেছি তোমা'—দিবা অবসানে
ভক্তিভরে করি' গৃহে সন্ধ্যাদীপ দান
নমিতে দেবতা-পদে,—কায়মনঃপ্রাণে
যাচিতে নীরবে পতি-পুত্রের কল্যাণ !
হে কল্যাণি, যুগে যুগে হোক্ তব জয়,
ওই রূপ বঙ্গ-গৃহে হউক অক্ষয়।

—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

২৪০

গৃহলক্ষ্মী

তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জ্বল ;
আজিকে তোমারে হেরি' সর্ব্ব অমঙ্গল
ধীরে সরে' যায় দূরে ; মৌন প্রেমভরে
সকরুণ আঁখি অমিয় সেচন করে
অন্তর-নিভৃতে শতধারে ; হে প্রেয়সী, ৫
গৃহলক্ষ্মীরূপে আজি তুমি মহীয়সী
আপন মহিমালোকে ; সংসারের মাঝে
ধ্রুবতারা সম তুমি সর্ব্ব শুভকাজে,
অয়ি অচঞ্চলে ! পাতিয়াছ সিংহাসন
সর্ব্বজন-মনোমাঝে গৌরবে আপন ; ১০
ঘেরিয়াছে চারিধারে কত দুঃখ সুখ,
কত উন্মেষিত আশা, কত ম্লান মুখ।
সকল হৃদয়-ভার বক্ষে লহ টানি'—
তাই তুমি, গৃহলক্ষ্মি, সকলের রাণী।

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৭

বধূ

দূর গ্রামে মেটে-ঘরে সখী মোর থাকে,
একবার গিয়েছিনু দেখিতে তাহাকে ;
কী মধুর শান্তি ল'য়ে ছিনু তা'র কাছে,
আজো যেন সেই স্মৃতি বুকে ভ'রে আছে।
বুড়ো স্বামী, তা'র চেয়ে আরো কত বুড়ী ৫
মরণ-দুয়ার-ঘেঁসা স্থবিরা শাশুড়ী,
ক্লান্তিহীন সেবা দিয়ে যেন দু'জনায়
রেখেছে আড়াল করি' আপন ছায়ায়।
যতনে রোপিত গাছ, গাভী দুটো তা'র
কত যে স্নেহের ধন নয় বলিবার। ১০
শাশুড়ী স্বামীব তবু পায় সে কি মন ?
তিলেক ত্রুটিতে কত সহে যে শাসন !
সর্ব্বতাপহরা, তবু হাসিমুখ তা'র,
আপন অন্তরে সে কি পায় পুরস্কার ?

—উমা দেবী

২৪২

স্নেহ-পাশ

দুখানি সুগোল বাহু, দুখানি কোমল কর,
স্নেহ যেন দেহ ধরি' সেথায় বেঁধেছে ঘর,
রূপ নাকি কাছে টানে, গুণ বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে ছোট হাতখানি দিয়া।
এ দুখানি শুভ্র বাহু মালা করি' পরি গলে,
এ হাত উঠাবে স্বর্গে, ডুবাবে বা রসাতলে।

—কামিনী রায়

২৪৩

মেনি

মোদেরি ঘরের ওই সমুখের পথে—
এক ধারে ছেঁড়া পাটি পেতে কোনো মতে—
রোজ দেখি বসে এক মেয়ে গোলগাল,
সাজায়ে পুতুল আর ঘটী বাটি থাল।
আঁটসাঁট বাঁধা চুল, পিছে দোলে বেণী,
তাই নিয়ে খেলা করে তা'রি পোষা মেনি ;

সেদিকে খেয়াল নেই, আপনার মনে
"বেনে-বউ" পুতুলেরে সাজায় যতনে।
একদা শুনিনু—তা'রে "চাঁপা" "চাঁপা" বলি'
দূর হ'তে কে ডাকিল,—ছুটে গেল চলি'। ১০
সে সুযোগে মেনি তা'র পুতুলের ঝুড়ি
ভেঙে চুরে দিয়ে মহা খেলা দিল জুড়ি'।
চাঁপা এসে কেঁদে ওঠে দেখে এই দশা,
মেনিরে মারিতে গিয়ে চুমিল সহসা॥

—উমা দেবী

২৪৪

পুঁটু

চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে না চাহে;
তৃষ্ণাতুর বসুন্ধরা দিবসের দাহে;—
হেন কালে শুনিলাম, বাহিরে কোথায়,
কে ডাকিল দূর হতে—"পুঁটুরাণী আয়।"
জনশূন্য নদীতটে, তপ্ত দ্বিপ্রহরে, ৫
কৌতূহল জাগি' উঠে স্নেহকণ্ঠস্বরে।

গ্রন্থখানি বন্ধ করি' উঠিলাম ধীরে,
দুয়ার করিয়া ফাঁক্ দেখিনু বাহিরে ;—
মহিষ বৃহৎকায় কাদামাখা গায়ে
স্নিগ্ধনেত্রে নদীতীরে রয়েছে দাঁড়ায়ে ; ১০
যুবক নামিয়া জলে ডাকিছে তাহায়
স্নান করাবার তরে "পুঁটুরাণী আয় !"
হেরি' সে যুবারে, হেরি' পুঁটুরাণী তারি
মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধসুধাবারি ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৫

কন্যা-বিদায়

আজি প্রাতে দেখিলাম বধূ ময়রার
বিরস-বদনে ব'সে আছে দরজায় ;
কোলের ছেলেটি দূরে খেলা করে তা'র,
কভু বা মায়েরে কাছে ডাকে—"আয়", "আয়" ।
সেথায় আসিল এক সখী প্রতিবেশী, ৫
বলে,—"বউ, বেলা গেল, তবু ব'সে ঠায়,
বল্ দেখি এটা তোর ঢং কোন্ দেশী ?"

বউটা নয়ন মুছে বলে,—"দিদি, হায়,
মেয়েটা গিয়েছে কাল শ্বশুরের ঘরে,
এতদিন ছিল কাছে, করিনি আদর, ১০
কে জানে আসিবে কবে কত দিন পরে,
আজ তা'র লাগি' মন এমন কাতর ;
উঠিতে বসিতে শুধ্ খেত গালাগাল,
তবু মোর গলা ধ'রে কেঁদে গেছে কাল ॥

—উমা দেবী

২৪৬

তরু সিং

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সহিদ্‌গঞ্জে রক্ত-বরণ
হইল ধরণী-তল।
নবাব কহিল—"শুন তরু সিং, ৫
তোমারে ক্ষমিতে চাই।"
তরু সিং কহে—"মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই ?"

নবাব কহিল—"মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ ; ১০
বেণীটি কাটিয়ে দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ।"
তরু সিং কহে—"করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তা'র কিছু বেশি দিব— ১৫
বেণীর সঙ্গে মাথা!"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৭

অর্জ্জুন

সব্যসাচী হে কিরীটী দেবেন্দ্র-তনয়,
যৌবন-সম্ভোগে শুধু তব কীর্ত্তি নয়
মর্ত্তভূমে, স্বর্গে তুমি উর্ব্বশী বিমুখি',
তরুণী বিরাট-সুতা সঁপি দিয়া সুখী
অভিমন্যু-করে। ভাল জান, ধনঞ্জয়, ৫
কেবলি গ্রহণে কভু মানব-হৃদয়

তৃপ্তি নাহি মানে ; যুদ্ধ-লব্ধ তব
মণি মুক্তা রত্নভার কাঞ্চন বিভব
মুক্ত হস্তে করি দান ভ্রাতৃ-অভিষেকে
সুখী তুমি বীর ; দরিদ্রে বিপন্ন দেখে ১০
সাধিয়া উদ্ধার-ব্রত, নির্ব্বাসিত তুমি,
যে দুর্জ্জন দুর্য্যোধন সূচি-অগ্র ভূমি
নাহি দিয়া বাধাইল দুরন্ত সমর,
তারি মৃত্যু ভাবি' তুমি করুণা-কাতর !

—প্রিয়ম্বদা দেবী

২৪৮

শিবাজি

বসিয়া প্রভাত-কালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা একদিন—
রামদাস, গুরু তাঁর, ভিক্ষা মাগি' দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
তখনি লেখনী আনি' কী লিখি' দিলা কী জানি,— ৫
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
"গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে !"

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কতো পান্থ, কতো অশ্বরথ :— ১০
"হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছো ঘর,
আমারে দিয়েছো শুধু পথ!

অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব্বচরাচর,—
মোরে তুমি, হে ভিখারী, মার কাছ হ'তে কাড়ি', ১৫
করেছো আপন অনুচর!"

সমাপন করি' গান, সারিয়া মধ্যাহ্ন-স্নান,
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন—
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল একধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন। ২০

গুরু কৌতূহল-ভরে তুলিয়া লইয়া করে
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি,—
বন্দি' তাঁর পাদ-পদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিন রামদাস গেলেন রাজার পাশ, ২৫
কহিলেন, "পুত্র, কহ শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে
কোন্ গুণ আছে তব, গুণী?"

"তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান"—
শিবাজি কহিলা নমি' তাঁরে। ৩০
গুরু কহে—"এই ঝুলি লহ তবে স্কন্ধে তুলি',
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে দ্বারে।
নৃপে হেরি' ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে, ৩৫
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।

অবশেষে দিবসান্তে নগরের একপ্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি'—
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি' সুখে গুরু কিছু দিল মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি। ৪০

রাজা তবে কহে হাসি'— "নৃপতির গর্ব্ব নাশি'
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক;
প্রস্তুত রয়েছে দাস,— আরো কিবা অভিলাষ
গুরু-কাছে লবো গুরু দুখ!"

গুরু কহে, "তবে শোন্ করিলি কঠিন পণ, ৪৫
অনুরূপ নিতে হবে ভার,
এই আমি দিনু ক'য়ে মোর নামে মোর হ'য়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্ব্বার।

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ; ৫০
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজ্যহীন।

বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্ব্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো"— ৫৫
কহিলেন গুরু রামদাস।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৯

গান্ধীজী

মহাজীবনের ছন্দে যে-জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া ;
দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি'
'গড়া' যে পরে গো, ফেরে খালি পায়ে, শোয় কম্বল পাড়ি' ;
তপস্যা যার দেশাত্মবোধ ছোটরও ছোটর সাথে, ৫
দিন-মজুরের খোরাকে যে খুশী তিন আনা পয়সাতে ;
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা ;

সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,

দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা ; ১০

অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি',

শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',

অর্জ্জন যার ব্রহ্মচর্য্য ; তপের বৃদ্ধি কাজে,

উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার মাঝে ;

ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি ! আত্মার চিরজ্যোতি , ১৫

দাস হ'তে, দাস রাখিতে, যে মানে চিত্তের অধোগতি ;

মহাবাণী যার শকতি-আধার, অনুদার কভু নহে,

লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝারে কহে—

"স্বরাজ-প্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,

ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন কায়েম করিব তপে" ; ২০

আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,

পরাজয় আজো জানেনি যে—সেই গান্ধীর গাহ জয় !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৮০

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাব্‌না যা' সে ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,— ৫
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

ওরাই ভালো বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে, ১০

প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ববিদ্যাশিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে, নূতনেরও আদর জানে ১৫
ওই আমাদের ছেলেরা সব—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে,
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ-দেশান্তে ছুট্‌ছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;

মার্কিনে আর জার্ম্মানিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জ্বেলে শিখ্‌ছে ওরা কজ্বা কল ; ২০
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে, ২৫
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে,
প্রয়োজনের ওজন-মতো আয়োজন সে কর্‌তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের—কারণ ওরা দেবতা নয় ; ৩০
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতে হয় গো কাবু, মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ; ৩৫
আলাদীনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৮৯

আশ্রম

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী-তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি' আহরণ
বনান্তর হ'তে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি'   ৫
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধ-শান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোম-ধেনুগণে ; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি' লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি' কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে   ১০
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্র-মণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হ'য়ে, মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—"বৎসগণ ব্রহ্মবিদ্যা কহি,   ১৫
করো অবধান।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫২

ইছামতী নদীর প্রতি

অয়ি তন্বী ইছামতী তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটীরে কুটীরে,—
শস্যে পূর্ণ হোক্ ক্ষেত্র তব তট-দেশে।—
বর্ষে বর্ষে বরষায় আনন্দিত বেশে
ঘনঘোরঘটা সাথে বজ্রবাদ্যরবে ৫
পূর্ব্ববায়ু-কল্লোলিত তরঙ্গ-উৎসবে
তুলিয়া আনন্দধ্বনি দক্ষিণে ও বামে
আশ্রিত পালিত তব দুই তট-গ্রামে,
সমারোহে চ'লে এস শৈলগৃহ হ'তে
সৌভাগ্যে শোভায় গর্ব্বে উল্লসিত স্রোতে। ১০
যখন র'ব না আমি, র'বে না এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চারিয়া প্রাণ
তোমার আনন্দ-গাথা এ বঙ্গে পার্ব্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইচ্ছামতী।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৩

কাজরী

(আজ) নূতন শাখে বাঁধ্ তোরা সই
নূতন হিন্দোলা,
আজ্‌কে হাওয়ার নূতন দুয়ার
হ'ল যে খোলা!
(নব) নীপের দীপে, কেয়ার ধূপে ৫
আজ ভুবন ভোলা,
নূতন বঁধুর নূতন-মধুর
কাজ্‌রী উতলা!

(ও কে) দোল্ দিল মোর মনে, ওগো!
তাই দোলে ভুবন! ১০
শ্রাবণ দোলে, পবন দোলে,
দোলে সকল বন!
হৃদয়-দোলায় চল্‌ছে গো! কায়
আনন্দ-ঝুলন!
ঝুলন্-মাতাল রাগরাগিণী ১৫
কাজ্‌রী-নিমগন!

(আজ) তোমার আমার মন মিলেছে
মনের মালঞ্চে!
কে জানে আজ দুনিয়া সমাজ
পড়শী পঞ্চে ? ২০
অঞ্চলে বেঁধেছি মোরা
(আজ) সাত রাজার ধন যে!
কাঞ্চনে নাই রুচি, চরণ
মাণিকের মঞ্চে!
(আজ) তোমার আমার ফুল ফুটেছে ২৫
মনের মালঞ্চে।

(আমার) সকল ভুবন দোল দিল রে
জনম জনমে!
দোল দিল আনন্দ-বিষাদ
শঙ্কা-সরমে! ৩০
দোল দিল কামিনী-কুঁড়ি
(মোর) গোপন মরমে!
সূর্য্য-তারার নাগর-দোলার
ছন্দেরি সমে!

(আজ) জীবন মরণ ঝুলন খেলে, ৩৫
দোল দিয়েছে কে!

সুধা-সুরা-সোম-ধুতূরার
ঢেউ পিয়েছে কে।
(আজ) বাদল-ধারায় জ্যোৎস্না জড়ায়
(হায়) সে রঙ্গ দেখে! ৪০
ঝুলন ঝোলে ঝাণ্ডা-তালের
ঝঞ্ঝাতে বেঁকে!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৮৪

বর্ষানন্দ

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে!
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ; ৫
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে!
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে!

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি' ১০
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে !
ধেয়ে চলে' আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, ১৫
দাদুরি ডাকিছে সঘনে !
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে ।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে ২০
নয়নে লেগেছে ।
নব তৃণদলে ঘন বন-ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে ! ২৫
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে ।

ও গো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে ? ৩০
ও গো নব-ঘননীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে ?
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে ৩৫
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ?

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণদলে
কে বসে' অমল বসনে
শ্যামল বসনে ?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ? ৪০
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নব মালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণদলে
কে বসে' শ্যামল বসনে ? ৪৫

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল, ৫০
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে!
ওগো নির্জ্জনে বকুল-শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে?

বিকচ-কেতকী-তটভূমি 'পরে ৫৫
কে বেঁধেছে তা'র তরণী
তরুণ তরণী?
রাশি রাশি তুলি' শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে ৬০
গাহিছে পরাণ-হরণী!
বিকচ-কেতকী-তটভূমি 'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী!

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে ৬৫
হৃদয় নাচে রে!

ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীব কাছে রে ! ৭০
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৫

শীতরাত্রে

পউষ প্রখর শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লি-মুখর রাতি ;
নিদ্রিত পুরী নির্জ্জন ঘর, নির্ব্বাণ দীপ-বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখ-নিদ্রার ঘোরে,—
তপ্তশয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেন কালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম,— ৫
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শাণিত তীরের মতন মর্ম্মে বাজিল স্বর,—
ঘর্ম্ম বহিল ললাট বহিয়া, রোমাঞ্চ কলেবর।

ফেলি' আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরল-বসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে। ১০
দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি',
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখী ;
দেখিনু দুয়ারে রমণী-মূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা,—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে পুচ্ছ ভূতল চুমে, ১৫
ধূম্র বরণ, যেন দেহ তা'র গঠিত শ্মশান-ধূমে।
নড়িল না কিছু, আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি' শিহরি' সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি' দিল ইঙ্গিত করি',—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন সম চড়িনু অশ্ব 'পরি। ২০
বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে যায় ঘোড়া,—বারেক চাহিনু পিছে,
ঘরদ্বার মোর বাষ্প-সমান, মনে হ'ল সব মিছে।
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে,
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে ওঠে বুকে।
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে ; ২৫
হু-হু রবে বায়ু বাজে দুই কানে, ঘোড়া চলে' যায় ছুটে।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি',—
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি' !
অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে,
আঁধার-ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে। ৩০

নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যা 'পরে,
অঙ্গুলি তুলি' ইঙ্গিত করি' পাশে বসাইল মোরে।
হিম হ'য়ে এল সর্ব্ব শরীর শিহরি' উঠিল প্রাণ :
শোণিতপ্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।
অমনি রমণী কনকদণ্ড আঘাত করিল ভূমে, ৩৫
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপ-ধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু-কলরব সাথে,—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্য দূর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তা'র বাঁধি দুই সার কিরাত-নারীর দল,
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থজল। ৪০
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি'
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন-কাল!"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত, ৪৫
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিত-মতো!
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে,—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
চলি গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র ; —পশ্চাতে বাঁধি' সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার ; ৫০
পাদপীঠ 'পরে চরণ প্রসারি' শয়নে বসিলা বধূ—
আমি কহিলাম, "সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু!"

চারিদিক হ'তে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুক হাসি।
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৬

সন্ধ্যাতারা

জ্যোতি-বসনে,
গোধূলি-আসনে
বসি' একমনে
কারে চাও?
ধীর আঁখিতে ৫
কাহারে দেখিতে
কনক কিরণ
ঢেলে দাও?
গোধূলি মিশায়
আকাশের গায়, ১০
নয়নে পলক
তবু নাই,
আঁখি অনিমিখ্
চেয়ে একই দিক্

কার আশাপথে, ১৫
ভাবি তাই।
পূরবে চন্দ্রমা
পূর্ণ-সুষমা
ধীরে ধীরে ধীরে
ওঠে ওই, ২০
যামিনী অঞ্চলে
বাঁধি' কুতূহলে
বলে 'আমি ঊষা,
নিশি নই।'
মিলিল চকিতে ২৫
আঁখিতে আঁখিতে—
গগন-পরিধি
মাঝে তার,-
অবশ পরাণ,
উথল নয়ান. ৩০
সুদূর মিলন
দুজনার !
সুখের অলসে,
কিবা লাজ-বশে,
ঢলে' পড়ে তারা ৩৫
নভোগায়,

ধীর চরণে,
স্তিমিত নয়নে,
শেষে নিশিকোলে
মিশে যায়। ৪০
যেদিকে লুকালো
সে মাধুরী-আলো
শশীর সেদিকে
ধায় প্রাণ,
বিনা পরশন ৪৫
দেবের মিলন,
বাধে না আকাশ-
ব্যবধান !
স্মৃতি কোলে কবি'
হৃদে সুধা ভরি' ৫০
ভাসাল রজতে
চরাচর,—
জাগি' সারারাতি
শশী ম্লান-ভাতি
পোহাল প্রেমের ৫৫
কোজাগর !

—বরদাচরণ মিত্র

২৮৭

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটা-জাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু,—মুখে তুলি' পিনাক করাল
কা'রে দাও ডাক ;
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ! ৫

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর—
দগ্ধ-তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হ'তে ছুটে আসে,
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি' উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্ত্তি তব অনুচর ! ১০

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া
আবর্ত্তিয়া তৃণ-পর্ণ ঘূর্ণ্যচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া,
চূর্ণ রেণু-রাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ ! ১৫

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস' আসি' রক্ত-নেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্ত-চক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী! ২০

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট্ অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি' ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার! ২৫

হে বৈরাগী, কর শান্তি পাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হ'য়ে, যাক্ চলি' গ্রাম হ'তে গ্রামে,
পূর্ণ করি' মাঠ।
হে বৈরাগী, কর শান্তি পাঠ। ৩০

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্ব 'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থ-ছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্র সাথে। ৩৫

সুখ দুঃখ, আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক্ গগনে,
ভরে' দিক্ নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ সনে,
আকুল আকাশ,
সুখ দুঃখ, আশা ও নৈরাশ। ৪০

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি' নভস্তলে,—বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ কোটি নর-নারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি' গেরুয়া অঞ্চল। ৪৫

ছাড় ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন-তন্দ্রা জাগি' উঠি' বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে র'ব প্রাণিশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ! ৫০

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৮

চৈত্র-নিশীথ-শশী

কত নদী-তীরে, কত মন্দিরে
কত বাতায়ন-তলে,
কত কানাকানি, মন-জানাজানি
সাধাসাধি কত ছলে।
শাখা-প্রশাখার, দ্বার-জানালার ৫
আড়ালে আড়ালে পশি'
কত সুখদুখ কত কৌতুক
দেখিতেছ একা বসি'—
চৈত্র-নিশীথ-শশী।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫৯

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা।
ফিরে বায়ু হাহা স্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা। ৫

অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির-দুকূলা রে !
নিবিড় নীরদ গগনে গর গর গরজে সঘনে,
চঞ্চলা চপলা চমকে, নাহি শশী-তারা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬০

বউ কথা কও

সুপ্ত চারিদিক্
কোনো পাখী নাহি গায়, বিশ্ব যেন শূন্য প্রায়,
গ্রাম-পথে চলে না পথিক !
বিশ্ব তন্দ্রাতুর !
নিশি না হইতে ভোর, ভাঙায়ে ঘুমের ঘোর ৫
কোথা হ'তে উঠে যেন সুর—
"বউ কথা কও !"
বুঝি বা আদিম প্রাতে ধরিয়া প্রিয়ার হাতে
বলেছিল—'সুপ্রসন্ন হও,
বউ কথা কও' ; ১০
নিমীল নয়ন—
প্রকৃতি ঘুমায়েছিল, কে যেন জাগায়ে দিল,
আজো তাই শুনি সেই স্বন—
"বধূ কথা কও !"

—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

২৬৭

প্রভাতে কাঞ্চনশৃঙ্গ

কোথা গো সপ্ত-ঋষি কোথা আছ আজ ?—
কোথায় অরুন্ধতী ?
শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম
এস গো তুলিবে যদি !

প্রত্যূষে সে যে ফুটিয়া, প্রদোষে ৫
নিঃশেষে লয় পায়,
সোনার কাহিনী স্মরিতে একটি
পাপড়ি না রহে, হায় !

কে জানে কখন অপ্সরাগণ
সে ফুল চয়ন করে, ১০
সোনালি স্বপন লেগে যায় শুধু
নরের নয়ন 'পরে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৬২

সুপ্তোত্থিতা

কখন্ জাগিলে তুমি হে সুন্দরী উষা
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন—
কখন্ করিলে তুমি স্বর্গ-বেশ-ভূষা ?
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন !
তোমারে আবরি' ছিল যে ঘোর রজনী ৫
তিমির-কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে ;
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্ম্মল সুখ কমল-নয়নে !
কোমল চরণে আসি' শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি 'পরে কুসুমিত কেশ ; ১০
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দ-ভরা,—রজনীর শেষ !
পরশিয়া দেহে তব আলোক-অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক-চঞ্চল !

—চিত্তরঞ্জন দাশ

২৬৩

মধ্যাহ্ন-ছবি

বেলা দ্বিপ্রহর।

ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি'; তীরে দুটি গরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে ৫
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি'। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি' ফিরে। ১০
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি' কলভাষ
শুভ্রপক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে। ১৫
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি' ধেয়ে আসে ছুটে

তপ্ত সমীরণ,—চলে' যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর ২০
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য 'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত্তশব্দ বাঁধা তরণীর,—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৪
জ্যোৎস্না-মদিরা

চন্দ্র ঢালিছে তন্দ্রা নয়নে,
        মল্লিকা বনে ঢালিছে মায়া;
ছায়ায় আর্দ্র আলোখানি আজ
        আলো-মাখা ফিকে হাল্কা ছায়া!
সুদূর-স্বপন-বিধুর প্রাণ, ৫
উঠিছে মৃদুল মধুর গান,
মৃদুল বাতাসে মর্ম্মর ভাষে
        উছসি' উঠিছে বনের কায়া!

স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
গাহে অন্তর কত না ছন্দে, ১০
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৬৮

আবির্ভাব

—শ্রান্তি মানি'
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি' গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি' দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি' আসন ছাড়ি' নিবাইনু বাতি।
যেমন নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে ৫
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হ'তে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি'
ত্রিভুবন-বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ-পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তর-শায়িনী! নাহি সীমা ১০

তব রহস্যের। এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্কচিত্ত সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বাসে
মুহূর্ত্তে ডুবালে? কখন দুয়ারে এসে
মু'খানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, একপ্রান্তে, সুররাণী, ১৫
সুদূর নক্ষত্র হ'তে সাথে করে' আনি'
বিশ্ব-ভরা নীরবতা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৬

আকাশের তরী

ডুবিয়া আছে তরী—
কিরণময় সুনীল নভ-সাগর মাঝে পড়ি'—
ডুবিয়া আছে তরী।
বাহিরি' গেছে সকল লোক অযুত লাখ কাজে!
ছায়ায় রোদে অলস লীলা শূন্য বন মাঝে! ৫
মাঠের শেষে আকাশ ছাপি' রৌদ্র বেয়ে পড়ে,
দীপ্ত ধরা চাহিয়া আছে অনন্ত অম্বরে—
শুক্ল পাখা নবম ঘাতে চন্দ্রতরীখানি
কত না দূর সাগরে পালে নিজেরে টানি' আনি'

সহসা আলো-ঝঞ্ঝাবাতে মাঝ-গগনে পড়ি' ১০
ভাঙিয়া হাল, ছিঁড়িয়া পাল, বিপথে গিয়া সরি'
ডুবিয়া গেছে তরী!

উঠিবে জাগি' তরী—
লক্ষ দ্বীপ জাগিবে যবে আলোকশিখা ধরি'—
উঠিবে জাগি' তরী। ১৫
ইন্দ্রজালে গগনভালে আঁধার আসি' যবে
জমিবে রসে, ধরার আঁখি বন্ধ হ'য়ে র'বে!
তখন তা'রে স্বপন দিতে জ্যোছনা-ধারা ঢালি'
মলিন ছায়া জাগাতে বনে মন্দপ্রভা জ্বালি',
চলিয়া যেতে প্রান্ত হ'তে প্রান্তে নব বলে, ২০
পরায়ে দিতে পারিজাতেরি মালিকা নদী-গলে;
ঘটাতে শত মিলন-লীলা ধরার উপবনে
আকুল ধ্বনি জাগাতে বীণে বিরহী বাতায়নে—
নবমী-চাঁদ পরীর মতো শরীর-শোভা ধরি'
টানিয়া হাল, জুড়িয়া পাল, উঠিবে নড়িচড়ি'— ২৫
উঠিবে জাগি' তরী।

—সতীশচন্দ্র রায়

—

২৬৭

অন্ধকার

অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার !
গ্রাসি' ধরণী, গ্রাসি' গগন,
তিমির-গহ্বর ব্যাদান যেমন
রক্তবীজ-বধে কালিকার !
ঘোর অন্ধকার ! ৫
অনন্তের মূর্ত্তি, কৃতান্তের ছায়া
অনাদি পরম কারণের কায়া,
অসীমে সসীমে একাকার ।

জগৎ চরাচর যেদিন না ছিল,
ব্যোম উপরে মহা ব্যোম বিথার, ১০
স্তব্ধ প্রকৃতি সনে অনাদি পুরুষ
বিশ্ব সৃজন-তরে করিল বিহার ;—
না ছিল শব্দ, স্পর্শও না ছিল,
রূপ নাহিক ছিল অভিন্নতায়,
নিরম্বু শূন্যে রস নাহি সম্ভবে, ১৫
অক্ষিতি-মধ্যে গন্ধ কোথায় ?—
কেবল সে ছিল অন্ধকার !
আবার সে হবে অন্ধকার !

শম্ভু-নিনাদিত প্রলয়-বিষাণে
শব্দ-তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আকাশ ; ২০
বিচ্যুত-কক্ষ গ্রহগণ খসিয়ে,
চূর্ণ-বিচূর্ণিত লুপ্ত-বিভাস,—
অনন্ত শূন্যে যেদিন মিশিবে,
লুকাবে যেদিন দেশ ও কাল
ব্রহ্ম-সুষুপ্তির নিশ্বাস-মাঝে— ২৫
সেদিন ফিরিবে তিমির করাল !

—বরদাচরণ মিত্র

২৬৮

আসন্ন ঝটিকা

ঈশানের পুঞ্জ-মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে' আসে
বাধা-বন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণু-কুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘধারা।
ধূসর-পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে, ৫
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরায় নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি'।

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি— ১০
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে' চলে' যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৯

কালবৈশাখী

নটরাজ। সাজিলে কি তাণ্ডব নর্ত্তনে?
আন্দোলিয়া দ্রুমদল, গম্ভীর গর্জ্জনে
বাজাইয়া প্রলয়-পিনাক ঝটিকার?
ওড়ে ধূলি, ঘোরে পত্র, ছিন্ন—লতিকার
প্রাণপণ আগ্রহের একান্ত বন্ধন; ৫
জ্বালামুখী বিদ্যুতের অসহ্য দহন;
পাংশু পুঞ্জীভূত মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর!
ভয়ার্ত্ত বসুধা-বক্ষে কাঁপিছে ভূধর!
উঠিতেছে পড়িতেছে উত্তাল স্পন্দনে
সিন্ধু-বক্ষে লক্ষ ঊর্ম্মি ব্যাকুল ক্রন্দনে ১০
তোমার চরণ বেষ্টি' ভুজঙ্গের মতো!
উদ্যত অশ্বত্থশাখা জটা সমুদ্ধত,

জাগিছে ঈশান কোণে রক্ত ভয়ঙ্কর
তোমার ললাট-দীপ্তি, ওগো দিগম্বর।

—প্রিয়ম্বদা দেবী

২৭০

মেঘের কোলে

আকাশের খুকী,
এ মেঘের কোল থেকে, ও মেঘের কোলে যায়
লাফাইয়া, ঝাঁপাইয়া, হইয়ে কৌতুকী,
কোলে কোলে করে খেলা, শাওনে সায়াহ্ন-বেলা
এই দেখি, এই নাই, এই মারে উঁকি! ৫
হাসিয়া ভৈরবরবে বাখানে জলদ সবে,
করতালি শুনে উঠে ধরণী চমকি',
আমি ও চপলা মেয়ে বড় সাধে দেখি চেয়ে,
জলদের 'বাহবায়' আমি বড় সুখী!
আমারো পরাণ নাচে, যাইতে ওদের কাছে, ১০
আমারো অমনি ছিল মেয়ে সোনামুখী,
আমি বড় ভালবাসি আকাশের খুকী!

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

২৭১

একাত্মতা

আজি যে আঁধার-ভরা তোমার আকাশ!
আজি যে পাগল-করা তোমার বাতাস।
আজি যে ফেলিছে ছায়া প্রলয় তুফান
তোমার আঁধার বুকে ; আজি তব গান
অন্ত-হীন দিশাহারা, উন্মাদের মতো ৫
আমার হৃদয়-তলে গরজে সতত।
তবে এস ভেসে এস, উন্মাদ আমার!
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয়-আভাসে
মরণ-আঁধার-ভরা আকাশে বাতাসে! ১০

—চিত্তরঞ্জন দাশ

২৭২

সমুদ্রের প্রতি

এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে

উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে, ৫
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে···

মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট্ জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে—লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে' ১০
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃ-হৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত ১৫
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৩

জন্ম-রহস্য

(কিশলয়ের জন্ম-কথা)

চোখ দিয়ে ব'সে আছি, কখন অঙ্কুর ফাটি'
বাহিরিবে প্রথম পল্লব ;
একমনে আছি চেয়ে, ধরা যদি পড়ে তাহে—
নিখিলের আদি কথা সব।

সারাদিন বসে' বসে' তন্দ্রা চোখে এল শেষে ৫
চরাচর ডুবিল তিমিরে ;
প্রভাতে দেখিনু জেগে, নয়নে কিরণ লেগে—
কচিপাতা কাঁপিছে সমীরে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৭৪

মাটির রহস্য

এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির চমৎকার,—
চরণে লীন, এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার,—
এই মাটি গো, এই পৃথিবী—এই যে তৃণ-গুল্মময়,—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই বলে' এ তুচ্ছ নয়।
মাটি তো নয়—জীবন-কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,— ৫
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার।
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—এক পিঠে তার লীলার খেল,
আরেকটি দিক অন্ধ অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল !
মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয় লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয় ! ১০
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সূতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৭৫

সর্ব্বজাতীয়তা

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশদেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে ৫
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী মাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক্
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান ১০
কর্ম্ম-অনুরত, সকলের ঘরে ঘরে
জন্ম লাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা ;
নাহি কোনো ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর, ১৫
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাই ঘর-পর

উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি' সহিয়া আঘাত
অকাতরে; পরিতাপ-জর্জ্জর পরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে, ২০
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্ত্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য ক'রে চ'লে যায় আবেগে উল্লাসি',
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সে-ও ভালবাসি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৬

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি-শশী মোদের সাথী।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ ৫
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।

রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়, ১০
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
সেই দিন মহামানব-ধর্ম্মে ১৫
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।

২৭৭

প্রাচীন ভারত

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত-ললাট ;
স্পর্দ্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্ঝনা, আর ধনুর টঙ্কারে, ৫
বীণার সঙ্গীত আর নূপুর-ঝঙ্কারে,
বন্দীর বন্দনা-রবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জ্জে, বিজয়-উল্লাসে,

রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্ম্মকলরোলে। ১০
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার
নির্ব্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৮

আগ্রা-প্রান্তরে

ছিন্নপাখা মৈনাকের মতো চারিধার
দুর্গ সারে সার
পড়ি' আছে পরিশ্রান্ত, ধূলায় ধূসরকান্ত
তীরে যমুনার—
ছিন্নপাখা মৈনাকের মত সারে সার। ৫

গুম্বজে বুরুজে হর্ম্ম্যে কবরে কেল্লায়
ধ্বংসরাশি ভায়।
মর্ম্মরে পাথরে স্বর্ণে সফেদ শোণিম বর্ণে
রাগিণী মিলায়—
সৌন্দর্য্যই শূরত্বের মৃত্যুগীত গায়। ১০

এই ধূলি-বিপাণ্ডুর প্রান্তরের মাঝে
যেন বসি' আছে
অন্ধ এক নিশাচরী কিবা দিবা বিভাবরী
বিনাশের কাজে—
ধূলি-বিপাণ্ডুর এই ধ্বংসরাশি মাঝে। ১৫

সে কভু জাগিবে নাকো চিররাত্রি ধরি'
হেথা র'বে পড়ি'—
শত শত ইন্দ্রপুর সে শুধু করিবে চূর
মুষ্টি মাঝে ধরি',—
নিশ্বাসে উড়াবে ধূলি প্রান্তর-উপরি! ২০

—সতীশচন্দ্র রায়

২৭৯
সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা ৫
খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা ১০
তরুছায়া মসী-মাখা,
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত-বেলা।
এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে! ১৫
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে!
ভরা-পালে চ'লে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু'ধারে, ২০
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তা'রে দাও, ২৫
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে,
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভ'রে। ৩০
এতকাল নদীকূলে
যাহা ল'য়ে ছিনু ভু'লে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে;
এখন আমারে লহ করুণা ক'রে। ৩৫

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি',
শ্রাবণ-গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে ৪০
রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮০

একা

একা আমি, চিরদিন একা—
সে কেন দুদিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভালো—
কেন বা জ্বলিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা ! ৫
ভুলে ভুলে ভালবাসা,
ভুলে ভুলে সে দুরাশা—
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা !

একা আমি এ অবনীতলে,
কেহ নাহি "আপনার" ব'লে, ১০
একাই গাহিব গীতি,
একাই ঢালিব প্রীতি,
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে !—
সে কেন পরাণে আসে,
সে কেন মরমে ভাসে, ১৫
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে !

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তা'রা,
ভাসিলে নয়ন-নীরে
দেয় না মাথার কিরে, ২০
হাসিলে আসে না কাছে ঢেলে সুধা-ধারা!
একা আমি, একা রই,
সুখ-দুখ একা সই—
সে কেন আমার তরে হ'ত দিশেহারা?

একা আমি—জগতের 'পর, ২৫
একপাশে বেঁধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ভুলে
হাসে না কুসুমকুলে,
ঢালে নাকো কলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর,—
সে, হেন একার ঘরে ৩০
কেন অধিকার করে,
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর?

একা আমি আসিয়াছি ভবে—
আমার দোসর কেন হবে?
শ্মশান-সৈকত-বুকে ৩৫
একাই ঘুমাব সুখে,
জগৎ-সংসার মোর শত দূরে র'বে;

আমারে মমতা স্নেহ
দেয়নি, দিবে না কেহ—
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে? ৪০

—মানকুমারী বসু

২৮৯

জীবন-গ্রন্থ

সুদৃঢ় গৌরবে বাঁধা গ্রন্থ মনোহর ;
সম্পদের স্বর্ণজলে নামের অক্ষর
দীপ্ত তাহে। লুব্ধ মনে আগ্রহের ভরে
তুলিয়া লইনু গ্রন্থ কোলের উপরে।
উদ্ঘাটিত জীবনের সুসম্বদ্ধ খাতা— ৫
দুঃখ-কাহিনীর এক কোণা-ভাঙা পাতা
প্রথমে সম্মুখে মোর পড়িল খুলিয়া।
এ স্মারক-চিহ্নে যাই গৌরব ভুলিয়া।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

২৮২

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,—
প্রলয়ের শেষে নিখিল নিলয়
সৃজিল যে বারবার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া ৫
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,— ১০
চির-নবীনতা শিশু-শশিরূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের ১৫
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে জন বুকে,—
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্ত মুখে,— ২০
অনুখন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার—
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি',
তাহারে নমস্কার।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৮৩

ঘুম-পাড়ানী

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব' তোরে
আঁচলটা তোর ভরে' ভরে',
আয়রে আয়রে মধুকর ৫
ডানা দিয়ে বাতাস কর্,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।

আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দে রে গায়, ১০
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়্‌বি শুয়ে শুয়ে।
পাখী রে, তুই কোস্‌নে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮৪

প্রত্যাবর্ত্তন

ওরে পাখি, সন্ধ্যা হ'ল আয় রে কুলায়!
সমস্ত গগন ভ'রে
আঁধার পড়িছে ঝ'রে,
ওরে পাখি, অন্ধকারে নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর্ পক্ষ তোর আয় রে কুলায়। ৫

যতক্ষণ ছিল আলো মেটেনি কি আশ?
ওরে সারা দিনমান
তুই করেছিস্ পান
যত মধু ছিল ভরি' গগন আকাশ;
এবে আলো সাঙ্গ হ'ল মেটেনি পিয়াস? ১০

ওরে আয়, ফিরে আয়, আপনার মাঝে,
ওরে বন্ধ কর পাখা,
অপূর্ব্ব আলোক-মাখা
অনন্ত গগনতল হেথায় বিরাজে!
ওরে আয়, ফিরে আয়, আপনার মাঝে। ১৫

—চিত্তরঞ্জন দাশ

২৮৮

ছিন্ন মুকুল

সব চেয়ে যে ছোটো পীঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোট থালায় হয় না কো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে যে ছোট ৫
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সব চেয়ে যে অল্পে ছিল খুশী,
খুশী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে, ১০
সেই গেছে হায় হাওয়ার সঙ্গে মিশে,
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে;

ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
　　ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয়-তরাসে ছিল যে সব-চেয়ে　　১৫
　　সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবী !

সব-চেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি
　　সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোট
　　আজকে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে;　　২০
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
　　সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যেজন ছিল রে সব-চেয়ে
　　সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৮৬

কবর

গভীর নিদ্রায় পান্থ নয়ন মুদিয়া,
ধূ ধূ ধূ প্রান্তরে আছ একাকী পড়িয়া,
কোথা তব দারাসুত প্রিয় পরিজন ?
ভাবে কি গো মনে তা'রা এ ধূলি-শয়ন ?

না—সুরম্য হর্ম্ম্য-মাঝে শুভ্র শয্যা'পরে ৫
বীজনী ব্যজনে নিদ্রা যায় অকাতরে ?
মাঝে মাঝে তব চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো
উদিয়া মানসে চিত্ত করে বিষাদিত ?
হে দীন, তোমার মতো আমিও এমন
ধূলির শয্যায় কবে করিব শয়ন ? ১০
কবে যে পাইব ত্রাণ এ মরম-দাহে,
কবে মিশে যাবে অণু মৃতের প্রবাহে ?

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

২৮৭

একই

একই ঠাঁই চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি,
জীবন—জল-বিম্ব-সম ; মরণ—হ্রদ-হৃদি ;
দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দু'দিন আগে, দু'দিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

একই ঘোর আঁধার আছে ঘেরিয়া চারিধারে,
জ্বলিছে দীপ, নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে,
অসীম ঘন নীরবতায় উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি' একই খেলা চ'লেছে নিরবধি!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২৮৮

আমি যবে মরিব

আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো
আয়েসে মরিতে যেন পারি;
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিও গো,
বরফ-শীতল দিও বারি;
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো ৫
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো
কেহ নাহি করে অনুরোধ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২৮৯

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ

অন্ধকার মরণের ছায়
কতকাল প্রণয়ী ঘুমায় ?
চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার।
বসন্তের বেলা চলে' যায়,
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়, ৫
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।

মাস বর্ষ হ'ল অবসান,
আশা-বাঁধা ভগন পরাণ
নয়নেরে করেছে শাসন ;
কোনো দিন ফেলি' অশ্রুজল ১০
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তা'র আছিল যে পণ।

আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর-হিয়া,
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ; ১৫
নবীভূত আশারাশি তা'র,
অশ্রু মানা শোনে নাকো আর—
চন্দ্রাপীড়, মেল আঁখি এবে।

দেখ চেয়ে, সিক্তোৎপল ছুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি', ২০
যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া
জীবন তেয়াগি' নিজ কায়
তোমারি অন্তরে যেতে চায়—
তাই হোক্, উঠ গো বাঁচিয়া।

প্রণয় সে আত্মার চেতন, ২৫
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ও না আর—
কানে প্রাণে কে কহিল তা'র—
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়। ৩০

মৃত্যু-মোহ ওই ভেঙে যায়,
স্বপ্ন তা'র চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ-দরশন ;
একদৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়— ৩৫
'এ তো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।'

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
এ স্বপন পাছে ভেঙে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া।

আঁখি দুটি মুখ চেয়ে থাক্, ৪০
জীবন স্বপন হ'য়ে যাক্
অতীতের বেদনা ভুলিয়া !

"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর ৪৫
জাগরণে আছে মিশি';
আঁধারে মুদিনু আঁখি,
আলোকে মীলিনু তায়,
মরণের অবসানে
জীবন জনম পায়।"

জীবন? জীবন, প্রিয়? ৫০
নহি স্বপনের মোহে?
মরণের কোন্ তীরে
অবতীর্ণ আজি দোঁহে?

—কামিনী রায়

২৯০
খেলা

খেলার ছলে হরিঠাকুর
গড়েছে এই জগৎখানা,
চারদিকে তাই খেলার মেলা,
খেলার খালি আনাগোনা।
খেলতে খেলা ভবের বাসে ৫
কোথেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে, খেল্‌না ফেলে
কোথায় পালায় যায় না জানা।

—রাজকৃষ্ণ রায়

২৯১
মৃত্যু-রূপান্তর

শুধু সুখ হ'তে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হ'তে গীতি,
তরী হ'তে তীর;
খেলা হ'তে খেলা-শ্রান্তি
বাসনা হইতে শান্তি, ৫
নভ হ'তে নীড়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯২

অসমাপ্ত

মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায় ?
বলিবার যাহা ছিল সব র'য়ে যায় !
এ বাদলে কোনো কথা জমে নাকো ভালো,
এ বাতাসে আর্দ্রবক্ষে নাহি জ্বলে আলো।
নিবিড় তিমির ভরে ঘনায় যে ব্যথা ৫
মন-অন্তস্তলে, ভাষা তা'র নাহি কোথা
পাই খুঁজে খুঁজে। মেঘ-মন্দ্রে, বৃষ্টিধারে,
তড়িত-চকিতে, সূচিভেদ্য অন্ধকারে,
ঘননীল মেঘে, নিবিড় তমাল-বনে,
আর্দ্র-বসুধা-সৌরভে, বিরহ-গহনে, ১০
কোন্ ব্যর্থ অভিসারে, কখন্ কোথায়
ফুটে ফুটে করি' যেন মিলাইয়া যায়।
মিছে আশে দিশে দিশে ঘুরিছে হৃদয়,
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়।

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা-পরিচয়

প্রথম স্তবক

প্রথম হইতে রামপ্রসাদের জন্ম পর্য্যন্ত কবিদের কবিতা এই স্তবকে গ্রথিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ-গীতিকা হইতে সংগৃহীত কবিতাও ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

১-২-৩-৪-৫-৬—মহাশূন্য, সৃষ্টি, বসন্তোদয়, মধুমাস, বসন্তসখা, বসন্তের প্রভাব—

শুষ্ক বৌদ্ধগান ও দোহার পর বঙ্গ-সাহিত্যে কোমল-কান্ত বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব, মহাশূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি এবং বসন্তাগমে তাহার মধ্য হইতে নবীন সুকুমার সৌন্দর্য্যের বিকাশের সহিত তুলনীয়।

৭—এবং পরবর্ত্তী প্রীতিরহস্য—

পদাবলী বাংলার প্রথম গীতি-কবিতা। সকল সাহিত্যে গীতি-কবিতার প্রধান বিষয় নর-নারীর প্রেম। কিন্তু এই গীতিগুলিতে মানবীয় প্রেমের সুরের সঙ্গে ভগবান্ ও ভক্তহৃদয়ের প্রেমলীলার একটি স্বর্গীয় সুর মিশিয়া উহাদিগকে অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছে (২০৫ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য)। সেকালের প্রেম-সাহিত্যের কতকগুলি রীতি (conventions) থাকা সত্ত্বেও এই গীতিগুলি সহজ, গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ভাবগুলি আপনার স্বাভাবিক ও অতিসুমধুর ভাষা পাইয়াছে।

৯—প্রেমের দুঃখ—

প্রেমপথের সকল দুঃখ ঘনীভূত হইয়া এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

For aught that ever I could read,
Could ever hear by tale or history
The course of true love never did run smooth

—SHAKESPEARE, *Midsummer Night's Dream.*

১৩—অতৃপ্তি—

তুলনীয়—

Dear, I shall never have thee all.

—DONNE, *Lovers' Infiniteness.*

Only I discern—
Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.

—R. BROWNING, *Two in the Campagna.*

১৪— এবং পরবর্ত্তী বয়ঃ-সন্ধি—

এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যবর্ত্তিনী হইতেছেন শ্রীরাধিকা। বিশ্ব-সাহিত্যে ইহার ন্যায় প্রেমিকা আর নাই। ইহার প্রেম বহু অবস্থার মধ্যে বহুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভোগ ইহার প্রধান সুর বা শেষ কথা নহে। বরং ইহার মধ্যে প্রেমের অসীম দুঃখের যে গভীর সুর, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। কারণ শ্রীরাধিকার প্রেম infinite passion, তাহার তৃপ্তি হইতে পারে না। এই প্রেমলীলার পটভূমিস্বরূপ বহিঃপ্রকৃতি কখনও বসন্ত, কখনও শরৎ, কখনও বর্ষা লইয়া আসিয়া ইহার সঙ্গে আপনার ভাব মিশাইয়া দিয়া ইহাকে যেন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে।

১৫—বয়ঃসন্ধি—

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-সৌন্দর্য্যের কথা এখানে নাই। যৌবনস্পর্শে শ্রীরাধিকার মন যে সরস, নবীন ও চঞ্চল হইয়াছে তাহাই তাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টি, চরণের গতি ও সলজ্জ ভাব ও হাস্যে প্রকাশ পাইতেছে।

Nymph of the downward smile
and sidelong glance.

—KEATS.

১৬—সঞ্চারিণী—

তুলনীয়—

Grace was in all her steps, heaven in her eye,
In every gesture dignity and love.

—MILTON, *Paradise Lost*, Book VIII.

" From the meadow your walks have left
so sweet
That whenever a March wind sighs
He sets the jewel-print of your feet
In violets blue as your eyes.

--TENNYSON, ***Maud.***

২২—বন-মাঝে কি মন-মাঝে—

তুলনীয়—

Not to the sensual ear, but, more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tune.

—KEATS, ***Ode on a Grecian Urn.***

২৩—মুরলীসঙ্কেত—

প্রেমের আহ্বানে এবং প্রেমকে মহিমান্বিত করিবার জন্যই জগতের সকল সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হইয়াছে। মুরলীরব সেই প্রেমের আহ্বান।

২৫—মিলন-সৌভাগ্য—

কথায় কথায়, ছন্দে ছন্দে প্রিয়-মিলনের আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরাধিকার প্রেম-সৌভাগ্যে তাঁহার জীবন একটি নূতন পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সঙ্গীতে যে রজনী প্রভাত হইয়াছে, তাহা তাঁহারও জীবন-প্রভাত।

Now good morrow to our waking souls.

—DONNE, *The Good Morrow.*

২৬—শরৎশ্রী—

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনেই শরৎকালের সৌন্দর্য্য সার্থক হইয়াছে।

৩৭—আশা-হতা—

She only said, My life is dreary,
He cometh not, she said.

—TENNYSON, *Mariana.*

৪১—অভেদাত্মা—

As though I gave, when I did but restore.

—DONNE, *The Will.*

৪২—শরীরাতীত—

তুলনীয়—

First, we lov'd well and faithfully,
Yet knew not what we lov'd nor why,
Difference of sex no more we knew,
Than our guardian angels do.

—DONNE, *The Relic.*

৪৪-৪৫-৪৬—পঞ্চবটীর গুহায়, নীলগিরি, কন্যাকুমারী—

এই সময়ের বাংলা-সাহিত্যে প্রেম কিংবা তপস্যার পটভূমি-(background) স্বরূপ ভিন্ন বহিঃপ্রকৃতির স্বতন্ত্র বর্ণনা আরম্ভ হয় নাই।

এই কবিতাগুলিতে নির্জ্জন পর্ব্বত ও সাগরের গম্ভীর সৌন্দর্য্য গৌরাঙ্গের তপস্যার প্রভাবে যেন আরও জীবন্ত ও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

৪৭-৫০-৫১—গোরার নয়ন, ভক্তি-ব্যাকুলতা, নৃত্যশ্রী—

গৌরাঙ্গের ভক্তি-বিকশিত সৌন্দর্য্য।

৪৮—প্রিয়-হারা—

গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের পব গার্হস্থ্য চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৯৩ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য।

৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭—গোচারণ, কালকেতু, চাঁদ ধরা, ননীচোরা, উমার বাল্যক্রীড়া, ঘুমপাড়ানীয়া গান—

কয়েকটি বাল্য ও শৈশবেব ছবি—রাখাল বালকগণের খেলা, মহাবীর কালকেতুর বাল্যাবস্থা, উমার শৈশব, শ্রীকৃষ্ণের শৈশব, শিশু শ্রীমন্ত। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে একটি মনোহর স্বাভাবিকত্ব এবং কৌতুকাবহ বৈচিত্র্য রহিয়াছে। "চাঁদ ধবা" কবিতাটি দ্বিতীয় স্তবকে যাওয়া উচিত ছিল, ভুলক্রমে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

৫৮—সতীহারা—

মহারুদ্ররূপ ধারণে ও সহচরগণের ব্যস্ততায় কাহারও আসন্ন বিপদ সূচিত হইতেছে। কিন্তু বিরহীদেবতার হৃদয়ের ক্রন্দন তাঁহার একটি মাত্র খেদোক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে।

৫৯—পরিচয়—

অন্নপূর্ণার কৌতুকপ্রিয়তা, কমনীয়তা এবং স্নেহপূর্ণ ব্যবহার চিত্রটিকে মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

দেবী অন্নপূর্ণা কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন। পথে গাঙ্গিনী নদী পার হইবার জন্য খেয়া-ঘাটে উপনীত হইয়াছেন।

৬০—দরিদ্র ফুল্লরা—

ফুল্লরার দারিদ্র্যের চিত্রটি realistic হইয়াছে।

ফুল্লরা কালকেতু ব্যাধের পত্নী। কালকেতুর প্রতি দেবী চণ্ডী কৃপা-পরবশ হইয়া অতিশয় রূপসী রমণীর রূপ ধরিযা তাহার গৃহে আবির্ভূতা হন। ফুল্লরা হাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাঁহাকে নিজের ভগ্ন কুটীরে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হয়—পাছে তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার স্বামী তাহার প্রতি বিমুখ হয়। সেই জন্য সে দেবীকে তাহার বাড়ী হইতে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিল এবং ধর্ম্ম ও নীতির কথা বলিল। অবশেষে নিজের দারিদ্র্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছে—'আমি তো এই সুখে স্বামীর নিকটে আছি, তুমি আবার কিসের লোভে সেখানে আসিয়া জুটিতে চাও ?'

৬১-৬২-৬৩-৬৪—বিদায়কালে, পথে নারী বিবর্জ্জিতা, ঠাকুর-ঝি, মাতা যশোদা—

হাসি-কান্না-মিশ্রিত বাংলার গার্হস্থ্য চিত্র। ২৩৮—২৪২ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য।

৬১—বিদায়কালে—

রাজা মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগের সংকল্প করিলে তাঁহার দুই পত্নী সঙ্গে যাইবার জন্য আবেদন করিতেছেন।

৬২—পথে নারী বিবর্জ্জিতা—

এই কবিতার humour-টি বেশ উপভোগ্য।

৬৫-৬৬-৬৭-৬৮—সুন্দরী-সন্দর্শন, ফুলতোলা, প্রেম সঞ্চার, বিদায়-পত্র—

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার ইতিহাস অবলম্বন না করিয়া বাংলায় এই প্রথম romantic প্রেমের কবিতা।

৬৮—বিদায়-পত্র—

মনসামঙ্গল-রচয়িতা কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী প্রতিবেশী যুবক জয়ানন্দকে ভালবাসিয়াছিল এবং তাহার পিতাও জয়ানন্দের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ ক্ষণিকের মোহে আত্মহারা হইয়া এক মুসলমানীর প্রতি আসক্ত হয়। ইহার পর জাতিচ্যুত জয়ানন্দের সহিত কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব ও বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অপর কাহারও সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া বংশীদাস কন্যাকে একমনে দেবপূজায় নিযুক্ত থাকিয়া রামায়ণ রচনা করিয়া জয়ানন্দকে বিস্মৃত হইতে উপদেশ দেন। কিছু দিন পরে জয়ানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে এবং চন্দ্রাবতীর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়। কিন্তু কোনওমতে চন্দ্রাবতীর দর্শন না পাইয়া সে দেব-মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে গিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করে। কিন্তু তাহাতেও চন্দ্রাবতী দ্বার মোচন না করিলে নিরাশ হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত মালতী ফুল তুলিয়া তাহার রসে মন্দিরের দেয়ালের গায়ে পত্র লিখিয়া রাখিয়া নিকটস্থ নদীর জলে গিয়া ডুবিয়া মরে। পরে চন্দ্রাবতী মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রিয়তমের মৃত দেহ দেখিতে পায়।

৭০—লীলার বিলাপ—

কঙ্কধর ব্রাহ্মণের সন্তান। কিন্তু শৈশবে মাতা-পিতার মৃত্যু হইলে গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসে। গর্গের কন্যা লীলা কঙ্কের সমবয়সী ও ক্রীড়াসঙ্গিনী হইল এবং ক্রমে উভয়েব মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইল। গর্গ বিরোধী হওয়ায় কঙ্ক পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। কঙ্কের বিরহে কাতরা লীলা প্রাণত্যাগ করে।

৭৩—মলুয়ার বিদায়—

চাঁদবিনোদ নামক এক যুবা কোড়াপাখী শিকার করিতে গিয়া ভিন্ন গ্রামে এক পুকুরপাড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তাহাকে দেখিয়া মলুয়া-সুন্দরী মুগ্ধ হয়। কলসীতে জল ভবিবার শব্দ করিয়া মলুয়া চাঁদবিনোদকে জাগাইয়া তুলে ও উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং পরে বিবাহ হয়। একদিন কাজী মলুয়াকে ঘাটে দেখিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া চাঁদবিনোদ বন্দী হয়। কিন্তু মলুয়া দেওয়ানের নিকট নিজের পতিপ্রেম ও সতীত্বের পরিচয় দিয়া নিজে মুক্তি পায় ও স্বামীকেও মুক্ত করিয়া আনে। কিন্তু গ্রামের লোকে মলুয়ার জাতি গিয়াছে বলিয়া তাহাকে গৃহে স্থান দিতে চাঁদ-বিনোদকে নিষেধ করে। মলুয়া সমাজপীড়ন হইতে স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে অন্য একটি বিবাহ দিয়া নিজে তাহাদের দাসী হইয়া সেই বাড়ীর একান্তে বাস করিতে থাকে। কিন্তু তাহাতেও সমাজ-পতিরা সন্তুষ্ট না হইয়া চাঁদবিনোদকে পীড়ন করিতে থাকে যে, সে মলুয়াকে গৃহে স্থান দিতে পারিবে না। স্বামীর বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মলুয়া স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে সঙ্কল্প করে, কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে দূরে স্বামিসেবায় বঞ্চিত হইয়া থাকা মৃত্যুর অধিক

ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া মলুয়া ভগ্ন-নৌকায় উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

৭৪—সোনাই হরণ—

ভাটুক বামুনের কন্যা সোনাই অপরূপ সুন্দরী যুবতী। মাধবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয় এবং উভয়ে পত্র লিখিয়া পরস্পরের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করে। বাঘরা নামে এক দুর্জ্জন হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া দেওয়ান ভাবনাকে খবর দিল যে, দেওয়ানের "পরগনা মহালে আছে পরম সুন্দরী"। বাঘরা দেওয়ানের দূত হইয়া আসিয়া ভাটুক বামুনকে বাহান্নপুরা লাখেরাজ জমী দিবার লোভ দেখাইল। বামুন কন্যাকে দেওয়ানের হাতে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল, কিন্তু সে কন্যাকে ও কন্যার মাতাকে এই দুরভিসন্ধি জানাইল না। সল্লা দূতী সোনাইকে ভুলাইয়া নদীর ঘাটে লইয়া গেল। দেওয়ান ভাবনার চরেরা সোনাইকে ধরিয়া পানসী নৌকাতে তুলিল। এই সময়ে সোনাই বিলাপ করিয়া তাহার প্রেমাস্পদ মাধবকে সংবাদ দিতে বলিতেছে।

যখন দেওয়ানের চরেরা সোনাইকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে মাধব নৌকায় চড়িয়া সোনাইকে দেখিতেই আসিতেছিল। সে অপর পানসীতে রমণীর ক্রন্দন শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল, এবং সোনাই মাধবের স্বর শুনিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন মাধব দেওয়ানের লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সোনাইকে উদ্ধার করিল।

সোনাইর সঙ্গে মাধবের বিবাহ হইল। কিন্তু দেওয়ান মাধবকে ধরিয়া বন্দী করিল। তখন সোনাই দেওয়ানের কাছে উপস্থিত হইয়া মাধবকে মুক্ত করিল এবং নিজে বিষ খাইয়া মরিয়া সতীত্ব রক্ষা করিল।

এই কবিতায় দেখি—সোনাই যৌবনকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ছিল; তাহার পূর্ব্বরাগ হইতে মাধবের সঙ্গে বিবাহ হয়। মাধব বীরপুরুষ ছিল, সে দেওয়ানের সোনাই হরণ চুপ করিয়া সহ্য করে নাই।

৭৭—বিদ্যাপতির প্রার্থনা—

তুমি অনাদি-অনন্ত। সৃষ্টিশক্তি এবং সৃষ্টি তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমাতেই বিলীন হয়। আমি পাপী হইলেও তোমার সৃষ্টির বহির্ভূত নই। অতএব তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিবে, আমার আর অন্য আশা নাই।

দ্বিতীয় স্তবক

রামপ্রসাদের ও যে-সকল কবি তাঁহার পরে এবং মধুসূদনের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কবিতা এই স্তবকে গ্রথিত হইয়াছে। বাউল কবিতাও ইহারই ভিতর আছে।

৭৮—কবি—

"জগৎ-সৃষ্টির আনন্দ-গীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়-বীণার তন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে। সেই যে মানস-সঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ,—তাহারই

বিকাশ সাহিত্য। বিশ্বের নিঃশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।……বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালমন্দ, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে,—এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায় অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

৮০—প্রবাসে—

তুলনীয়—

I travell'd among unknown men
In lands beyond the sea ;
Nor, England ! did I know till then
What love I bore to thee.

—WORDSWORTH.

৮১—আমার বাড়ী—

তুলনীয়—

Nine bean rows will I have there,
a hive for the honey-bee,
And live alone in the bee-loud glade.

—YEATS, *The Lake Isle of Innisfree.*

৮২—নয়নে মনে, এবং তৎপরবর্ত্তী—

এই প্রেম-গীতিগুলির মধ্যে লঘুতা আছে। ইহার ভাষার মধ্যেও একটু কৃত্রিমতা আছে। কিন্তু এক একটি গান এক একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটির ভিতর একটি সহজ সম্পূর্ণতা আছে।

৮৫—প্রতীক্ষা—

তুলনীয়—

Not, Celia, that I juster am
Or better than the rest;
For I would change each hour, like them,
Were not my heart at rest.
But I am tied to very thee
By every thought I have;
Thy face I only care to see
Thy heart I only crave.

—SIR C. SEDLEY.

৮৮—সকলি তোমার—

তুলনীয়—

I cannot change, as others do,
Though you unjustly scorn,
Since that poor swain that sighs for you,
For you alone was born.

--J. WILMOT, EARL OF ROCHESTER.

৯৫-৯৬—অহেতুক প্রেম, বিচার—

তুলনীয়—

Love me not for comely grace,
For my pleasing eye or face,
Nor for any outward part,
No, nor for my constant heart,—
For those may fail, or turn to ill,
So thou and I shall sever :

Keep therefore a true woman's eye
And love me still but know not why—
So hast thou the same reason still
To dote upon me ever.

—*Anonymous.*

১০৪—পঞ্চশরের ভুল—

এই গানটিতে হাসি (humour) ও কান্নার (pathos) অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। এই কবিতাটি একটি সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার ও বিদ্যাপতির একটি কবিতার ভাব লইয়া বিরচিত।

১০৮-১০৯-১১১-১১২-১১৪—মধুভিখারী, কোকিলের প্রতি, জলভরা, মনের ছায়া, অশ্রুপ্লাবিত—

এই সঙ্গীতগুলির ভাষায় এবং কল্পনাতে নৈপুণ্য আছে কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব নাই। Fancy আছে, imagination নাই; wit আছে, humour নাই। কোথাও কোথাও (১৪৪ সংখ্যা) কোমল ভাব আছে।

১০৯—কোকিলের প্রতি—

তুলনীয়—

Thou'll break my heart, thou bonnie bird
That sings upon the bough;
Thou minds me o' the happy days
When my fause Luve was true.
Thou'll break my heart, thou bonnie bird
That sings beside thy mate;
For sae I sat, and sae I sang,
And wist na o' my fate.

—ROBERT BURNS.

১১৩—সেই বাঁশী—

তুলনীয়—

For do but note a wild and wanton herd,
Or race of youthful and unhandled colts,
Fetching mad bounds, bellowing and
neighing loud,
Which is the hot condition of their blood :
If they but hear perchance a trumpet sound,
Or any air of music touch their ears,
You shall perceive them make a mutual stand
Their savage eyes turned to a modest gaze
By the sweet power of music :
therefore the poet
Did feign that Orpheus drew trees, stones and
floods ;
Since nought so stockish, hard and full of rage,
But music for the time doth change his nature.

—SHAKESPEARE, *Merchant of Venice.*

১১৫—শুকসারী-সংবাদ—

প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ বিচার করা চলে না। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পৃথক্ করিলে ভুল হইবে।

১১৬—সুখস্মৃতি—

শেষ লাইনের 'প্রিয়ে' শব্দটি সম্বোধন পদ ধরিয়া লইলে উহা apostrophe এই figure of speech-এর চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়।

১১৮—শূন্য বৃন্দাবন—

শেষ দুই ছত্রে বৃন্দাবনের শূন্যতা আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

১২০—সুখস্বপ্ন—

মাতৃহৃদয়ের সহজ সরল আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১২২—ইঙ্গিত—

তুলনীয়—

O nothing, in this corporal earth of man
That to the imminent heaven of his high soul
Responds with colour and with shadow, can
Lack correlated greatness

—F. THOMPSON.

১২২-ও পরবর্ত্তী ইঙ্গিত—

বাংলা-দেশের সাধারণ লোকদেব হৃদয়ে যে গভীব ধর্ম্মভাব নিহিত আছে, এই কবিতাগুলিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সংসারের শত কর্ম্মের মধ্যে কাহাব আকর্ষণে মন উদাসী হইয়া, পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় (১২৮), স্রোতের দীপের ন্যায় (১৩২) চলিয়া যায়, মনের মানুষের সন্ধান করে (১২৯); অথচ সেই সন্ধান ও সাধনের মধ্যে সহজ ভাব ও বিশ্বাসপূর্ণ প্রতীক্ষা চাই (১২৩)। বিশ্বাস ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিলে সংসারে ও বহিঃপ্রকৃতিতে সকল পদার্থের মধ্যেই পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার রহস্যময় সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় (১২২, ১২৪, ১২৬, ১৩১, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪)। এমন কি, পৌত্তলিকতার মধ্যে আধ্যাত্মিক পূজার আভাস রহিয়াছে (১৩০, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩)।

১২৩—প্রতীক্ষা—

তুলনীয়—

"জলে নামিলেই যেমন তাহাতে মগ্ন হওয়া যায়, পক্ষী যেমন অনায়াসে উপরে উঠে, আত্মার ব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া মানস-পক্ষীর ঊর্দ্ধে উঠা তেমনি সহজ।...যদি যোগী হইতে চাও, আপনাকে সহজাবস্থায় ছাড়িয়া দাও, টানাটানি করিয়া কিছু হইবে না।...হে মনুষ্য, আধ্যাত্মিক অবস্থা সহজ এবং স্বাভাবিক।"

—কেশবচন্দ্র সেন, সেবকের নিবেদন।

১২৮—অজানিতের টান—

তুলনীয়—

কবে অকূলের খোলা হাওয়া
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে;
কবে শোনা যাবে ঘন ঘোর রবে
মহাসাগরের কলগান!

—রবীন্দ্রনাথ।

১২৯—মনের মানুষের সন্ধান—

তুলনীয়—

আমি চিনি না, জানি না, বুঝি না তাঁহারে—
তথাপি তাঁহারে চাই!
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে
তাঁর পানে ছুটে যাই।...
না জেনে না শুনে মজেছি যাঁর গুণে
বল তাঁরে কোথা পাই?
ডুবিব অতলে মহাসিন্ধুজলে—
যা থাকে কপালে ভাই!

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল)।

১৩৩—কাণ্ডারী—

মানুষ নিজের চেষ্টায় মনের প্রবৃত্তির গতি ফিরাইতে পারে না। এই অবস্থায় ঈশ্বরের কৃপার প্রয়োজন। তিনিই ভবকর্ণধার।

১৩৭—দেবাভাস—

শেষভাগের সহিত তুলনীয়—

Perceives it die away
And fade into the light of common day.

—WORDSWORTH, *Immortality Ode*.

১৩৮—পথের বাধা

তুলনীয়—

Our little systems have their day
They have their day and cease to be,
They are but broken lights of thee
And Thou O Lord art more than they.

—TENNYSON, *In Memoriam*.

১৩৯—রসস্বরূপ—

ভক্তির দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ প্রেমময়ের রূপে উদ্ভাসিত। মানবহৃদয় কখনও কখনও সেই রূপের মিষ্টত্ব অনুভব করে।

১৪০—রহস্যময়ী—

সুখ দুঃখ দুইই তাঁহারই প্রেমের লীলা। মঙ্গল দুঃখের ছদ্মবেশে আসে, কিন্তু চতুর ভক্ত তাহাকে চিনিতে পারেন।

১৪১—অভিমান—

তুলনীয়—

অসহায় শিশু ছেলে
বনের মাঝে একলা ফেলে
চলে যা'স তুই কোন্ আক্কেলে
এই কি গো সন্তানে প্রীতি।

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

১৪২—রসের তিমির—

তুলনীয়—

দিগন্ত প্রসার অনন্ত আঁধার
আর কোথা কিছু নাই ;
তাহার ভিতরে মৃদু মধু স্বরে
কে ডাকে শুনিতে পাই ;
আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া
না বুঝিয়া চলি তাই।

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

তৃতীয় স্তবক

মধুসূদনের, ও যে-সকল কবি তাঁহার পরে ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের, কবিতা এই স্তবকে গ্রথিত হইল।

১৪৫—মাতৃভাষা—

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবের মধ্যে মাতৃভাষাকে যে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাহাই মধুসূদনের প্রধান কবিকীর্ত্তি। বাংলা কবিতায়

নিগূঢ় ও রহস্যময় সম্বন্ধ, দুইয়ের ভাবের আদান-প্রদান, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রথম পাওয়া যাইবে। STOPFORD BROOKE অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী Nature Poetryর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই স্তবকের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য—The landscape has no sentiment of its own.

১৫৮—অরণ্যে—

এই কবিতার ধ্বনি ভাবের প্রতিধ্বনি-স্বরূপ হইয়াছে।

১৬১—নিদ্রামগ্ন জগৎ—

যমুনালহরী কবিতাতে নদী যেমন পুরাণ এবং ইতিহাসের সাক্ষী হইয়াছে, এই কবিতাতে তেমনি গগনের শশী প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। দুইটি কবিতাতেই বিষাদের ভাব।

তুলনীয়—

Merchant of Veniceএর Moonlight Scene.

শেষের দিকে নিদ্রিতা প্রিয়াকে দেখিয়া কবির চিন্তার স্রোত সহসা ফিরিয়া অক্ষয় প্রেমের দিকে চালিত হইয়াছে, যেমন দেখা যায় BROWNINGএর কবিতায়—Love Among the Ruins.

১৬৭—আঁখির মিলন—

বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে একটি ব্যক্তিত্ব আছে এবং মানুষের মনের সহিত প্রকৃতির মনের মিলন হয়, এই ভাবটি WORDSWORTHই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

১৭০—নারী সৃষ্টি—

তুলনীয়—ঈভের সৃষ্টি

MILTON, *Paradise Lost*, *Book VIII*, lines 364 *et seq.*

১৭১—স্বভাবসুন্দরী—

তুলনীয়—

Her eyes as stars of twilight fair;
  Like twilight's too her dusky hair;
But all things else about her drawn
  From May-time and the cheerful dawn.

—WORDSWORTH.

স্বভাবসুন্দরী কবিতার শেষ দুইটি লাইন কবির অনুপযুক্ত হইয়াছে। অত্যুক্তি।

১৭২—বঙ্গনারী—

নারী-স্বভাবের মিষ্টতা।

১৭৩—পরিচয়—

মল্ যে কেবল পদবিক্ষেপকে ঝঙ্কৃত করিতেছে, তাহা নহে, সঞ্চারিণীর মনের ভাবকেও ঝঙ্কৃত করিতেছে।

১৭৬—প্রেমের চক্ষু—

তুলনীয়—

Love looks not with the eyes, but
  with the mind,
And therefore is wing'd cupid
  painted blind.

—SHAKESPEARE, *Midsummer Night's Dream*

১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১—অনুসন্ধান, বৃথা, বিরহিণী, বিরহের সখিত্ব, আর না, বিরাগ, ভুলিলে কেমনে, প্রেমের দুঃখ,

কাণ্ডারীহীন, অতৃপ্তি, আগে যদি জানিতাম, স্মৃতি, বিধবার আর্শি—

প্রেম-পথের বাধা—বিচ্ছেদ, বিস্মৃতি, বিরাগ, বৈধব্য।

১৮০—বৃথা—

এই কবিতাটির অনুপ্রাস কষ্টকল্পিত নয়; Keatsএর অনুপ্রাসের ন্যায় সহজ এবং স্বাভাবিক।

১৮৭—কাণ্ডারীহীন—

তুলনীয়—

Fair laughs the moon, and soft the zephyr blows,
While proudly riding o'er the azure realm
In gallant trim the gilded vessel goes.
Youth on the prow, and Pleasure at the helm:
Regardless of the sweeping Whirlwind's sway,
That hush'd in grim repose expects his
evening prey.

—GRAY, *The Bard.*

১৯০—স্মৃতি—

"সেই মুখখানি"—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেম'।

১৯২-১৯৩—প্রতিজ্ঞা-পূরণ, চৈতন্যের সন্ন্যাস—

মনুষ্যত্বের দুইটি আদর্শ এই কবিতা দুইটিতে পরিব্যক্ত।

১৯৪—অজানিতের টান—

তুলনীয়—

'মধুর রাতে কে বীণা বাজায়'—কবিতা দ্রষ্টব্য।—অতুলপ্রসাদ সেন।

১৯৫—শ্মশান

শেষভাগের সহিত তুলনীয়

Thou, from whose unseen presence
the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter
fleeing.

—SHELLEY, *Ode to the West Wind.*

১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০—শ্মশান, পুনর্মিলন, পরলোকের সঙ্গী, আহ্বান, পিঞ্জর-মুক্ত, অমরতা—

মৃত্যু ও অমরতা বিষয়ক। মধুসূদনের প্রথম কবিতাটিতে (১৯৫) মৃত্যুর করাল এবং ধ্বংসকারী রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে কোনও আশার আলোক নাই। তাঁহার শেষ কবিতাটিতে (২০০) লোক-স্মৃতির অমরতার (posthumous fame) বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে মানবাত্মার নিজেরই যে নূতন জীবন আরম্ভ হয়, সে-কথা নাই। সুরেন্দ্রনাথের কবিতাতে (১৯৬) যুক্তির দ্বারা দেখানো হইয়াছে যে, পুনর্মিলনের আশা অযথা নয়—প্রেম চিরবৃদ্ধিশীল এবং প্রেম থাকিলে তাহার ভাজন থাকিবেই। চিরঞ্জীব তাঁহার মধুর সঙ্গীতে (৩৯৭) বলিয়াছেন যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেমের সম্বন্ধ যাহা, তাহাই পরকালেও চলিতে থাকিবে, আর যদি সে-সম্বন্ধের সূচনা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরকালে পুনর্মিলনেব আশা করা যায় না। অক্ষয়কুমার তাঁহার দুইটি কবিতাতে (১৯৮-১৯৯) বলিয়াছেন, মৃত্যু আত্মাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেয় এবং বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়। অতএব বিশ্বের সকল পদার্থের ভিতর দিয়া তাহাকে আহ্বান করা যায়। (তুলনীয় SHELLEY, *Adonais*, Stanzas 42 and 43, "He is made one with Nature" etc.)

চতুর্থ স্তবক

রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার পরে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতা এই স্তবকে গ্রথিত হইয়াছে, কিন্তু ১৯০০ সালের পরে লিখিত জীবিত কবিগণের কবিতা দেওয়া হয় নাই।

২০১—জাগরণী—

এই সঙ্গীতে দুইটি শুভ জাগরণ সূচিত হইতেছে—রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে কবি-প্রতিভার উন্মেষ এবং বঙ্গ-সাহিত্যে অভিনব গীতি-কবিতার আবির্ভাব। এই নবীন গীতি-কবিতার প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভা-বান্ কবি রবীন্দ্রনাথ। বিষয়, ভাব, ভাষা, ছন্দ, সকলেতেই ইহার বিশেষত্ব।

২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২—
ভারত-বীণা, বাল্মীকি, কুমারসম্ভব-গান, বৈষ্ণব কবিতা, প্রেমগীতি, স্বপ্ন, দেবনিঃশ্বসিত, গীতি-কবিতা, পলাতক, কবিপ্রকৃতি, কবি—

বঙ্গকবিতার এই নব (রবীন্দ্রীয়) যুগে কবি এবং কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন অভিজ্ঞতা আসিয়াছে, তাহা এই একাদশটি কবিতায় বুঝা যায়ঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের প্রতি নূতন শ্রদ্ধা (২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭); কবির সত্য উপলব্ধি (২০৩); কবিতার প্রভাব (২০৪, ২০৭); কবিতার প্রেরণা (২০৮); কবিতার বিষয় (২০৬); গীতি-কবিতা (২০৯), কবি-প্রকৃতি (২১১); বিশ্বজগতের সহিত কবির সম্বন্ধ (২১২)।

২০৩—বাল্মীকি—

কবির প্রেম-বিকশিত হৃদয় কবিতার জন্মস্থান। কিন্তু বাল্মীকি ও মিল্‌টনের ন্যায় মহাকবিরা অনুভব ও স্বীকার করেন যে, কবিত্বশক্তি দেবতার দান। কবি গল্প ও ইতিহাসচ্ছলে অন্তরের সত্য ধারণাকে প্রকাশ করেন। ঘটনাগুলি কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাবের সত্যতা ঠিক থাকে। কবির প্রধান বিষয় মানব-চরিত্র।

২০৪—কুমারসম্ভব-গান—

DRYDEN Alexander's Feast কবিতাব কল্পনাতে দেখাইয়াছেন, টাইমোথিয়সের সঙ্গীত দিগ্বিজয়ী বীরেব মনকে কেমন বশীভূত করিয়াছিল। এখানে দেবী পার্ব্বতীর মনেব উপর কালিদাসের কবিত্বের প্রভাব কল্পনা কবিয়া আবও সুমধুব ভাবে কবি সঙ্গীতের গৌরব দেখাইয়াছেন।

২০৫—বৈষ্ণব কবিতা—

আপনাব হৃদযের অনুভূতি ও পৃথিবীর ভাষা ইহাই মানুষের দেব-পূজার উপকবণ।

২০৬—প্রেমগীতি—

ভারতীয় কবিতার প্রধান বিষয় ধর্ম্ম, বিশেষতঃ প্রেমের ধর্ম্ম। যেখানে তাহার সহিত মানবীয় প্রেমেব ভাব মিশিয়াছে সেই গীতিকাব্য সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

২০৭—স্বপ্ন—

কালিদাসের প্রতিভাগুণে উজ্জয়িনী নগরী এবং সেখানকার বিচিত্র জীবনলীলা পাঠকের মানসলোকে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এমন কি উহা যেন পূর্ব্বজন্মের সুখ-স্মৃতির মতো মনে হয়।

২০৮—দেব-নিঃশ্বসিত—

ইহা যে অপরিণত-বয়স্ক কবির কল্পনা তাহা বেশ বুঝা যায়।

২০৯—গীতিকবিতা—

Epic কবিতা বৃহৎ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। Lyric কবিতা কোনও সমগ্র ঘটনা অবলম্বন না করিয়াও তাহার ছোট ছোট ভাব লইয়া রচিত হয়। Short swallow-flights of song.

২১০—পলাতক—

তুলনীয়—

Fancies that broke through language and
escaped.

—BROWNING, *Rabbi Ben Ezra*.

২১১—কবিপ্রকৃতি—

তুলনীয়—

GRAY'S *Elegy* :

There at the foot of yonder nodding beach . . .

২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭—উৎসবময়ী, ভারতলক্ষ্মী, আশার স্বপন, আমাদের বাংলা, শরৎ—

দেশপ্রেমের এই কবিতাগুলির মধ্যে অবসাদের ভাব নাই। দেশের গৌরব ও ভবিষ্যতের আশা ইহাতে ধ্বনিত হইতেছে। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য, কল্যাণশীলতা, পরাবিদ্যা, কাব্যকাহিনী—প্রাচীন ভারতের প্রধান গৌরব।

২১৫—আশার স্বপন—

তুলনীয়—

Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks.

—MILTON, *Areopagitica.*

২১৮-২১৯-২২০-২২১—ছিন্নতন্ত্রী, মধুব্রত, দর্পহরণ, সোনার কাঠি—

গীতিকবিতার প্রধান বিষয় প্রেম—যে প্রেম বিশ্বকে পূর্ণ এবং মধুময় করিয়া রাখিয়াছে (২১৯), যাহা মানুষের হৃদয়ে সহসা সঞ্চারিত হয় (২২০), যাহার স্পর্শে হৃদয় নবজীবন প্রাপ্ত হয (২২১)।

২১৯—মধুব্রত—

The bridal of the earth and sky.

—G. HERBERT, *Virtue.*

And half of the world a bridegroom is,
And half of the world a bride.

—WILLIAM WATSON. *An Ode in May.*

২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮—উর্ব্বশী, নিবেদিতা, রূপ, ঘোমটা খোলা, নয়ন-বিহঙ্গ, চুলবাঁধা, নারী-প্রতিমা—

এই কয়টি কবিতা লইয়া একটি গুচ্ছ। ইহাদের বিষয় নারীর রূপ। উর্ব্বশীর বিষয় হৃদয়-সম্পর্ক-হীন, তৃপ্তিহীন নারীর রূপ। নিবেদিতার বিষয় সেই হৃদয়-সম্পর্কের মিষ্টতা। রূপ, ঘোমটা খোলা, নয়ন-বিহঙ্গ কবিতার বিষয় নারীর রূপের বিচিত্র প্রকাশ,

ও তাহার আকর্ষণ। চুলবাঁধা কবিতাতে দেখি বিধাতা নারীকে যে কেবল রূপ দিয়াছেন তাহা নহে, সহজে সেই রূপকে ফুটাইয়া তুলিবার উপায়ও দিয়াছেন। নারীপ্রতিমাতে দেখি যে পুরুষের বাসনা নানাভাবে সেই রূপের উপরে মোহের লাবণ্য আরোপ করিয়া রাখিয়াছে।

২২২—**উর্ব্বশী**—

যে অক্ষয় সৌন্দর্য্য ও নিরুপম গতিচ্ছন্দ বিশ্বজগৎকে চিরনবীন করিয়া রক্ষা করিতেছে, তাহারই আভাস নৃত্যপরা, সর্ব্বসম্পর্কবিহীনা, হৃদয়হীনা, অনন্তযৌবনা, উর্ব্বশীতে নারীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। নারীর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যদি স্নেহ-কোমল হৃদয়ের যোগ না থাকে তাহা হইলে উহা কেবল পুরুষকে পীড়ন করে কিন্তু কোনও তৃপ্তি দিতে পারে না।

তুলনীয়—

(১) BOTTICELLIর চিত্র The Birth of Aphrodite,

২) The Helen Myth,

(৩) KEATSএর কবিতা, 'La Belle Dame Sans Merci'.

উর্ব্বশী উদয়াচলে আর দেখা দেন না। জগতের চিরনবীন সৌন্দর্য্য পূর্ব্বতন কবিদের চক্ষে (যেমন গ্রীক কবি ও শিল্পীদের নিকট) আত্ম-প্রকাশ করিত, এখনকার কবিদের নিকট তাহা করে না। তাহাদের সে হৃদয়, সে দৃষ্টি নাই।

তুলনীয়—

WORDSWORTHএর Sonnet—"The world is too much with us."

KEATSএর Sonnet—"Glory and Loveliness have passed away from the earth."

২২৩—নিবেদিতা—

হিন্দু বিবাহের গভীর ভাব ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে। উর্ব্বশী নহে, এই বালিকাই হিন্দু নারীর আদর্শ।

২২৫—ঘোমটা খোলা—

ঘোমটা হিন্দু নারীর মুখশ্রীকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া একটি মধুর রহস্যের সৃষ্টি করে।

How that great work of Love enhances Nature's.

—E. B. BROWNING, *Yet Love, mere love.*

Beauty is the lover's gift.

—CONGREVE, *The Way of the World.*

২২৮-২২৯-২৩০—নারী-প্রতিমা, রমণীর মন, রহস্যদীপ—

নারীহৃদয়ের রহস্য-বিষয়ক। নারীর প্রকৃতরূপ যেমন পুরুষের চক্ষে সম্পূর্ণ ধরা দেয় না, তেমনি নারীর হৃদয়ও একটি প্রহেলিকা। এই দুই কারণে নারী পুরুষকে আকর্ষণ করে। যাহা অজ্ঞাত অথবা অসম্পূর্ণ-জ্ঞাত তাহার আকর্ষণই romance-এর সৃষ্টি করে।

২৩২-২৩৩-২৩৬—প্রিয়াস্মৃতি, অন্তঃপুরিকা, কুণ্ঠিতা—

এই তিনটি কবিতা প্রিয়স্মৃতি-বিষয়ক। তৃতীয়টি সর্ব্বাপেক্ষা intense। হিন্দু অন্তঃপুরের একটি নিভৃত অর্গলবদ্ধ কক্ষে লইয়া গিয়া কবি বিরহিণী বধূর চিত্রটি দেখাইয়াছেন। কুণ্ঠিতা কবিতাটিতে কবি নারীহৃদয়ের ততোধিক নিভৃত অন্তঃপুরে তাহার গুপ্ত কুণ্ঠিত ভালবাসার চিত্রটি দেখাইয়াছেন। দুইটি চিত্রেই প্রেমের তৃপ্তিহীন চঞ্চলতা।

২৩৪-২৩৫-২৩৭—সেকাল ও একাল, সীতাহরণ, শেষ বিদায়—

ভালবাসার পরিবর্ত্তন। এখানে চঞ্চলতা নাই, হতাশের অবসাদ আছে।

২৩৮—অভিসার—

কেবল কি জনহিত-ব্রত সাধনের জন্য সন্ন্যাসী শেষকালে বাসবদত্তার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, না, পূর্ব্বসাক্ষাতের সময় বাসবদত্তার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি তখন তাহা প্রকাশিত হইতে দেন নাই, পরে উহা নিঃস্বার্থ ইন্দ্রিয়াতীত স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হইয়া দুঃখের দিনে প্রিয়তমার সেবায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল?

২৩৯-২৪০—কল্যাণী বা গৃহলক্ষ্মী—

এখানে নারীর রূপ পুরুষের বাসনার আলোকে প্রদীপ্ত হয় নাই, কিন্তু ত্যাগ, সেবা, শুদ্ধশুচিতা এবং ধর্ম্মের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ইহার শান্তি অবসাদের শান্তি নহে, ত্যাগের শান্তি।

২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২—বধূ, স্নেহপাশ, মেনি, পুঁটু, কন্যা-বিদায়—

দরিদ্র বাঙ্গালী ঘরের চিত্র। বাহুল্যহীন সহজ সরল ভাবটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। সুখ-দুঃখ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া একটি পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করিয়াছে।

২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭—তরুসিং, অর্জ্জুন, শিবাজি, গান্ধীজী, ছেলের দল—

ভারতের সেকালের, একালের ও ভাবী কালের মনুষ্যত্বের চিত্র। এদেশের কর্ম্মের আদর্শ—আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখা, ত্যাগপরায়ণ

আত্মসমাহিত ভাব, উচ্চ পদের সহিত সেবার যোগ, নির্ভীক সত্য পরায়ণতা, আধ্যাত্মিকতা।

২৪৫—শিবাজি—

রাজধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ।

২৪৭—ছেলের দল—

যুগসন্ধি কালের (transition period) যে দোষ দুর্ব্বলতা, তাহার মধ্যেও বাঙ্গালী যুবকের যে সহস্র সদ্‌গুণ রহিয়াছে তাহার এমন সহৃদয়তাপূর্ণ ছবি বাংলা-সাহিত্যে আর নাই। ইহাদের যে কর্ম্ম তাহার মধ্যে সমাহিতভাব (২৪৫, ২৪৬) নাই, কেবল অদম্য উৎসাহ।

২৪৮—আশ্রম—

বহু কর্ম্মের ব্যস্ততার পর এই স্নিগ্ধ শান্ত আশ্রমচিত্র উপভোগ ও প্রণিধানের যোগ্য।

২৪৯—ইচ্ছামতী নদীর প্রতি—

তুলনীয়—

TENNYSONএর *A Farewell :*

A thousand suns will stream on thee,
A thousand moons will quiver ;
But not by thee my steps shall be,
For ever and for ever.

২৫০—কাজরী—

উত্তর-ভারতে বর্ষাকালে স্ত্রীলোকেরা গাছের ডালে ঝুলনা ঝুলাইয়া দোল খায় ও বিশেষ এক সুরের গান করে। "মেঘকজ্জল দিবসে" ঐ গান গাওয়া হয় বলিয়া গানের ও সুরের নাম হইয়াছে "কাজরী"।

এই কবিতাতে কবির ছন্দনিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে।

২৫১—বর্ষানন্দ

রবীন্দ্রনাথ বর্ষাতেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পান, এই সময়ে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে moral element নাই। ইহা "ময়ূরের মতো" নৃত্য। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এমন করিয়া আনন্দ প্রকাশ বোধ হয় আর কোনও কবি করিতে পারেন নাই।

২৫২—শীতরাত্রে—

রবীন্দ্রনাথ নাকি বলিয়াছেন যে, এদেশে বর্ষা, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্তের এক একটি রূপ আছে কিন্তু শীতের কোনও রূপ নাই। শীত-প্রধান দেশে শীতের রূপ আছে। পূর্ব্ব কবিতাতে বর্ষার একটি স্নিগ্ধ-শ্যামল পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতে শীতের স্পষ্ট কোনও রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু ইহাতে শীতের ভাবটি (feeling) অল্প কথায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। স্বপ্নরাজ্যের অর্থহীন ঘটনার মতো যে ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, কুহেলিকাচ্ছন্ন শীতরাত্রের ভাবের সহিত তাহা বেশ মিলিয়া গিয়াছে।

২৫৮-২৫৯—চৈত্র-নিশীথ-শশী, ঝরঝর বরিষে বারিধারা—

দুইটি রাত্রি। একটি "শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত" এবং বাতায়ন-পথে গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রেমলীলার সাক্ষী (২৫৮)। অপরটি বিলুপ্ত-শশিতারা, গৃহহারা, জনহীন, হাহুতাশপূর্ণ।

২৬০-২৬১-২৬২—বউ কথা কও, প্রভাতে কাঞ্চন-শৃঙ্গ, সুপ্তোত্থিতা—

তিনটি প্রভাত-চিত্র। প্রথমটি পল্লীগ্রামের প্রভাত, দ্বিতীয়টি হিমালয়-শৃঙ্গের প্রভাত। তৃতীয়টিতে উষাকে রূপ দান করা হইয়াছে।

২৬৩ —মধ্যাহ্ন-ছবি—

রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে বহিঃপ্রকৃতিকে তিন প্রকারে দেখান হইয়াছে। প্রথম মানবীয় রূপে (Personification), যেমন 'বৈশাখ' কবিতাতে; দ্বিতীয় কবির ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ-সংযুক্ত রূপে (Inter-penetrative affinity between Nature and the Poet) যেমন 'নববর্ষা' কবিতাতে; তৃতীয় বিচ্ছিন্ন এবং যথাযথ ভাবে (Concrete presentation), যেমন 'মধ্যাহ্ন-ছবি' ও 'আসন্ন ঝটিকা' কবিতাতে।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ বহিঃপ্রকৃতির কবি এবং তাহার বর্ণনায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য।

২৬৪-২৬৫—জ্যোৎস্না-মদিরা, আবির্ভাব—

দুইটি কবিতারই বিষয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না। প্রথমটিতে জ্যোৎস্না অল্পে অল্পে তাহার মোহ বিস্তার করিয়া মানবের হৃদয়কে মুগ্ধ করিতেছে। অপরটিতে অতর্কিত ভাবে সহসা প্রকাশিত হইয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্না মানব-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

২৬৭—অন্ধকার—

অন্ধকার প্রলয়ের ছায়া।

Milton-এর Chaos and Old Night.

২৭১-২৭২—একাত্মতা, সমুদ্রের প্রতি—

দুইটি কবিতাতেই সমুদ্রের সহিত কবির আন্তরিক যোগ সূচিত হইয়াছে। প্রথমটিতে ভাবের যোগ, দ্বিতীয়টিতে নাড়ীর যোগ।

দুইটি কবিতাতে সমুদ্রের দুইটি mood, প্রথমটিতে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ উদ্দাম; দ্বিতীয়টিতে কৌতুক-কল-হাস্যময় ও ক্রীড়াশীল।

Thou, thou art sure, thou art older than earth ;
Thou art strong for death, and fruitful birth ;
* * * * *
From the first thou wert ; in the end thou art.

Swinburne (about the sea, in
Triumph of Time)

১৭৩—জন্ম-রহস্য—

তুলনীয়—

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower—but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what
God and man is,

TENNYSON.

২৭৪—মাটির রহস্য—

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ কবিতা লেখা সম্ভব ছিল না। Tennyson-এর ন্যায় কবি বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কাব্যলক্ষ্মীর কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন।

২৭৫-২৭৫৬-২৭৭-২৭৮—সর্ব্বজাতীয়তা, জাতির পাঁতি, প্রাচীন ভারত, আগ্রাপ্রান্তরে—

এই চারিটি কবিতার বিষয় সমষ্টিগত মানব, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে "সভ্যতা"র বৈচিত্র্য (২৭৫), তন্মধ্যে সকল মানুষের একতা (২৭৬), প্রাচীন সভ্যতার গৌরব (২৭৭), কোথাওবা প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ (২৭৮)।

২৭৯—সোনার তরী—

পূর্ব্বের চারিটি কবিতায় মানুষকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত রূপে দেখা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের একটি একাকিত্ব (Isolation) আছে। বিশেষতঃ যিনি দৈবপ্রতিভা-সম্পন্ন, তাঁহার প্রতিভার দান জগৎ গ্রহণ করে, কিন্তু তাঁহাকে বুঝে না। Loneliness of genius.

ALFRED DE VIGNYর 'Moses' কবিতা দ্রষ্টব্য—

I have marched before all
sad and solitary in my glory

২৮১—জীবন-গ্রন্থ—

মানুষের সমগ্র জীবন একটি গ্রন্থস্বরূপ। তাহাতে দুঃখের স্মৃতিগুলির দিকেই মন বারবার ফিরিয়া দেখে।

২৮২—নমস্কার—

বৈরাগ্যের আদর্শ।

২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৯০-২৯১—প্রত্যাবর্ত্তন, ছিন্ন মুকুল, কবর, একই, খেলা, মৃত্যুরূপান্তর—

জীবন-সন্ধ্যা, মৃত্যু ও অমরতা বিষয়ক। কুলায়-প্রত্যাশী, ক্লান্ত-পক্ষ পাখীর মত জীবনের সন্ধ্যাকালে মন আপনার মধ্যে আপনি ফিরিয়া আসে (২৮৪)। কিন্তু মৃত্যুর কালাকাল নাই। যে ক্ষুদ্র শিশু পরিবারের সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গে অলক্ষ্যে মিশিয়া ছিল, সে চলিয়া গেলে বুঝা যায় যে, সে কতখানি স্থান জুড়িয়া থাকিত (২৮৫)। মৃত্যুর শেষ কথা কি ? কেবল কি বিচ্ছিন্ন ও বিস্মৃত কবরের ধূলি-শয্যা (২৮৬)? কেবল

কি একই দিগন্তব্যাপী বহস্যান্ধকারের মধ্যে প্রত্যেকের বিলীন হইয়া যাওয়া (২৮৭) ? না। যদিও ভবের খেলা ছাড়িয়া মানুষ কোথায় যায়, কেহ জানে না (২৯০), তথাপি মৃত্যু জীবনের শেষ নহে, জীবনের রূপান্তর মাত্র। পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতার ও কর্ম্মব্যস্ততার সার লইয়া পরকালের রূপান্তরিত জীবনের আবম্ভ (২৯১)।

> Nothing of him that doth fade,
> But doth suffer a sea-change
> Into something rich and strange.
>
> SHAKESPEARE, *Tempest*

২৮৯—চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ—

কবি বাণভট্টের কাদম্বরী-কথা নামক সংস্কৃত কথাগ্রন্থে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রণয়কাহিনী আছে। উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়, গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরীকে দেখিয়া প্রণয়াসক্ত হন এবং কাদম্বরীরও প্রণয় লাভ করেন। কাদম্বরী কিন্তু মুখ ফুটিয়া নিজের প্রণয় পরিব্যক্ত করিতে পারেন নাই, ইহাতে কাদম্বরীর প্রণয়ে সন্দিহান হইয়া চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু পরে তিনি কাদম্বরীর প্রণয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। পথে কাদম্বরীর সখী মহাশ্বেতার কাছে শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধু বৈশম্পায়নের মৃত্যু হইয়াছে। চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর বিরহে কাতর হইয়াই ছিলেন, এখন বন্ধুবিয়োগে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের মূর্চ্ছার সংবাদ পাইয়া সখী মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিলেন, এবং চন্দ্রাপীড়ের সেবাতে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কাদম্বরী

চন্দ্রাপীড়ের মূর্চ্ছাহত শরীব ধৌত-মার্জ্জিত করিয়া পুষ্পভূষায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। সেই সুসজ্জিত দেহ দেখিতে দেখিতে কাদম্বরী প্রণয়াবিষ্ট হইয়া যেমন চন্দ্রাপীড়কে আলিঙ্গন করিয়াছে, অমনি চন্দ্রাপীড়ের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া গেল। চন্দ্রাপীডের মূর্চ্ছাপগমে জাগবণ হইল এবং উভয়ের মিলন হইল।

২৯২—অসমাপ্ত—

জীবনের সকল ঘটনা, সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে এই সুর বাজিতেছে —"মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায়?" অমরতার ইহা একটি প্রমাণ।

অকালে আহূত প্রতিভাবান্ কবি বলেন্দ্রনাথের মুখে এই কথা-গুলি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

> The song that I came to sing remains unsung
> to this day.
>
> —RABINDRANATH.

বঙ্গকাবালক্ষ্মীরও সকল গান এখনও গাওয়া হয় নাই। এ বাদলে যেন গান ভালো জমে নাই। আবার নবীন বসন্ত আসিতেছে।

কবি-পরিচয়

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)--

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬০ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। ইঁহারা জাতিতে সুবর্ণবণিক। অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কাব্যরসাস্বাদনের জন্য কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর ভবনে গতায়াত করিতেন। ইঁহারা সকলেই কবি বিহারীলালের কবিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কবিত্ব লাভ করেন। অক্ষয়কুমার পরবর্ত্তী জীবনে ব্যাঙ্কে ও জীবন বীমা কোম্পানীর আফিসে হিসাবরক্ষক ছিলেন। যখন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের কবিতা নির্ব্বাচন করিতেন। সেই সময় বাংলা ১২৮৯ সালে অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতা ছাপা হয় "রজনীর মৃত্যু"। ১২৯০ সালে তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক "প্রদীপ" ছাপা ও প্রকাশিত হয়। ১২৯২ সালে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "কনকাঞ্জলি", ১২৯৪ সালে "ভুল" ও ১৩১৩ সালে পত্নী-বিয়োগের পর শোককাব্য "এষা" রচিত হইতে থাকে। কিন্তু এষা ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৩১৭ সালে "শঙ্খ' ছাপা হয়। তিনি ১৩:১ সালে ওমর খৈয়ামের অনুকরণে কতকগুলি কবিতা "পান্থ" নামে প্রকাশ করেন। বঙ্গধর্ম্ম-মহামণ্ডল তাঁহাকে 'কবিতিলক' উপাধি দান করেন। প্রকৃতি বর্ণনা, করুণ রস ও প্রণয় বর্ণনাতে অক্ষয়কুমারের দক্ষতা ছিল। পত্নী-প্রেমের

ভিতর দিয়া তিনি সমগ্র নারীজাতির মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসে কবি অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হইয়াছে।

[এষা কাব্যের ভূমিকা; শনিবারের চিঠি ১৩৩৬ বৈশাখ; এষার কবি—প্রিয়লাল দাশ]

আলাওল (১৬১৮?—১৬৬৮)—

আলাওল বা আলওয়াল কবি ফরিদপুর জেলার ফতেয়াবাদ পরগনার জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সম্‌শের কুতুবের মুসলমান সচিবের পুত্র ছিলেন। কবির পিতা পর্ত্তুগীজ-জলদস্যু হার্ম্মাদদের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করেন। কবি কোনওমতে রক্ষা পাইয়া রোসাঙ্গের (আরাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। আলাওলের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া মাগন ঠাকুর আলাওলকে প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সী প্রণীত পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। পদ্মাবতী কাব্য রচনার পর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। মাগন ঠাকুর তাঁহাকে সেই বৃদ্ধ বয়সে "সয়ফুল মুল্‌ক" ও "বদিউজ্জমাল" নামক ফার্সী কাব্য রচনায় নিযুক্ত করেন, কিন্তু কবি আলাওল তাহা সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই শা সুজা আরাকান আক্রমণ করেন এবং কবি আলাওল কারারুদ্ধ হন। পরে কারামুক্ত হইয়া আলাওল ৯ বৎসর অতি দীনভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন সৈয়দ মুসা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি কবিকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করেন। সেই কাব্য রচনা শেষ করিয়া তিনি দৌলত কাজির "লোর চন্দ্রানী" ও "সতী ময়না" কাব্যদ্বয়ের উত্তরাংশ রচনা করেন এবং সৈয়দ মহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তির আদেশে ফার্সী কবি নিজামী গজ্‌নবীর প্রসিদ্ধ কাব্য "হফ্‌ৎ পায়কার" অনুবাদ করেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কয়েকটি পদও পাওয়া গিয়াছে। কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য চিতোরের রাণী পদ্মিনী ও আলাউদ্দীন-সংক্রান্ত কাল্পনিক রূপক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। তাঁহার রচনায় ষড়্ঋতুর বর্ণনা, কলসীকক্ষা রমণীর জল ভরিয়া আনার বর্ণনা, বয়ঃসন্ধি বর্ণনা প্রভৃতি, ও সরস শব্দ যোজনার মাধুর্য্য তাঁহাকে তৎকালীন কবিদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শা সুজার মৃত্যু হয়। অতএব তাহার পূর্ব্বে কবি আলাওল বিদ্যমান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, কবি আলাওলের জন্ম ১৬১৮ সালের কাছাকাছি কোনও সালে হওয়া সম্ভব।

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব; সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল দ্রষ্টব্য।]

আশুতোষ দেব (জন্ম ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে—মৃত্যু ১৮৫৬)—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রামদুলাল সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ দেবের জন্ম কোন্ সালে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। তাঁহার ডাকনাম ছিল ছাতু-বাবু। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথনাথ বা লাটু বাবু নানা গুণের জন্য কলিকাতা শহরে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সঙ্গীত রচনাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি সঙ্গীতদক্ষ লোকদিগকে ও অন্যপ্রকার বিদ্যায় দক্ষ লোকদিগকে অনেক অর্থসাহায্য করিতেন ও উৎসাহ দিতেন। ১৮৫৭ সালে তিনি সংস্কৃত শকুন্তলা নাটক বাংলায় অনুবাদ করাইয়া নিজের বাড়ীতে অভিনয় করাইয়াছিলেন। ছাতু বাবুর মৃত্যু হইলে তখনকার কালের

প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র সংবাদপ্রভাকর ১লা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৮৫৬ সালের সংখ্যায় নিম্নলিখিত শোকপূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করেন—

"আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, গত মঙ্গলবার (২৯এ জানুয়ারী, ১৮৫৬) রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়......মর্ত্তলীলা সম্বরণপূর্ব্বক যোগাধামে গমন করিয়াছেন।...... আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখী বালকদিগকে আহার দিয়া তাহাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে, বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি দিয়া অতিশয় আদরপূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন, তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিতবর্দ্ধন ও হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুর রূপে আনুকূল্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় সঙ্গীত-বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন।......আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীতি প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস সুর রাগ তাল মান অনুভুত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।......"

[সুবল মিত্রের অভিধান; সংবাদপ্রভাকর হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ]

ঈশান দ্বিজ—ময়মনসিংহ-গীতিকার একজন কবি।

ঈশান ফকীর—বঙ্গের নিরক্ষর কৃষকসমাজ হিন্দু-মুসলমান লইয়া

গঠিত। তাই তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মমতের সমন্বয় সাধনের জন্য কত রকম নূতন ও সার্ব্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গুরু-সত্য ধর্ম্মমত এই শ্রেণীর এক উদার ধর্ম্মমত। এই মতের সাধকেরা প্রায় নিষ্কাম ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করেন, এবং অবিবাহিত থাকিয়া সঙ্গীতের ভিতর দিয়া উদার মত প্রচার করেন। ইঁহাদের চেলারা গুরুর গানের সঙ্গে সঙ্গে "জিগীর" দিয়া তাঁহাদের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। এই গুরু-সত্য সম্প্রদায়ের যিনি গুরু, তিনি এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, কোনও মানুষ নহেন। এই সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে লালন ফকীর ও ঈশান ফকীর ছিলেন প্রধান। লালন ফকীরের গান পুরাতন ভারতীতে সরলা দেবী কিছু সংগ্রহ করিয়া ছাপিয়াছিলেন। কিছু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংগ্রহ করিয়া প্রবাসী ও শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অল্প কিছু মুহম্মদ মন্‌সুরউদ্দীন তাঁহার 'হারামণি' নামক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশান ফকীরের গান সামান্যই কয়েকটি পাওয়া যায়। ঈশানের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই।

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১২, ৪৩ পৃঃ ; বাউল ও লালন ফকীর দ্রষ্টব্য]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১—১৮৫৮)—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা ১২১৮ সালে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগনার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র। হরিনারায়ণ এক কুঠীতে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তিন বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার মাতার সহিত

মাতামহের বাড়ীতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন এবং পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন শয্যাশায়ী হইয়া তিনি আপনা-আপনি বলিতেছিলেন—

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়িয়ে কল্‌কাতায় আছি।

ভবিষ্যৎ জীবনে যিনি কবি ও কবিগুরুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কবিপ্রতিভা শৈশবেই স্বতঃই প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি পাঠশালায় লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু মুখে মুখে কবিতা ও ছড়া রচনা করিতেন। তিনি ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখেন নাই বলিয়া তাঁহার রচনায় দুইটি দোষ দেখা যায়—মার্জ্জিত রুচির অভাব ও উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। তাঁহার রচনার অনেকটাই ইয়ারকি, কিন্তু সে ইয়ারকি প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। আর তাঁহার রুচি আধুনিক কালের আদর্শ অনুযায়ী মার্জ্জিত না হইলেও তাহা ভারতচন্দ্র বা দাশরথি রায় বা কবিওয়ালাদের তুল্য অশ্লীল নহে। তাঁহার ইয়ারকি ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা-শূন্য ও পরের প্রতি বিদ্বেষ-শূন্য। ঈশ্বরচন্দ্রের ১৫ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার পিতা এক কুলীন-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সেই বধূ দুর্গামণি অত্যন্ত কুৎসিত ও হাবা বোকা ছিলেন। সেই জন্য ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, অপর বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেও আর বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তিনি চিরকাল স্ত্রীর ভরণপোষণ করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুপত্রে স্ত্রীর জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ দিবার ব্যবস্থাও করিয়া যান। এই জীবনের ট্রাজেডির জন্য তিনি কখনও স্ত্রীলোককে সম্মানের চক্ষে দেখেন নাই, সুযোগ পাইলেই তাহা-দিগকে তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইলে তিনি অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের

কবিতা-রচনার শক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই কিশোর কবির সম্পাদনে অতি অল্প দিনেই সংবাদপ্রভাকর দেশের সকলের সমাদর লাভ করিল, এবং বহু ধনী বদান্য ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখনকার কালের সকল লেখকই সংবাদপ্রভাকরে লিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কবিযশঃপ্রার্থী নবীন লেখকেরা সংবাদপ্রভাকরে লিখিয়া শিক্ষানবিশী করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত অল্পদিনেই নবীন লেখকদের শিক্ষাগুরু হইয়া সম্মান লাভ করিলেন। বাংলাসাহিত্য সংবাদপ্রভাকরের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। বহু লেখক ও কবি ইঁহারই নিকট হাতেখড়ি দিয়া উত্তরকালে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হওয়াতে সংবাদপ্রভাকরেরও তিরোধান হয়। সেই সালেই আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক 'সংবাদ-রত্নাবলী' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র আবার সংবাদপ্রভাকর পুনঃপ্রচার করেন। মূল্যদানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে তিনি বিনামূল্যে পত্রিকা দিতেন। ১২৫৩ সালে তিনি "পাষণ্ডপীড়ন" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। "সংবাদভাস্কর" পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে উভয়ের বিবাদ হয় এবং তাঁহাদের দুই পত্রে কবির লড়াই আরম্ভ হয়। সেই লড়াই শেষে অত্যন্ত অশ্লীল ও কুৎসাপূর্ণ কবিতার লড়াইয়ে পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রই জয়ী হন। পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া গেলে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর রচনা প্রকাশিত হইত। অতি অল্প বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতার অনেক

গণ্যমান্য সভার সহিত সংশ্লিষ্ট হন, ও বহু বিখ্যাত ও ধনাঢ্য লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ হন। তিনি নববর্ষে তাঁহার ছাপাখানায় একটি সাহিত্য-সম্মিলন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের রচনা পাঠ করিতেন, তাঁহার ছাত্রেরাও তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতেন। যে-সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত তাঁহাদিগকে সভাস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরা পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বহু লুপ্তপ্রায় কবিতা ও কবিজীবনী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১২৬৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের দেহান্তর ঘটে। ঈশ্বরচন্দ্র সদালাপী, সুরসিক, হাস্যবদন ছিলেন। তিনি খুব সরল ছিলেন বলিয়া অনেককে বিশ্বাস করিয়া ঠকিতেন। তাঁহার বাটীর দ্বার অবারিত থাকিত, দানে তাঁহার কৃপণতা ছিল না। তিনি সুরা পান করিতেন এবং তাহা পুনঃপুনঃ নিজে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলার মধ্যযুগের শেষ কবি ও আধুনিক যুগের প্রথম কবি। তাই তাঁহাতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের আভাসও আছে। আবার যে কবিতা ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও পূর্ব্বাভাস তাঁহার কবিতার মধ্যে দেখা দিয়াছিল। তিনি মানব-মনের জটিল ভাব ব্যক্ত করিবার সাধনা করেন নাই, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বা অন্যবিধ কোনও সৃষ্টিও তিনি করিয়া যান নাই, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহার বর্ণনাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাই আনারস, পাঁঠা, পৌষপার্ব্বণ, বড়দিন প্রভৃতি তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় হইয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্তের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তা ও ব্যঙ্গকুশলতা। তাঁহার পূর্ব্বকালের কবিদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত অল্প অশ্লীলতা ও শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা দোষ তাঁহার কবিতায় আছে। তাঁহার প্রধান একটি গুণ তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য—এ বিষয়ে তিনি তাঁহার কালের অনেক অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আর একটি গুণ তাঁহার ধর্ম্মভাব।

তাঁহার নৈতিক ও পারমার্থিক কবিতা, সামাজিক ও ব্যঙ্গ কাবতা, ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া লিখিত কবিতা, ঋতুবর্ণন প্রভৃতি কবিতা সমস্তই নিজের অনুভব ও দেখা-শোনার বর্ণনামাত্র হইলেও, তিনিই প্রথম খণ্ড কবিতা লিখিয়া এদেশে নূতন ছাঁদের কবিতা লেখা প্রবর্ত্তন করেন এবং একমাত্র প্রেমের বিষয় ছাড়িয়া অন্য নানা বিষয়েও যে কবিতা লেখা যাইতে পারে, তাহার পথপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কাছে বঙ্গদেশ চিরঋণী হইয়া থাকিবে।

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; সুবল মিত্রের অভিধান; বঙ্গভাষার লেখক; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব ইত্যাদি]

উমা দেবী [১৯০৮—১৯৩১] –

ইঁহার পিতা প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন অতি ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, এবং উমার মাতা সুশীলা দেবী কবি ও সুলেখিকা ছিলেন। অতি অল্প বয়সে ইনি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের সহিত উমার বিবাহ হয়। বাল্যাবধি উমার কবিতা রচনা করিবার ঝোঁক ছিল। তাঁহার শেষে রচিত কবিতাগুলি বাতায়ন নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, বাংলা ১৩৩৭ সালে। বাতায়নে মাত্র ৪০টি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। এই কবিতাগুলিতে বাঙালীর সাধারণ জীবনের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। এই সহজ ও সরল রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

অতি অল্প বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অধিক দিন জীবিত থাকিলে ও তাঁহার প্রতিভা পরিণতি লাভ করিলে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন।

[বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

কবি কঙ্ক—

ইনি মলয়ার বারমাসী রচনা করেন এবং ইঁহার নিজের প্রণয়ব্যাপার লইয়া নয়নচাঁদ ঘোষ, দামোদর রঘুসুত ও শ্রীনাথ বানিয়া 'কঙ্ক ও লীলা' গাথা রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সেই গানের পালা এখনও ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে গীত হয়।

কঙ্ক ও লীলার প্রণয়কাহিনী এবং চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের প্রণয়কাহিনী আমাদের সংগ্রহের উদ্ধৃত কবিতাংশের টীকায় দেওয়া হইয়াছে।

[ময়মনসিংহ-গীতিকার ভূমিকা; আহুতি—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণ; ময়মনসিংহের পল্লীকবি কঙ্ক প্রবাসী ১৩৩৫।১মখণ্ড ৫২৩ পৃঃ; ভারতী —১৩৩৩ বৈশাখ; বঙ্গবাণী—১৩৩২-১৩৩৩]

কাবেল কামিনী (১৮৯৩ ?)—

পুরাতন যশোহর আর আধুনিক খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনের পার্শ্বস্থিত জাপুসা গ্রামে পোদ-জাতীয় কবেল বা কাবেল-বংশে একটি নিরক্ষর রমণী বহু গীত রচনা করিয়া ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। তাঁহার নাম কি ছিল, তাহা এখন লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, কেবল তিনি যে কাবেল-বংশীয়া ছিলেন, এই কথাটুকু মাত্র মনে করিয়া রাখিয়াছে, এইজন্য তাঁহার পরিচয় কাবেল কামিনী নামেই প্রচলিত আছে। ইনি সম্ভবতঃ ১৩০০ বাংলা সালের কাছাকাছি সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১২, ৭০ পৃষ্ঠা]

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)—

১৮৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে কামিনী সেন মহাশয়ার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন

স্বনামখ্যাত লেখক চণ্ডীচরণ সেন। বাল্যকাল হইতেই কামিনী অত্যন্ত কবিতাপ্রিয় ও ভাবুকতাপ্রবণ ছিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি প্রথম কবিতা রচনা করেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া সংস্কৃতভাষায় সম্মান লাভ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি বেথুন কলেজে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮৯ সালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইলে তিনি সারা বঙ্গে একজন প্রতিভাময়ী কবি বলিয়া সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত হইলেন। ইঁহার কবিতা পড়িয়া কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন অনেক প্রশংসা করিয়া ইঁহাকে উৎসাহিত করেন। ১৮৯৪ সালে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনী সেনের বিবাহ হয়, এবং সুপরিচিতা লেখিকা কামিনী সেন কামিনী রায় হইয়া কিছুদিন পাঠকদের নিকটে উভয় নামেই পরিচিত হইতেন। ১৩০৮ সালে তিনি বিধবা হন। ইহার পরে তিনি শোকে দুঃখে ও সংসারের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অনেকগুলি কাব্য ও নাটক রচনা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলির নাম এই—নির্ম্মাল্য, পৌরাণিকী, মাল্য ও নির্ম্মাল্য, অম্বা, অশোক-সঙ্গীত, ঠাকুমার চিঠি, সিতিমা, শ্রাদ্ধিকী, দীপ ও ধূপ এবং জীবন-পথে। বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে ইঁহার আসন অনেক উচ্চে।

[বঙ্গের মহিলা কবি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

কালী মির্জ্জা (১৭৫০ ?—)—

কালী মির্জ্জার প্রকৃত নাম যে কি ছিল, তাহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। তাঁহার নাম বোধ হয় কালিদাস ছিল। তাঁহার পদবী যে কি ছিল, তাহার সম্বন্ধেও দ্বিমত দেখা যায়। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সঙ্গীতসারসংগ্রহ পুস্তকে তাঁহাকে মুখোপাধ্যায় বলা হইয়াছে। কিন্তু সুবল

মিত্রের অভিধানে ও বঙ্গের কবিতা নামক পুস্তকে তাঁহাকে চট্টোপাধ্যায় বলা হইয়াছে। তিনি বোধ হয় চট্টোপাধ্যায়-বংশীয়ই ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিজয়রাম। আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। সঙ্গীতানুরাগের প্রেরণায় তিনি কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সঙ্গীতচর্চ্চার প্রধান প্রধান স্থানে বেড়াইয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বহু দিন পশ্চিমে বাস করার জন্য ইঁহার বেশভূষা হিন্দুস্থানী মুসলমানের ন্যায় হইয়াছিল। এতজন্য বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এ দেশের গুণজ্ঞ ধনিগণ তাঁহাকে মির্জ্জা উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি নিজে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, এবং কতকগুলি গান রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

[বঙ্গভাষার লেখক বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় ; বঙ্গের কবিতা অনাথকৃষ্ণ দেব ; সুবল মিত্রের অভিধান]

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (?—১৯৩৩)—

ইঁহার কবিতাপুস্তক "নতুন খাতা" কাব্য-রসিকের সমাদর লাভ করিয়াছে। এই কবির অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।

কৃত্তিবাস (জন্ম ১৩৯৯—?)—

পূর্ব্ববঙ্গে বেদানুজ নামে কোনও রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন নরসিংহ ওঝা। সাম্‌শ্‌ উদ্দীন ফিরোজ শা পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিয়া ১৩০২ হইতে ১৩২২ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। সেই মুসলমান বিজয়ের উপদ্রবের সময় নরসিংহ ওঝা নদীয়া জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র গর্ভেশ্বর ; গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র - মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ। মুরারি ওঝার সাত পুত্র—ভৈরব, সুশীল,

ভগবান, বনমালী ইত্যাদি। বনমালী ওঝার ছয় পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন ; পুত্রদের নাম—কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ, ভাস্কর। কৃত্তিবাস ওঝার মাতার নাম ছিল মালিনী। ইঁহারা ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশীয়। ইঁহাদের অনেকেই বিদ্যা-বুদ্ধি ও কবিত্বে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, কৃত্তিবাস পণ্ডিত তাঁহার আত্মপরিচয়ের ভিতর সগৌরবে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাস আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, তাঁহার জন্ম ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ রবিবার, ইংরেজী ১৩৯৯ সালের ১২ জানুয়ারী হইয়াছিল। ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়, এবং তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বড়গঙ্গার পারে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি গৌড়েশ্বর- (সম্ভবতঃ রাজা দনুজমর্দ্দন গণেশ) সম্ভাষণে যাত্রা করেন, এবং গৌড়েশ্বর তাঁহার কবিত্বশক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সভাকবি নিযুক্ত করেন এবং তিনি রাজাজ্ঞায় রামায়ণ রচনা করেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ধ্রুবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাবংশাবলী নামে কুলপরিচয়ের গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি কৃত্তিবাসের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাম্য-শান্তি-জনপ্রিয়ঃ। ধ্রুবানন্দের সময়ে কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধরের নামে এক মেল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া দীনেশ সেন মহাশয় মনে করেন যে, কৃত্তিবাস অপুত্রক অবস্থায় চৈতন্যদেবের ফুলিয়ায় আগমনের পূর্ব্বেই পরলোকে গমন করেন। সে যাহাই হউক, কৃত্তিবাস ১৫শ শতকের লোক ছিলেন, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাস ভারতের অমর কাব্য "রামায়ণ" বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া

অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রকৃত কবি ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন—

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥

রাজা গৌড়েশ্বর সন্তুষ্ট হইলে রাজসভাসদেরা তাঁহাকে মাল্যচন্দন দিয়া অর্চ্চনা করেন এবং পারিষদেরা কবিকে অনুরোধ করেন, রাজার যখন সন্তোষ হইয়াছে, তখন এই অবসরে তিনি কিছু অর্থ-বিত্ত পুরস্কার চাহিলেই পাইতে পারিবেন। ইহার উত্তরে কবি বলেন—

কারো কিছু নাহি লই, করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

তখন—
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য · বঙ্গভাষার লেখক,—বঙ্গবাসী; প্রবাসী ১৩৩২ কার্ত্তিক ২৮ পৃষ্ঠা; প্রবাসী ১৩২১; হিন্দুপত্রিকা; হিতবাদী ৩৩২; প্রবাসী ১৩৩৬।২। ৩৪৫ পৃঃ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩২০ ও ১৩৪০]

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮)—

নদীয়া জেলার ভাজনঘাটে ইঁহার জন্ম হয়—১৮১০ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১২১৭ সালের আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন। তাঁহার পিতার নাম মুরলীধর

গোস্বামী; তাঁহার দুই বিবাহ ছিল। কৃষ্ণকমল পিতার দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র। কৃষ্ণকমলের মাতার নাম যমুনা দেবী। কৃষ্ণকমলের পিতা পুত্রকে সাত বৎসর বয়সেই মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া যান এবং সেইখানেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে তিনি নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে পাঠ সমাপ্ত করেন। অর্থাভাবে তিনি অধিক অধ্যয়ন করিবার অবসর না পাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। ঢাকা শহরেই তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথকতা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার সুমধুর কথকতায় শীঘ্রই পূর্ব্ব-বঙ্গে রস-তরঙ্গ প্রবাহিত হইল, সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সুকণ্ঠের কথকতা শুনিয়া ভাবাবেগে বিহ্বল হইয়া উঠিত। নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে তিনি নিমাই-সন্ন্যাস পালা লইয়া এক নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন এবং সেই অভিনয়ে তিনি নিমাই সাজিয়া অভিনয়-দক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এখন ঢাকাতে আসিয়া এদেশের যাত্রার দলের অভিনয় দেখিয়া তাঁহার অভিনয়ের স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং তিনি "স্বপ্নবিলাস", "দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী", "বিচিত্রবিলাস", "ভরত-মিলন", "নন্দহরণ", "সুবল সংবাদ" প্রভৃতি পালা রচনা করিয়া যাত্রা করিতে আরম্ভ করেন। শীঘ্রই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে "বড় গোঁসাই" নামে পরিচিত ও অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বৈরাগীগণ বাড়ী বাড়ী কৃষ্ণকমলের রচিত গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৯৪ সালের ১২ই মাঘ ৭৭ বৎসর বয়সে চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহান্তর ঘটে। কৃষ্ণকমল ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করিতেন, মুখে সর্ব্বদাই রাধাকৃষ্ণের নাম লাগিয়া থাকিত। এজন্য তিনি যখন কথকতা বা অভিনয় করিতেন, তখন ভাবে তন্ময় হইয়া করিতেন, তাই তাঁহার ভাব দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। তাঁহার কাব্যগুলি কতক চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদের অনুকরণ, তাঁহার অভিনয়-প্রণালী কতকটা

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর ঢঙের, এবং রাধার কথা ও কর্ম্ম অনেক সময় চৈতন্যদেবের কথা ও কর্ম্মের প্রতিধ্বনির মতন বলিয়া সেগুলি অত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যগুলিতে নূতন কোনও ভাব নাই, অথবা অপূর্ব্ব কবিত্ব বিকাশও নাই, তথাপি পদাবলী সাহিত্যের কবিত্বের ও চৈতন্যদেবের ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া তাহা লোককে অমন করিয়া মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার কাব্যের লোকপ্রিয় হইবার আর-একটি কারণ হইতেছে ভাগবতের কবিত্ব বাংলায় প্রকাশ করা ও রাধিকাকে নিষ্কাম প্রেমে আত্মবিহ্বলা করিয়া বর্ণনা করা। ফল কথা, বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, গোবিন্দ অধিকারী, কবিওয়ালা, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতির অনুবর্ত্তন কৃষ্ণকমলের কাব্যে সুস্পষ্ট। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাত্রার পালা রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[বঙ্গভাষার লেখক—বঙ্গবাসী ; বঙ্গের কবিতা ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৮—১৯০৭)—

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৪৫ সালে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। পরে বয়স হইলে তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া সেই দুই সাহিত্যের ভাব লইয়া কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। হাফিজের ঈশ্বরপ্রেমের কবিতাগুলি ও সাদীর নীতিমূলক কবিতা কৃষ্ণচন্দ্রের মনে ঈশ্বরভক্তি ও নীতির প্রতি অনুরাগ জাগ্রত করিয়া দেয়। ইনি হাফিজের ভণিতা দিয়া ও সাদীর ভাব লইয়া বহু কবিতা রচনা করেন, এবং তাহা "সদ্ভাব-শতক" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হয়। ইনি যথাক্রমে 'ঢাকাপ্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী',

ও 'দ্বৈভাষিকী' নামে তিনখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করেন। তিনি যশোহর জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিত ছিলেন, এবং সেই কার্য্য হইতে অবসর লইয়া নিজের গ্রামে গিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেই গ্রামেই বাংলা ১৩১৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়; সুবল মিত্রের অভিধান]

গগন হরকরা (১৯ শতক)—

ইনি শিলাইদহ পোষ্ট-অফিসের চিঠি বিলি করিবার হরকরা বা পিয়ন ছিলেন এবং স্বরচিত গান গাহিতে গাহিতে ও ভাবোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার কয়েকটি গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি—

রাণাঘাটের নিকটস্থ গরিবপুরের জমিদার, এখনও জীবিত আছেন। তিনি একাগ্র সাধনায় সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, এবং নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শন প্রভৃতি নানা মাসিকপত্রে কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার 'পত্রপুষ্প' নামে একখানি কবিতা-পুস্তক আছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩—১৯১১)—

গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বাগবাজার পাড়ায় ১৮৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নীলমণি ঘোষ। গিরিশচন্দ্র তাঁহার জননীর অষ্টমগর্ভজাত। ইনি এণ্ট্রান্স্ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া স্কুল ছাড়িয়া দেন, কিন্তু বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে

প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বুক-কিপারের কাজ করিয়া অঙ্কবিদ্যায়ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। ১৮৬৭ সালে বাগবাজারে একটি সখের যাত্রার দল হয়, তাহাতে গিরিশ প্রথম গীত রচনা করিয়া নিজের কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রকাশ করেন। পরে তিনি সখের থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটকের অভিনয়ে নিমচাঁদ সাজিয়া ও লীলাবতী নাটকে ললিত সাজিয়া তাঁহার অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ করেন। পরে যখন গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন গিরিশচন্দ্র তাহাতে ১০০ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন, এবং থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য সেই সময় হইতে অবিরাম বহু নাটক রচনা করেন, এবং নাটকের মধ্যে বহু গান সন্নিবেশিত করেন। তাঁহার গান অল্প দিনের মধ্যেই সারা বঙ্গে হাটে ঘাটে মাঠে গীত হইতে লাগিল, গিরিশচন্দ্রের নাম ও যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি নাটক রচনা ও নাটক অভিনয়ে তুল্য দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এজন্য গিরিশচন্দ্র নাট্যাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রঙ্গরসিক বহু বিষয় লইয়া তিনি বহু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯১১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[বঙ্গভাষার লেখক ; সুবল মিত্রের অভিধান ; গিরিশ-প্রতিভা—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; বঙ্গবাণী ১৩৩২।৩৩ ; পঞ্চপুষ্প ১৩৩৬ ; ভারতী ১৩৩১ ইত্যাদি]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪)—

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ইংরেজী ১৮৫৮ সালে কলিকাতায় ভবানীপুরে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র। তাঁহাদের বাসস্থান ছিল কলিকাতার সন্নিহিত পানিহাটী গ্রাম।

বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি মজিলপুরের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১২।১৩ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম কবিতা লেখেন। গিরীন্দ্রমোহিনী কিশোর বয়সেই সংস্কৃত সাহিত্য ও জ্যোতিষ আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ইঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল। ১৮৬৮ সালে বহুবাজারের সম্ভ্রান্ত জমিদার অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। ইঁহার শ্বশুরালয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইত, এবং মেয়েদের শিক্ষার সুবিধা হইবে বলিয়া এই দত্তপরিবার বাড়ীতে সাবিত্রী লাইব্রেরী নামে এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই লাইব্রেরীতে নানা সময়ে বহু সাহিত্যিক একত্র হইয়া বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও অন্যবিধ সাহিত্যিক আলোচনা করিতেন, এবং তাহাতে অন্তঃপুরিকাদের কাল্‌চারের যথেষ্ট সুযোগ হইত। ১৫ বৎসর বয়সেই ইনি কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ বহু সাহিত্যিকের প্রশংসা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের সুপারিসে তাঁহার একটি কবিতা প্রথম ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়, এবং পরে ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত গিরীন্দ্রমোহিনীর সখিত্ব হয়। গিরীন্দ্রমোহিনী পরে কয়েক বৎসর 'জাহ্নবী' নামে এক মাসিক পত্রের সম্পাদন করেন। তিনি সূচীশিল্পে ও রন্ধনশিল্পে নিপুণা ছিলেন। পরিণত বয়সে চিত্রাঙ্কন করিতেও আরম্ভ করেন ও তাহাতেও দক্ষতা অর্জ্জন করেন। ইঁহার একখানি চিত্র কলিকাতা প্রদর্শনীতে দেখিয়া বড়লাট-মহিষী লেডী মিণ্টো উহা অষ্ট্রেলিয়ার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন, এবং মহারাণী আলেক্‌জান্ড্রা তাঁহাকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া অভিনন্দিত করেন। ১৮৮৪ সালে ইনি তিন পুত্র লইয়া বিধবা হন। ইঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে বাংলা দেশের ছবি, বাংলা দেশের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহার

পতিভক্তি, শুচিতার প্রতি শ্রদ্ধা অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইঁহার অশ্রুকণা, শিখা, অর্ঘ্য প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক প্রসিদ্ধ। বাংলা ১৩৩১ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

[সুবল মিত্রের অভিধান ; ভারতী ১৩৩১, আশ্বিন]

গোপাল উড়ে (১৯শ শতাব্দী)—

গোপাল উড়ের নির্দ্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার ইতিহাস সংশয়াচ্ছন্ন কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব-মধুর সরস গানগুলির জন্য তাঁহার নামটি মাত্র অমর হইয়া আছে। কেহ বলেন, গোপালের জন্ম হয় কটক জেলার যাজপুর গ্রামে। তিনি ১৮।১৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসেন। কেহ বলেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়া ফেরি করিয়া কলা বেচিতেন। এই সময়ে কলিকাতার বহুবাজারে রাধামোহন সরকার নামে এক ধনী ব্যক্তি একটি সখের যাত্রার দল গঠন করেন; একদিন তাঁহার যাত্রার পালার মহলা চলিতেছিল, এমন সময় পথ দিয়া গোপাল কলা ফেরি করিয়া যাইতেছিলেন। রাধামোহন-বাবু গোপালের হাঁকের মধ্যে মধুর স্বরের পরিচয় ধরিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের যাত্রার দলে ভর্ত্তি করিয়া লন। প্রথমে তাঁহার বেতন হয় দশ টাকা, কিন্তু অল্প দিনেই গোপাল সঙ্গীতে এমন দক্ষ হইয়া উঠিলেন যে, রাধামোহন-বাবু গোপালের বেতন পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিলেন। রাধামোহনের মৃত্যুর সময়ে গোপালই যাত্রার দলের সমস্ত আসবাব প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার পাইলেন এবং তিনি নিজেই এক যাত্রার দলের অধিকারী হইয়া যাত্রা করিতে লাগিলেন। আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে, গোপাল কলিকাতায় আসিয়া বীরনৃসিংহ মল্লিক নামক এক ধনী ব্যক্তির ভৃত্য নিযুক্ত হন। বীরনৃসিংহ-বাবু একটি যাত্রার দল করেন,

তাহাতে তিনি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, নানাদেশ হইতে সুরজ্ঞ ও ওস্তাদ আনাইয়া গানে সুর দেওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার পালা ছিল বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। বীরনৃসিংহ-বাবু পরে তাঁহার ভৃত্য গোপালকে সেই যাত্রা দান করেন এবং সেই অবধি তাহা "গোপাল উড়ের যাত্রার দল" নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। গোপাল নিজে কোনও লেখাপড়া জানিতেন না, তিনি নিজে কোনও গান রচনা করেন নাই। তাঁহার যাত্রার দলে গীত হইত বলিয়া গানগুলি "গোপাল উড়ের গান" বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে গানগুলি কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, ভৈরব হালদার প্রভৃতি রচনা করেন। গোপাল উড়ের টপ্পায় একদিন বঙ্গদেশ মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই যিনিই গীত-রচয়িতা হউন না কেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব এখন গোপাল উড়ের খ্যাতির অন্তরালে হারাইয়া গিয়াছে। গোপাল উড়ের অথবা গোপাল উড়ের নামে প্রচলিত ও পরিচিত গানগুলির অধিকাংশই একটু আদিরসাশ্রিত, কিন্তু তাহাতে আদিরসের ইঙ্গিত মাত্র আছে, কোথাও তাহা পরিব্যক্ত হইয়া অশ্লীল হয় নাই। কতকগুলি গান সেই দোষ হইতেও মুক্ত এবং অধিকাংশ গানেই কবিত্ব ও ভাবুকতা আছে। গোপাল উড়ের গানের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব, তাহাদের চমৎকার খাঁটী বাংলাভাষা, একেবারে বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষা, তাহার উপর সংস্কৃত অথবা ইংরেজীর প্রভাব পড়িয়া ভাষাকে জটিল করে নাই। এমন স্বচ্ছ ভাষায় সাহিত্য রচনা অল্প লোকেই করিতে পারিয়াছেন। গোপাল উড়ের গানের আর একটি বিশেষত্ব, তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছ হাস্যরস।

[বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব; সুবল মিত্রের অভিধান; গোপাল উড়ের টপ্পা—বঙ্গবাসী]

গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮ ?—১৮৭০ ?)—

হুগলী জেলায় জাঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগী কুলে গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম হয়। গোবিন্দ বাল্যকালে পাঠশালায় অতি সামান্যই কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বড বয়সে তাহা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহজ প্রতিভা ছিল বলিয়া তিনি কৃষ্ণযাত্রাওয়ালাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও পালা-রচয়িতা বলিয়া অমব হইয়া আছেন। তিনি বাল্যকালে তাঁহাদের জাত-ব্যবসায় কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। পবে তিনি কীর্ত্তন গাহিবার দল গঠন করেন ও তাহার পবে তিনি যাত্রাব দল করেন। তিনি পদাবলী গাহিতে পারিতেন বলিয়া তাহারই অনুকরণে অনুপ্রাসবহুল ভক্তিরসাত্মক গান রচনা করিয়া তাঁহাব কৃষ্ণযাত্রায় গাহিতে আরম্ভ কবেন, এবং তাহাতেই তাঁহার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। যাত্রা কবিয়া গোবিন্দ শেষে জমিদারী করিয়াছিলেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় কবিয়া গিয়াছিলেন। যাত্রার দলের অধিকাবী বলিয়া তিনি গোবিন্দ অধিকারী নামেই পবিচিত হইয়া আছেন। অনুমান, বাংলা ১২০৫ সালে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৭ সালে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন।

[বঙ্গভাষার লেখক—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় ; সুবল মিত্রের অভিধান ; বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—শিবরতন মিত্র]

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (১৬ শতক)—

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দদাস ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিতেন।

সুতরাং ইঁহার অনেক পদ হয় তো বা প্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা গোবিন্দদাস কবিরাজের সহিত মিলিয়া গিয়া থাকিবে। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহার কাব্য-রচনায় গুরু গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্রজবুলিতে ভাষার জড়তা ও অস্পষ্টতা আছে। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আবার দুজন ছিলেন, একজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় ব্রজবুলির সৃষ্টি হয় নাই। অতএব এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মুর্শিদাবাদ জেলার বোরাকুলী-গ্রামনিবাসী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য হইবেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য রূপ-সনাতন, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের সমসাময়িক। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫০৪ শকে ১৫৮২ খৃঃ চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিতেছিলেন। পথে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর সেই-সব গ্রন্থ লুণ্ঠন করেন, এবং অবশেষে শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বীর হাম্বীর ১৫৩৬-১৬২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এই সময়ের লোক নিঃসন্দেহ।

[পদকল্পতরুর ভূমিকা ; সাহিত্যপরিষদ্ সংস্করণ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২৬২ পৃষ্ঠা ; ভক্তিরত্নাকর]

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫—১৯১৮)—

গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে বাংলা ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জীবন দারুণ দারিদ্র্য ও অত্যাচার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অতিবাহিত হয়। স্ত্রীবিয়োগ প্রভৃতি পারিবারিক দুর্ঘটনাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। নব্যভারত-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এই কবির পরিচয় পাইয়া

তাঁহাকে অনেক প্রকারে সাহায্য করেন। ইনি অধিক লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। অধিক দিন শহরেও বাস কবিবার সুযোগ পান নাই। সেইজন্য তাঁহার কবিতার মধ্যে গ্রাম্য সরলতা ও গ্রাম্যতাদোষ দুইই দেখা যায়। তিনি গ্রামের প্রকৃতির বর্ণনায় সুন্দর পটুতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁহাব তিরস্কার ও উৎসাহ-বাক্য পাঠ করিয়া বহু বাঙালীব মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইঁহার রচনার মধ্যে একটা নির্ভীক আত্মপ্রকাশ ছিল। তিনি যাহা ভাবিতেন, তাহা লিখিতে দ্বিধা কবিতেন না। মগের মুলুক, প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন, ফুলরেণু, বৈজয়ন্তী প্রভৃতি কবিতার বই প্রকাশ করিয়া তিনি যশ অর্জ্জন করেন।

[বাসন্তিকা ১৩৩৬]

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৯ শতক)—

বরিশাল জেলাব মীরপুর গ্রামে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বংশে গোবিন্দ-চন্দ্রেব জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গৌরসুন্দব রায়। ইঁহাদের বাসভূমি ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের জপ্‌সা গ্রাম। গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যা-শিক্ষায় অধিক অগ্রসব হইতে পারেন নাই। যৌবনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কাজ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তিনি নানাস্থানে অত্যন্ত ক্লেশে দিনযাপন করিয়া শেষে কাশীতে যান। সেখানে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের নিকট হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া আগ্রায় ডাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। আগ্রাতে অবস্থান-কালেই তিনি

যমুনা-লহরী, জাতীয় সঙ্গীত এবং গীতি-কবিতা রচনা করেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ কবি বলিয়া যশ অর্জ্জন করেন। 'কতকাল পরে বলো ভারত রে দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?' প্রসিদ্ধ কবিতাটি ইঁহারই রচনা। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল।

[সুবল মিত্রের অভিধান; বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—শিবরতন মিত্র; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন]

গোবিন্দদাস (১৬ শতক)—

গোবিন্দদাস কর্ম্মকার বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর-নিবাসী শ্যামদাস কর্ম্মকারের পুত্র। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে মূর্খ, নির্গুণ প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে তিরস্কার করিলে তিনি বিরাগী হইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং চৈতন্যদেবের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়া মহাপ্রভুর তীর্থপর্য্যটনের সহচর হন। তিনি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস তাঁহার কড়চায় বা দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ এই কড়চাকে জাল ও গোবিন্দদাস নাম কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। সে যাহাই হোক, গোবিন্দদাস নামে যে ব্যক্তি এই কড়চা রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত আধুনিক কি না এবং ইহার ঐতিহাসিকতা সত্য কি না, তাহার সহিত আমাদের আপাতত সম্পর্ক নাই। তাহাতে যে কবিত্ব ও সুন্দর চরিত্র ও প্রকৃতি-দৃশ্যের বর্ণনা আছে, তাহা আমাদের নিকট সমাদর লাভের উপযুক্ত।

[গোবিন্দদাসের কড়চা—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; প্রবাসী ১৩৩২।১। ৪৭১ পৃষ্ঠা; সাহিত্য ১৩০৮; পঞ্চপুষ্প ১৩৩৬ ভাদ্র ৬৮৮ পৃঃ]

গোবিন্দদাস (১৫৩৭ ?—১৬১২ ?)—

গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কবিরাজ বিদ্যাপতির অনুকরণকারীদিগের অগ্রণী এবং ব্রজবুলি সৃষ্টির পথপ্রদর্শক এবং চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইহার জীবনী সম্বন্ধে অধিক কিছু নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। ইনি চৈতন্য সহচর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি দামোদরের দৌহিত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল সুনন্দা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম রামচন্দ্র; রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভাবে শাক্ত-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হন এবং পরে গোবিন্দদাসও শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পৈতৃক বাসস্থান কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী কুমারনগরের শাক্ত গ্রামবাসীদের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া পদ্মাপারে তেলিয়া-বুধরী গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার জন্ম সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৬১২ অব্দে হয়। তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। তিনি পদাবলী ব্যতীত সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' নামক নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। ইঁহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কবি ছিলেন। রামচন্দ্রের পদাবলী পদকল্পতরুতে সংগৃহীত আছে। গোবিন্দদাসের উপাধি কবিরাজ ছিল; তাহা তিনি বৈদ্যবংশীয় চিকিৎসক বলিয়া নহে, শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার কবিত্ব দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ উপাধি দিয়া ভূষিত করেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির বহু পদ সম্পূর্ণ করিয়া বা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে নিজের ভণিতা সংযোজিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রায় ৫৫০ পদ এখনও পাওয়া যায়।

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পদকল্পতরু ৫ম ভাগ, সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণ; বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসী; প্রবাসী ১৩৩৬।২য় ভাগ; ভারতী ১৩১১ পৌষ, ৯০৬ পৃঃ]

ঘনরাম (১৬৬৯ ?—১৭···?)—

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "কইয়ব পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে" বর্দ্ধমান জেলায়। তাঁহার মাতুলালয় বায়না গ্রামে। তাঁহার জন্মের তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি তাঁহার বংশপরিচয় ও পুস্তক সমাপ্তির তারিখ স্বীয় গ্রন্থ-মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পৌষন্মান গোত্রীয় পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়ের পুত্র শঙ্কর ও গৌরীকান্ত, গৌরীকান্তের পুত্র ঘনরাম; ঘনরামের চার পুত্র, রাম-গোপাল রামগোবিন্দ রামরাম ও রামকৃষ্ণ। ঘনরামের মাতার নাম সীতা দেবী; তাঁহার মাতামহের নাম গঙ্গাহরি, তিনি কুশধ্বজ রাজবংশীয় কৌকুসারী গোত্রীয় ছিলেন। ঘনরামের জন্ম বোধ হয় ১৬৭৯ বা ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। তিনি বাল্যে অতি দুর্দ্দান্ত ছিলেন, যৌবনে মল্লক্রীড়ায় ও অশ্বপরিচালনায় পটু ছিলেন। গৌরীকান্ত দুর্দ্দান্ত পুত্রকে বাল্যেই রামবাটী বা রামপুরের ভট্টাচার্য্যদের টোলে প্রেরণ করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ঘনরাম কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন, এবং তাঁহার গুরু তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি দিয়া পুরস্কৃত করেন। পাঠসমাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার বাসগ্রামেই বিবাহ হয়, ও অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি অর্থ উপার্জ্জনের জন্য চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ঘনরামের কবিখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। রাজাদেশে ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই পুস্তক রচনার কাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ

আছে। ঘনরাম প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে যে হেঁয়ালিতে পুস্তক-প্রণয়ন-কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অর্থ লইয়াই মতভেদের সৃষ্টি।

সঙ্গীত-আরম্ভ-কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যেকালে হইল সমাপন॥
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব-বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥

ইহা হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পাইয়াছেন ১৭১৩ শক, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৬৩৩ শক, বঙ্গভাষার লেখক ১৬৩১ শক, যোগেশচন্দ্র রায় ১৬৩৩। আমাদেরও মনে হয়, ১৬৩৩ শকের বা ১৭১১ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের ৪ঠা তারিখে শুক্রবারে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পুঁথি লেখা সমাপ্ত হয়। ঘনরামের মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তিনি রাম-উপাসক ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালা রচনা করেন। ধর্ম্মমঙ্গল বৃহৎ মহাকাব্য, ২৪ সর্গে সমাপ্ত। ঘনরামের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে ইহাতে তৎকালীন বঙ্গনারীর বীরত্ব ও সাহসের পরিচায়ক বহু আখ্যায়িকার সমাবেশ।

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৮৭ পৃঃ ; বঙ্গভাষার লেখক ; ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য]

চণ্ডীদাস (১৪০০ ?)—

বাংলার আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস। কিন্তু চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবির পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত

হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস কাহারও প্রকৃত নাম, না, চণ্ডী-সেবকদের উপাধি মাত্র। সে যাহাই হউক, চণ্ডীদাস নামে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর সৎকবি ছিলেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলী-রচয়িতা দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি, না তিন ব্যক্তি, তাহা লইয়াও বিশেষ তর্ক ও মতদ্বৈধ আছে। আমার মনে হয়, ইঁহারা তিন পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনও একজন শক্তিশালী কবির পরিণত বয়সের পরিপক্ক ও নিপুণ হস্তেরই রচনা বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ যে একমাত্র পুঁথি অবলম্বনে ছাপা হইয়াছে, তাহার লেখা দেখিয়া তাহা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পদাবলী-রচয়িতা কবীন্দ্র চণ্ডীদাসের কোনও পাণ্ডুলিপি প্রাচীন হস্তাক্ষরে পাওয়া যায় নাই। এই পদাবলীর অত্যধিক সমাদরের জন্য তাহা কালে কালে ক্রমাগত লিখিত ও নকল হইতে হইতে তাহার আদিম রূপ হারাইয়া অনেক পরিমাণে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহাই হউক, তাহাদের মধ্যে যে কবিত্বের প্রাণশক্তি নিহিত আছে, তাহা দেখিয়া বলা যায় যে, ঐ দুই কাব্য এক ব্যক্তির রচনা নহে। তবে কে পূর্ব্ববর্ত্তী ও কে পরবর্ত্তী, তাহা স্থির করা দুরূহ। চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও বিদ্যাপতির সমসাময়িক। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিতে ভালোবাসিতেন। চৈতন্যদেব ১৪৩১ শকে, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি ১৪০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদে সহজিয়া ভাবের ও অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের অসাধারণ কবিত্ব

চিরকাল লোকের প্রীতি ও প্রশংসা লাভ করিয়া আসিতেছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে এই সংক্ষেপ বিবরণে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে তাঁহার সহিত রামী রজকিনীর প্রণয়-ব্যাপারই প্রধান। তাহা রামীর পরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"চণ্ডীদাস সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি। এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।······বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন।···তাঁহার প্রেম 'কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা'। তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও 'বিষামৃতে একত্র করিয়া'। চণ্ডীদাসেব কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ কবিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সুখ, সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।···বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। কঠোর ব্রতসাধনারূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব। তিনি প্রেম ও উপভোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন—

'কামগন্ধ নাহি তায়'।"

[চণ্ডীদাস—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব : বৈষ্ণব সাহিত্য—সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসী; পদকল্পতরু ৫ম ভাগ—সাহিত্য-পরিষৎ; চণ্ডীদাস—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৬; চণ্ডীদাস—দীনেশচন্দ্র সেন—ভারতী ১৩১১, চৈত্র; চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী—বঙ্গবাণী ১৩৩৪ কার্ত্তিক; প্রবাসী ১৩৩৩।৩৪।৩৬; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৩, প্রতিভা ১৩৩২ কার্ত্তিক-পৌষ; ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি ১৯২৯; বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী; সমালোচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি]

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০—১৯২৫)—

ইঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ। ইঁহাদের আদি নিবাস ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে, পরে কলিকাতা। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য। চিত্তরঞ্জন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও উদারহৃদয়, মুক্তহস্ত দাতা ছিলেন। ইঁহার পিতা ইন্‌সল্‌ভেন্‌সি লইয়াছিলেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জন সেই পিতৃঋণ সমস্তই পরিশোধ করিয়া নিজের ন্যায়নিষ্ঠা ও পিতৃভক্তির পরিচয় দেন। ইনি 'মালঞ্চ' ও 'সাগর-সঙ্গীত' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন; 'নারায়ণ' মাসিকপত্র পরিচালন করেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়া ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া নিজেকে দেশ-সেবায় উৎসর্গ করেন এবং তাহার ফলে ইনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইনি দেশহিত-ব্রত গ্রহণ করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব দান করেন এবং দেশবাসী তাঁহাকে মহিমান্বিত 'দেশবন্ধু' নাম দিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ১৯২৫ সালে দার্জ্জিলিঙ্গে ইঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু শব

কলিকাতায় আনিয়া সৎকার করা হয়। সহস্র সহস্র নরনারী শ্রদ্ধা-শোকপূর্ণ হৃদয়ে সেই শবানুগমন করিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫)—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র। ১৮৪৮ সালে জন্ম। তিনি গীতবিদ্যাবিশারদ ও অত্যন্ত স্বদেশভক্ত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের বীরদিগের কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি অশ্রুমতী নাটক, পুরুবিক্রম নাটক ও সরোজিনী নাটক রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি বহু সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। অলীক বাবু প্রভৃতি প্রহসন লিখিয়াও তিনি যশ অর্জন করেন। তিনি চিত্র ও চরিত্রানুমান-বিদ্যার চর্চাও কিছু দিন করিয়াছিলেন। তিনি সমাজসংস্কারেরও অনেক চেষ্টা করেন, এবং স্বদেশী শিল্পবাণিজ্য প্রচলনের জন্যও অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেন। তিনি অতি অমায়িক স্বভাবের মনস্বী লোক ছিলেন। ১৯২৫ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম যৌবনেই তিনি বিপত্নীক হন, এবং চিরজীবন তিনি পবিত্রভাবে সাহিত্য সেবা করিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন।

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; জীবন-স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সুবল মিত্রের অভিধান ইত্যাদি]

জ্ঞানদাস (জন্ম ১৫৩০—মৃত্যু ?)—

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সিউড়ির ও কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। গোবিন্দদাস যেমন বিদ্যাপতির অনুকারীদিগের মধ্যে প্রধান, জ্ঞানদাসও তেমনি চণ্ডীদাসের অনুকারী-

দিগের মধ্যে প্রধান। তাঁহার ব্রজবুলির পদে পাণ্ডিত্যের ও রচনা-পারিপাট্যের পরিচয় থাকিলেও তাঁহার বাংলা পদগুলিই অতিশয় প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; বঙ্গভাষার লেখক—বঙ্গবাসী ; পদকল্পতরু ৫ম ভাগ—সাহিত্যপরিষৎ ইত্যাদি]

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪০—১৯১৬ খৃঃ)—

ইনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ভক্ত সাধু ছিলেন। ইনি চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামে কবিতা রচনা করিতেন। শিশুদের নীতিশিক্ষার জন্য রচিত "বাল্যসখা" পুস্তক এককালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭)—

বাংলা ১২১২ সালের মাঘ মাসে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বাঁদমুড়া গ্রামে দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ। দাশরথি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হন। মাতুলের সাহায্যে সাঁকাই নামক স্থানের নীলকুঠীতে তিনি কেরানী নিযুক্ত হন। কিন্তু অকাবাই নাম্নী ইতরজাতীয়া এক রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি সেই চাকরী ত্যাগ করেন। অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল গঠন করে, দাশরথি সেই দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি মাতা ও মাতুলের ভর্ৎসনায় অকাবাইয়ের দল ছাড়িয়া নিজেই এক পাঁচালীর দল গঠন করেন। তিনি অনুপ্রাসবহুল সরস কবিতা রচনা করিয়া শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শব্দ-চাতুর্য্য ছিল অসাধারণ, এবং রসিকতা-মিশ্রিত ব্যঙ্গ-বচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি উপমার মালা গাঁথিয়া শ্রোতাদের তাক লাগাইয়া

দিতেন। অনুপ্রাসবহুল শব্দের বাঁধুনি ও বিদ্রূপ করিবার নিপুণতা তাঁহার কবিতায় থাকিলেও বিষয় ও চরিত্র বর্ণনার কৌশল তাহাতে বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁহার লেখনী ছিল ক্ষিপ্র ও অবিশ্রান্ত। তিনি মোটের উপর ৬০টিরও অধিক পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনায় অনেক স্থলেই অশ্লীলতা ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইঙ্গিতে দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সে কালে আদিরসাত্মক রসিকতা করাই ছিল রীতি; এবং কবি, পাঁচালী প্রভৃতির শ্রোতা ইতর-ভদ্র মিলিয়া হইত, এবং সাধারণ লোকের রুচি সেকালে তেমন মার্জ্জিত ও উন্নত ছিল না। দাশু রায় ছড়া ছাড়া অনেক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণবসঙ্গীতগুলির মধ্যে অনেক-গুলিতে কবিত্ব, আন্তরিকতা, ভাবমাধুর্য্য ও আবেগ আছে। এই সব কারণে এককালে দাশুরায়ের ছড়া ও পাঁচালী লোকে অত্যন্ত আগ্রহ ও সমাদর করিয়া শ্রবণ করিত। দাশুরায় এক সময়ে দিগ্‌বিজয়ী কবি ছিলেন। বাংলা ১২৬৮ সালে শ্যামাপূজার পূর্ব্ব দিবস চতুর্দ্দশী তিথিতে দাশরথি রায়ের মৃত্যু হয়।

[দাশরথি রায়ের পাঁচালী—বঙ্গবাসী; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; সুবল মিত্রের অভিধান; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব; বঙ্গভাষার লেখক]

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—১৮৭৩)—

দীনবন্ধু মিত্র নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি পোষ্ট-অফিসের কাজে প্রবেশ করেন। ১৮৫৫ সালে তিনি পাটনার পোষ্ট-মাষ্টার নিযুক্ত হন। পরে ইন্‌স্‌পেক্টার

হন। এই কার্য্যে তাঁহাকে বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু লোকের সহিত মিশিতে হয়। দীনবন্ধুর স্বাভাবিক সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি থাকাতে তিনি সেই-সব অভিজ্ঞতা লইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। বহুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক', 'কমলে কামিনী', 'দ্বাদশ কবিতা', 'সুরধুনী কাব্য' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়া দীনবন্ধু বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত ও বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী ও অমর হইয়া রহিয়াছেন। দীনবন্ধু সুরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার রসিকতায় তাঁহার রচনা সুমধুর, মনোহারী হইয়াছে। ১৮৭৩ সালে দীনবন্ধু পরলোক যাত্রা করেন।

[বঙ্গভাষার লেখক, সুবল মিত্রের অভিধান; দীনবন্ধু—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; দীনবন্ধু মিত্র—সুশীলকুমার দে, বঙ্গদর্শন ১৩১১; সাহিত্য ১৩১০; প্রদীপ ১৩০৪-১৩০৫; ভারতবর্ষ ১৩২৬ ভাদ্র, ৩৭১ পৃষ্ঠা; প্রবাসী ১৩২২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫—১৯২০)—

দেবেন্দ্রনাথ সেন খুব সম্ভবতঃ ১৮৫৫ সালে হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ওকালতী করিবার জন্য অনেক দিন গাজীপুরে ও এলাহাবাদে ছিলেন। যখন এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, তখন তিনি প্রবাসীতে বহু কবিতা ও 'প্রয়াগ-ধামে কমলাকান্ত' নাম দিয়া রঙ্গরচনা লিখিয়া অতি সত্বর সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া উঠেন। পরে তিনি 'সাহিত্য' মাসিক-পত্রেও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন ও সাহিত্যের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যত্নে 'অশোকগুচ্ছ' নাম দিয়া তাঁহার কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ

করেন। পরে তাঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তিনি ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নাম দিয়া একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। এই স্কুলে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অসাম্প্রদায়িক ভাবে ঈশ্বর বন্দনা করিয়া তবে ছাত্র ও শিক্ষকগণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত। এই সময়ে কবি অত্যন্ত অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, এবং চক্ষু ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বিপদ যত ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, কবির ভগবানে নির্ভর ও ভক্তি তত বাড়িতেছিল। 'বিপদের প্রতি' নামে ইঁহার কয়েকটি কবিতা তাঁহার সেই সময়কার মনের অবস্থার সাক্ষী হইয়া আছে। কবি সাংসারিক ও দৈহিক কষ্ট পাইলেও সেই সময়ে বহু সাহিত্যিকের অকপট শ্রদ্ধা ও যত্ন লাভ করিয়াছিলেন এবং পরম ভক্ত কবি তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার সমস্ত কবিতাবলী অনেকগুলি পুস্তকের মধ্যে ছাপাইয়া বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিদের উপহার বিতরণ করেন। ১৯২০ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু হয়। ইনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন। তিনি যখন ভাবে তন্ময় হইয়া নিজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তখন দেবী সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধকের ছবি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন আর কোনও কবি এমন মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী কবিতা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইঁহার একটি নিজস্ব ভঙ্গী ও বিশেষত্ব ছিল।

[উত্তরা ১৩৩৩—৩৪]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৩৯—১৯২৬)—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৩৯

খৃষ্টাব্দে কালকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্য, দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিত্বস্ফূর্ত্তি হয়। তিনি 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামক রূপক কাব্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। পরে তিনি বহু রঙ্গ কবিতাও রচনা করিয়াছেন। সেগুলি এখন কাব্যমালা নামক পুস্তকে একত্র করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধমালাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার রেখাক্ষর বর্ণমালা ছাপা হইয়াছে এবং এখনও বহু খণ্ড কবিতা ও রঙ্গরচনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বৃক্ষ যেমন অনায়াসে পুষ্পপল্লব ধারণ করে ও অনায়াসেই তাহা আবার ঝরাইয়া ফেলে, তেমনি বড়দাদা অতি অনায়াসে সুললিত ও রসমধুর কবিতা রচনা করিতেন, এবং আমাদের সকলকে পড়িয়া শুনাইতেন; এবং হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে অনায়াসেই সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছেঁড়া কাগজ বাতাসে উড়াইয়া দিতেন।

১৯২৬ সালে ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অতি সাত্ত্বিক প্রাকৃতির সদানন্দ জ্ঞানতপস্বী লোক ছিলেন। তাঁহার বিশ্বমৈত্রী ও স্বদেশপ্রেম প্রবল ছিল।

[প্রবাসী ১৩২২; প্রবাসী ১৩৩০।২।৭৭৮, ১৩৩০।২।২১৪; ১৩৩১।১।২০৪, ১৩৩১।২।'৮৫, ১৩৩২।২।৭৭৬; শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, Viswa-Bharati Quarterly]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)—

ইনি ইংরেজী সংক্ষিপ্ত ডি. এল. রায় নামেই সমধিক পরিচিত। ইঁহার পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৯১ সালে এম-এ পাশ করার পর ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাইয়া

বিলাতে যান ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইঁহার হাস্যরসিক কবিতা ও হাসির গান, বহু নাটক বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কবিতায় বিস্ময়কর মিল করিবার ও বলিষ্ঠ ছন্দ রচনায় ইঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। ইনি ইংরেজীতেও কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। ইঁহার স্বদেশ সম্বন্ধীয় কতকগুলি গান বহুজন-সমাদৃত হইয়া আছে। ১৯১৩ খৃঃ ১৭ই মে ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ ইঁহার মৃত্যু হয়।

[কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—দেবকুমার রায়; সুবলমিত্রের অভিধান ইত্যাদি]

নয়নচাঁদ ঘোষ—ময়মনসিংহ-গীতিকার একজন রচয়িতা।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬—১৯০৯)—

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৫৩ সালের মাঘ মাসে চট্টগ্রাম জেলায় নবীনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপীমোহন সেন, তিনি মুন্সেফ ছিলেন। নবীনচন্দ্র বাল্যাবধি অত্যন্ত অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। ১৮৬৮ সালে ইনি বি-এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইঁহার বহু কবিতা নানা পত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলা ১২৭৮ সালে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খণ্ড কবিতাগুলি 'অবকাশরঞ্জিনী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১২৮২ সালে 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্য-পুস্তক প্রকাশিত হইলে তিনি কবিযশ লাভ করেন ও বহুবিখ্যাত হইয়া পড়েন। এই পুস্তকে তিনি স্বদেশ-প্রেম ও আবেগময় কাব্য রচনার পরিচয় দিয়াছেন। অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', রচনা করিয়া এক নব মহাভারতের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করেন। পরে 'অমিতাভ' ও

'খৃষ্ট' কাব্য রচনা করিয়া ঐ দুই মহাপুরুষের প্রতি তাঁহার ভক্তি প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি গীতা ও চণ্ডীর পদ্য অনুবাদ করেন, 'ভানুমতী' নামে একখানি গদ্য-পদ্যময় উপন্যাস রচনা করেন, এবং 'প্রবাসের পত্র' 'আমার জীবন' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কবি তাঁহার চট্টগ্রামের বাড়ীতেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এককালে কবিবর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নাম একত্র অতীব সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইত। ইনি কাব্যযশে মণ্ডিত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

[বঙ্গভাষার লেখক, সুবল মিত্রের অভিধান; আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বসুমতী ১৩৩৩ বৈশাখ; বসুমতী ১৩৩৫ শ্রাবণ; প্রতিভা ১৩১৮; প্রবাসী ১৩১৫, ১৩১৬, সুবর্ণবণিক-সমাচার—১৩৩১, ১৩৩২]

নরসিংহ দাস (১৫ শতক)—

নরসিংহ দাস, নরসিংহ দেব, নৃসিংহ দেব নামের বিভিন্ন ভণিতায় অল্প কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এই তিন নাম একই ব্যক্তির কি না, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত ভক্তিরত্নাকর নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে—

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি সেহো।
যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহ॥

নিত্যানন্দ দাস বা বলরাম দাস তাঁহার প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়।

নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। অতএব নরসিংহ দাসও সেই সময়ের লোক ছিলেন।

[পদকল্পতরু ৫ম ভাগ ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]

নিত্যানন্দ দাস বা নিতাই দাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ)—

ইনি প্রেমবিলাস-রচয়িতা, ইঁহার অপর নাম বলরাম দাস। ইনি বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের কবিরাজ-বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি। বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস ও মাতার নাম সৌদামিনী। আত্মারাম দাসেরও কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। ইনি সঙ্গীতকারক বলিয়া অন্য কবিদের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। ১৪৫৯ শকে ইঁহার জন্ম হয়।

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; পদকল্পতরু ৫ম ভাগ, সাহিত-পরিষৎ-সংস্করণ]

নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১—১৮২১)—

নিত্যানন্দ বৈরাগী বা নিতাই দাস ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার গান-বাজনায় বিলক্ষণ অনুরাগ হয়। পরে ইনি কবির দল করেন। ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভবানী বেনে। ইঁহাদের কবির লড়াই দেখিতে দু-তিন দিনের পথ হইতে লোক আসিত। ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা ইঁহার গান শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার অধিকাংশ গানই পুরুষের উক্তি। ইঁহার গীত সম্বন্ধে বঙ্কিম-বাবুর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—"রামবসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক-একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।"

[সুবল মিত্রের অভিধান; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব; বঙ্গভাষার লেখক—বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়; History of Bengali Literature in the 19th century—Dr. S. K. De.)

নৃসিংহ—রাসুর ভাই, কবিওয়ালা। রাসু দ্রষ্টব্য।

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭২—)—

১৮৭২ সালে শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকুমার বাগচী এবং তাঁহার মাতার নাম শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী। শ্রীমতী প্রসন্নময়ী বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কবি ও সুলেখিকা বলিয়া সুপরিচিতা। প্রসন্নময়ী বঙ্গের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশের কন্যা ও প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার-জজ স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও সুবিখ্যাত লেখক বীরবল প্রমথনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। প্রিয়ম্বদা দেবী ১৮৯২ সালে বি-এ পরীক্ষায় পাশ করেন ও সংস্কৃতভাষায় বিশেষ জ্ঞানের জন্য রৌপ্য পদক পুরস্কার লাভ করেন। এই বৎসরই তাঁহার তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ১৮৯৪ সালে তিনি একটি পুত্র লাভ করেন, কিন্তু পর বৎসরই তিনি বিধবা হন। এই মর্ম্মান্তিক শোকের আবেগে তাঁহার কবিতা রচনা আরম্ভ হয়, এবং সেই সময়কার কবিতাগুলি তাঁহার 'রেণু' নামক কবিতাপুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার পুত্রটিরও অল্প দিন পরে মৃত্যু হয়। এই দুই শোকের ছায়া তাঁহার কবিতাগুলিকে করুণ ও মধুর করিয়াছে। ইঁহার কবিতার মধ্যে একটি শান্ত-স্নিগ্ধতা আছে। 'রেণু' ছাড়া ইঁহার আরও অনেক বই আছে, তাহাদের মধ্যে 'পত্রলেখা' ও 'অংশু' দুখানি কবিতাপুস্তক; 'অনাথ' 'পঞ্চুলাল' 'কথা-উপকথা' শিশুপাঠ্য উপন্যাস ও গল্প, 'ভক্তবাণী' সাধুমহাত্মার বাণীসংগ্রহ। ইনি বেতন না লইয়া অনেক স্ত্রী-হিতকর অনুষ্ঠানে

পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

প্রেমদাস (১৭ শতকের মধ্য ভাগ)—

প্রেমদাসের আদি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, পদবী ছিল সিদ্ধান্ত-বাগীশ। নবদ্বীপের গোকুলনগর বা কুলিয়া গ্রামে কাশ্যপ গোত্রে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। প্রেমদাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। অতএব প্রেমদাসকে ১৭শ শতকের মধ্যকালের লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইনি ১৬ বৎসর বয়সে বৈরাগী হইয়া প্রেমদাস নাম গ্রহণ করেন। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দ জীউর মন্দিরে ভোগ রন্ধনের পাচক নিযুক্ত হন। ইনি ১৬৩৪ শকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের স্বাধীন পদ্যানুবাদ করেন। ১৬৩৮ শকে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৌলিক কাব্য বংশীশিক্ষা রচিত হয়। পদাবলী রচনাতেই তিনি অধিক কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রেমদাস পণ্ডিত ও কবি উভয়ই ছিলেন। প্রেমদাস তাঁহার বংশী-শিক্ষায় আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

গোরা যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধপ্রপিতামহ শ্রীগোকুলনগরে সেহ
গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥
কশ্যপ মুনির বংশ বিপ্রকুল-অবতংস,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান॥

তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিন ভ্রাতা কৃষ্ণ পাইলা,
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মনিষ্ঠ ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি নাম দিলা বিজ্ঞাবলী,
কৃষ্ণদাস্য মোর অভিলাষ ॥

[পদকল্পতরু ৫ম ভাগ, অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী সতীশচন্দ্র রায়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩১৮ পৃষ্ঠা]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র। বঙ্কিমেরা চারি সহোদর ছিলেন,—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে নবজীবন ও বিবিধ অলঙ্কার দান করিয়া দেশে বিদেশে সম্মানিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক দিনে বর্ণপরিচয় করেন, এবং স্কুলে প্রতি বৎসরে দুই-দুই ক্লাস উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যেক পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, এবং ৮।৯ বৎসর পরে সেই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তিনি সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং ১৮৫৮ সালে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা পাস করেন। ইহার পরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। সেই কবিতাগুলি পরে 'কবিতা-পুস্তক' নামে একত্র প্রকাশিত হয়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া 'ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড্' নামক ইংরেজী পত্রে 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ্' নামে এক উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে ১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইলে তাঁহার যশোগৌরব বঙ্গদেশ পূর্ণ করিয়া তুলে। ইহার পরে ক্রমাগত নূতন নূতন উপন্যাস ও বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সমস্ত দেশকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিতে থাকেন। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ—কপালকুণ্ডলা ১৮৬৭, মৃণালিনী ১৮৬৯, বঙ্গদর্শন মাসিক পত্র ১৮৭২। এই বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়—বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা ১৮৭২, চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয় ১৮৭৩, রজনী ১৮৭৪, কমলাকান্তের দপ্তর ১৮৭৩—১৮৭৫, কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৭, রাজসিংহ ১৮৭৮, আনন্দমঠ ১৮৮২, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ১৮৮০, দেবী-চৌধুরাণী ১৮৮১। বঙ্গদর্শনে বহু বিষয়ে যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'লোক-রহস্য', 'বিজ্ঞান-রহস্য', 'বিবিধ সমালোচন' প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার পরে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রে কৃষ্ণচরিত্র ১৮৮৬, ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮৮৭, সীতারাম ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে উত্তম উপন্যাস লেখার পথপ্রদর্শক; তিনিই প্রথম মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা, রসরচনা প্রভৃতি লেখার সূত্রপাত করিয়া দেন। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন যে, "যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাংলা দেশে অচল।" বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের মধ্যেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ

গান "বন্দে মাতরম্" লিখিত হয়। তিনি অন্য অনেক গান রচনা করিয়া তাঁহার গীতরচনা-শক্তিরও অসাধারণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়া গভর্মেণ্টের নিকট হইতে রায় বাহাদুর এবং সি-আই-ই খেতাব লাভ করিয়া সুখ্যাতির সহিত পেন্‌সন লইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলা ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

[বঙ্কিম-জীবনী শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম—হারাণচন্দ্র রক্ষিত; বঙ্গভাষার লেখক বঙ্গবাসী অফিস; বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত; বঙ্কিমচিত্র—রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী; বঙ্কিম-বাবুর উপন্যাস সমালোচনা ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বঙ্গবাণী ১৩৩২ ৩৩, সাহিত্য ১৩০৯ বঙ্গদর্শন ১৩১৪; প্রবাসী ১৩৩৭।২।২০০ পৃঃ, প্রদীপ ১৩০৬ ২ ২৩; পঞ্চপুষ্প ১৩৩৬; মাধবী ১৩৩৪; বঙ্কিমচন্দ্র গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী; প্রবাসী ১৩২২; প্রবাসী ১৩৩৪ ।২।৯১। নব্যভারত ১৩৩০]

বরদাচরণ মিত্র (১৮৬১—১৯১৫)—

কলিকাতার কুমারটুলির বিখ্যাত মিত্রবংশে ১৮৬২ খৃঃ বরদাচরণের জন্ম হয়। ইঁহাদের আদিনিবাস নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম বেণীমাধব। ইনি ১৮৮২ খৃঃ ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৮৮৩ সালে প্রতিযোগী পরীক্ষা

পাস করিয়া ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন ও সেসন জজের পদে উন্নীত হন। ১৮৯৩ সালে মেঘদূত কাব্যের পদ্যানুবাদ ও ১৮৯৫ সালে 'অবসর' নামে কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বলরাম দাস—

বৈষ্ণব সাহিত্যরচয়িতা বহু বলরাম দাসের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ জন যে পদকর্ত্তা, তাহা নির্ণয় করা সমস্যা। বলরাম দাস নামধারী যাঁহাদের পদ-রচনা করা সম্ভব, তাঁহাদের দুই জনের পরিচয় নিম্নে লিখিতেছি—

প্রেমবিলাস-রচয়িতা, নিত্যানন্দ দাসের নামান্তর বলরাম দাস।

কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছি-গ্রাম-নিবাসী নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস।

খুব সম্ভব, প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরাম দাস। বলরাম দাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়বিধ পদ-রচনায় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। বলরামের রসোদ্গারের পদগুলি এক রকম অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পদাবলী-সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পরেই বলরামের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

[পদকল্পতরু ৫ম ভাগ সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ; বৈষ্ণব কবিতা—সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯)—

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১২৭৭ সালে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং মহাপ্রতিভাশালী কাকা রবীন্দ্রনাথের অতি সান্নিধ্যে থাকিয়াও বলেন্দ্রনাথ নিজের মৌলিকতা ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একটি সম্মানের আসন অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। বলেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই কলিকাতায় প্রথম স্বদেশী দ্রব্যের দোকান স্বদেশী-ভাণ্ডার খোলা হয়। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। বাংলা ১৩০৬ সালে টালায় মুসলমানদের যে দাঙ্গা লাগে, তাহাতে বলেন্দ্রনাথ মাথায় লাঠির আঘাত পান, এবং তাহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বলেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৯ বৎসর হইয়াছিল। এই প্রতিভা পরিণত হইবার অবকাশ পাইলে তিনি বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কাকারই ন্যায় অজস্র দান করিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন। [বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী]

বাউল—

একটি বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বাউল শব্দটি 'বায়ু' শব্দের সহিত 'আছে' এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন, এবং এই 'বায়ু' শব্দের অর্থে যোগ-শাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সঞ্চয় করিবার সাধনা করেন, তাঁহারা বাউল। কেহ বলেন, 'বায়ু' মানে নাসার শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবনধারা,

এবং তাহা সংবোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা বাউল। আবার কেহ বলেন, সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল: যাহারা বাতাধিক, তাহারা পাগল; যাহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে; এইরূপ সাধারণ-সমাজবহির্ভূত আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বাউল।

ইঁহারা অহেতুক প্রেমের সাধনা করেন; ইঁহাদের মতে প্রেম নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ কামনাশূন্য না হইলে কামপূর্ণ প্রেমের দ্বারা মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

বাউলেরা বলেন, সত্যকে লাভ করিতে হইবে, এবং সেই সত্যস্বরূপ, যিনি তিনি মানুষের অন্তর্যামী। এই যে মানব-দেহ, তাহাই দেব-মন্দির, এবং সেই মন্দিরেই বাস করেন মানুষের 'মনের মানুষ'। এমন কি, সমস্ত জীবই তাঁহার অবতার।

"জীবে জীবে চাইয়া দেখি, সবই যে তার অবতার।
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি, যার নিত্যলীলা চমৎকার॥"

বাউলেরা বলেন—যাহা সহজ ধর্ম্ম তাহাই উপাস্য, প্রতিমা ঠাকুর প্রভৃতি প্রতীকের কোনও আবশ্যক নাই।

"সহজ মানুষ ছিল হৃদয়-বৃন্দাবনে।
জানি না তায় হারাইলাম কোন্ ক্ষণে॥"

বাউলেরা বলেন,—এই মনের মানুষই মানুষের গুরু, যিনি সহজ সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহা লোকের গোচর করিয়া দিতে পারেন, তিনিই মানুষের গুরু; পূর্ণ সত্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, এইজন্য সকল মানুষেরই মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তাহা সন্ধান করিয়া

লাভ করাই হইতেছে শিষ্যের কাজ। সুতরাং গুরুর অন্ত নাই। বাউলেরা বলেন যে—

"আমার যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি॥
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি॥
দীক্ষা বিনা চলে না যে একটি প্রাণের শ্বাস,
সেই কথাতে গভীর আমার রয়েছে বিশ্বাস॥
আমি নীর পেয়েছি, ক্ষীর পেয়েছি, পরাণ পেয়েছি,
তারি সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি॥"

জন্ম মাত্র মাতা যেমন মানবের গুরু হন, তেমনি প্রতিদিন সে যাহার সান্নিধ্যে হয়, তাহার কাছ হইতেও কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করে, অতএব সেই-সব ব্যক্তিও তাহার গুরু।

"গুরু ব'লে কারে প্রণাম করবি মন।
তোর অতিথ গুরু, পথিক গুরু, ও তোর গুরু অগণন,
ও তোর গুরু সর্ব্বজন।

গুরু রে তোর বরণ-ডালা,
গুরু রে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরু রে তোর হৃদয়-ব্যথা
যে ঝরায় দুনয়ন॥"

তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন যে, মৌমাছি যেমন ফুল হইতে অপর ফুলে বিচরণ করিয়া মধু আহরণ করে, মানুষকেও তেমনি এক গুরুর কাছে জ্ঞান আহরণ করিয়া অপর গুরুর সন্ধানে ফিরতে হইবে—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরু গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

তাই বাউলেরা বলেন—

"গুরু কর্‌ব শত শত, মন্ত্র কর্‌ব সার।
যার সঙ্গে মন মিল্‌বে, দায় দিব তা'র॥"

সহজ ভাবে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তাহারই সাধন করাই বাউলদের সহজ সাধন। রাঢ় দেশের সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ এই মত প্রথম প্রচার করেন। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। সহজিয়া ধর্ম্ম তান্ত্রিকতারই প্রকারভেদ। যে রসের বিকাশ সৃষ্টিতে, মনুষ্য-দেহেও তাহার আস্বাদ পাওয়া যায়। মানুষের দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। দেহের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মনের যোগ ঘটে, দেহের মধ্যেই বিশ্বেশ্বরের সহিত আমাদের পরিচয় সহজ ভাবে ঘটে। এই কায়ার মধ্যেই সমগ্র জগতের ও জগৎপতির যোগ অনুভব করিবার সাধনই সহজ সাধন বা কায়া সাধন। সেই জন্য চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"শুন রে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

দীপকোজ্জ্বল নামক রসশাস্ত্রে আছে—

"নরদেহ বিনু নহে রসের আস্বাদন।"

দৈহিক শক্তিগুলির সাহায্যে যাহাতে চৈতন্যরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, এবং অখণ্ড চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড আনন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, তাহাই সহজিয়া সাধকদের উদ্দেশ্য।

এখন বাংলা দেশে যে বাউল সম্প্রদায় দেখা যায়, তাহারা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকেই নিজেদের সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া ঘোষণা করে। বাউল সম্প্রদায়ের অপর শাখা নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় নিত্যানন্দ

প্রভুর পুত্র বলভদ্র বা বীরভদ্র গোস্বামীকে নিজেদের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গদেশে ১০ম শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সহজিয়া মতের প্রচারক ছিলেন নাঢ় পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নীর নাম ছিল নাঢ়ী। চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্য্যকে নাঢ়া বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায় (চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায়, ২৪ অধ্যায়, ৮ম, ৬ষ্ঠ)। আবার বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বলেন, তাঁহাদের আদিগুরু স্বরূপ দামোদর। স্বরূপের শিষ্য রূপ গোস্বামী, রূপের শিষ্য রঘুনাথ দাস, দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য সিদ্ধ মুকুন্দদাস। মুকুন্দদাসের চারি শিষ্য হইতে আউল, বাউল, সাঞী, দরবেশ এই চারি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। সহজ ধর্ম্ম নবরসিকের ধর্ম্ম নামে পরিচিত। নয় জন রসিকের নাম পাওয়া যায় না; কাটোয়া-নিবাসী যদুনাথ দাসের সংগ্রহ-তোষণী পুঁথিতে পাঁচ জন রসিকের নাম পাওয়া যায়—বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও কবি রায় শেখর। ইঁহারা প্রত্যেকেই পরকীয়া সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, ইঁহাদের পরকীয়া প্রেম ছিল বিশুদ্ধ, 'কামগন্ধ নাহি তায়।'

বাউল তাঁহারাই—যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমে অধীর হইয়া হাস্য ক্রন্দন করেন, হরিনাম শ্রবণে উদ্দণ্ড নৃত্য করেন ও অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করেন। বাউলদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 'ক্ষেপা বাউল' নাম ধারণ করেন। ঐ দুই শব্দের অর্থ একই। গৌরাঙ্গদেব 'ক্ষেপা' নিমাই নামে পরিচিত ছিলেন।

সহজ ভাবে জীবন যাপন ও ধর্ম্মসাধন করাই বাউলদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য তাহারা চুল-দাড়ি যথেচ্ছ বাড়িতে দেয়, কিছুই কাটে না। ইহারা কাহারও উচ্ছিষ্ট মতের ধার ধারে না; তাহারা প্রত্যেকে নিজের

বিবেকবুদ্ধির নির্দ্দেশ ও ধারণা অনুযায়ী চলিতে চায়। এইজন্য বাউলেরা নিজেদের বলে 'নিবর্ত্তিয়া' অর্থাৎ ব্রতবিরহিত বা ব্রাত্য।

"তাইতে বাউল হইনু ভাই।
এখন লোকের বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবী-দাওয়া নাই।"

বাউল আরও বলিয়াছেন—

"তোরি ভিতর অতল সাগর,
তা'র পাইলি না মরম।
তা'র নাই কূল-কিনারা, শাস্ত্রধারা,
নাই ধরম কি করম॥"

ইঁহাদের মতে বিগ্রহ-সেবা, প্রতিমা-পূজা, উপবাস. ব্রতনিয়ম, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির কোনও আবশ্যক নাই। ইঁহাদের মতে পরমদেবতার যুগলমূর্ত্তি নরদেহে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই, মন্দিরে বা তীর্থে তাঁহার সন্ধান বৃথা।

"কারে বল্‌ব, কে কর্‌বে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।"

লালন ফকির বলিয়াছেন—

"আছে আদ মক্কা এই মানব-দেহে,
দেখ্‌না রে মন ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়িয়ে এবার
মরিস্ কেন হাঁপিয়ে॥"

লালন আরও বলিয়াছেন—

"যারে আকাশ-পাতাল খুঁজে মরিস্,
এই দেহে সে রয়।"

ইহারা লোকালয়ে লোকাচার পালন করিলেও নিজেদের চক্রের মধ্যে সামাজিক হিসাবে অনাচার করে। যেমন ইহারা সকল জাতির লোকের সঙ্গে একত্র পান ভোজন করে, তেমনই সকল শ্রেণীর লোককেই গুরু অথবা শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এইজন্য ইহারা বলে—

"লোক-মধ্যে লোকাচার।
সদ্‌গুরু-মধ্যে একাচার॥"

তাই বাউলেরা আপনাদের সাধনপ্রণালী সহজে প্রকাশ করে না। ইহারা বলে—

"আপন ভজন-কথা না কহিবে যথাতথা।
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।"

বাউল সাধকেরা নানা ভাবের গান রচনা করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই গানই তাঁহাদের শাস্ত্র। এই গানগুলি শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে চলিতে থাকে। ইহাদের গানের মধ্যে দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রকৃতিভজনপ্রণালী প্রভৃতির কথাই অধিক। কিন্তু অনেক গানে হৃদয়ের সহজ অনুভূতি ও সহজ সত্য এবং শাশ্বত মানব-ধর্ম্মের অনুপম উপলব্ধির কথা অসাধারণ উচ্চ কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহার নমুনা আমাদের সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

[The Bauls and Their Cult of Man—By Kshitimohan Sen, Viswa-Bharati Quarterly, January, 1929; বাউলসম্প্রদায়ের আদি—উমেশচন্দ্র বটব্যাল, সাহিত্য ১৩০৮; চৈতন্যচরিতামৃত; চৈতন্যভাগবত; ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত; হারামণি—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন; বঙ্গবাণী ১৩৩৩ পৌষ; সাহিত্য ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ; ভারতী ১৩৩০ আশ্বিন ৫২৮ পৃষ্ঠা; সাহিত্য-

পরিষৎপত্রিকা ১৩০২; ঢাকা-রিভিউ ১৯২১অক্টোবর; বাউল—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী ১৩৩৯ মাঘ-ফাল্গুন; লালন ফকিরের পরিচয় দেখুন।]

বাসুদেব ঘোষ (১৫ শতক)—

বাসুদেব তাঁহার উপাধি ঘোষ না দিয়া পদের ভণিতা লিখেন নাই। ইঁহার অপর দুই সহোদর মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের সকল পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। ইঁহারা নিজেরা চৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন মনে করিতেন বলিয়া চৈতন্য-লীলাকে কৃষ্ণ-লীলার অনুরূপ করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি নিজেকে চৈতন্য-দেবের নায়িকা কল্পনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী অতি প্রাঞ্জল, এবং এক-একটি গভীর অর্থদ্যোতক। ইঁহাদের পৈতৃক বাড়ী ছিল কুমারহট্টে; কিন্তু ইঁহারা চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভের ইচ্ছায় নবদ্বীপে গিয়া বাস করেন। ইঁহাদের উল্লেখ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের বহু স্থানে আছে।

[পদকল্পতরু ৫ম ভাগ, সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; বঙ্গভাষাব লেখক।]

বিদ্যাপতি (১৩৮০ ?—১৫১৩ ?)—

বিহার প্রদেশের দ্বারবঙ্গ জেলার মধুবানী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে বিদ্যাপতি ঠাকুরেব জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গণপতি ঠাকুর ও মাতার নাম হাসিনী দেবী। তাঁহাব জন্মবৎসর এখনও নির্ণীত হয় নাই। তিনি মিথিলার রাজা

শিবসিংহের নিকট হইতে ১৪০০ সালে বিস্‌ফী গ্রাম দানে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের এক প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৪৫৬ সালে লিখিত। বিদ্যাপতি মিথিলার বহু রাজা ও রাণী ও রাজপুরুষের নাম স্বীয় কবিতার মধ্যে ভণিতায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি ১৩৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতি উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির জন্য নব-জয়দেব, নব-কবিশেখর, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের সহপাঠী ছিলেন, এবং নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থাবলী—কীর্ত্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা, লিখনাবলী, শৈবসর্ব্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, গয়াপতন ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। তিনি নব রসিকদের অন্যতম রসিক কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতির ধর্ম্মমত সম্ভবতঃ শৈব ছিল, অথবা তিনি পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত ছিলেন ; খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন না—যদিও তিনি বৈষ্ণবপদাবলী-রচয়িতাদের অগ্রণী। তাঁহার পুত্র-সন্তান ছিল না, দুল্লহী নাম্নী একটি কন্যা ছিল। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থ বাংলা ও হিন্দীতে ছাপা ও প্রকাশিত হইয়াছে।

[সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত—পদকল্পতরুর পদাবলীর ভূমিকা, মহোমহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত কীর্ত্তিলতার ভূমিকা ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। প্রবাসী ১৩২২; প্রবাসী ১৩৩০।২।১০০ ; সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৭ ; সবুজপত্র ১৩২৪ ফাল্গুন, ১৩২৫ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ; মানসী

১৩৩০।৫১৮ পৃ; বঙ্গদর্শন ১৩১১; বঙ্গদর্শন ১৩০৯; আর্য্যদর্শন ১২৮১; বিদ্যাপতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

বিদ্যাপতি (শ্রীখণ্ডের)—

ইনি বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড-গ্রাম-নিবাসী বাঙ্গালী কবি ছিলেন।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১—)—

১৮৬১ সালের ২৬এ সেপ্টেম্বর বাংলা ১১ই আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৮৮০ সালে হুগলী হইতে এণ্ট্রান্স, ১৮৮২ সালে কলিকাতার সিটি কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্ট্স্, এবং ১৮৮৪—৮৫ সালে মেট্রপলিট্যান কলেজ হইতে বি-এ পাস করেন। পরে বি-এল পাস করিয়া সম্বলপুরে ওকালতী করিতে যান। এই সময় হইতে ইনি নানা বিখ্যাত পত্রে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, গবেষণা লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ইঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য ইঁহাকে সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্মানিত আসন প্রদান করে। ১৯১৪ সালে ইনি দৃষ্টিহীন হইয়া কলিকাতায় আসেন, এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং বঙ্গবাণী মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির ও মনীষার বলে সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং বহু গ্রন্থও রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তকের নাম আমরা উল্লেখ করিতেছি। ইহা ভিন্ন বহু প্রবন্ধ নানা পত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তপস্যার ফল, কথানিবন্ধ, থেরীগাথা, ফুলশর, যজ্ঞভস্ম, হেঁয়ালি, পঞ্চকমালা, কালিদাস, প্রাচীন সভ্যতা, গীতগোবিন্দ, Orissa In the Making, The Chohan Rulers of Sonpur, Typical

Selections from Oriya Literature, The Aborigines of the Highlands of Central India, History of the Bengali Language, প্রভৃতি পুস্তক সুধীসমাজে,—স্বদেশে, বিদেশে—সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (১৮৩৫—১৯০১)—

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা লেখার দিকে ঝোঁক ছিল।

যৌবনে বিহারীলাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সহিত পরিচিত হন, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ইঁহারা পরস্পরের প্রভাবে কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্য অপূর্ব্ব সুন্দর সুমিষ্ট গীতিকবিতা। ইহার আগে বাংলা ভাষায় এই জাতীয় কাব্য আর প্রণীত হয় নাই। ইঁহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সারদামঙ্গল কাব্য বিহারীলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। উহা বাংলা ১২৮১ সালে আর্য্যদর্শন পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্গসুন্দরী, সাধের আসন, বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিণী, নিসর্গসুন্দরী, মায়াদেবী ও বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া ইনি যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

বাংলা ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিবর বিহারীলাল দেহত্যাগ করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বন্ধু কবি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বিহারী-বাবু সদাই কবিত্বে মশ্‌গুল থাকিতেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে

প্রাণে কবিত্ব ঢালা ছিল। তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা অপেক্ষাও তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ কবিবর বিহারীলাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নব গীতিকবিতার আদিকবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। মহাকাব্যের উচ্চ শিখর হইতে অবতরণ করিয়া গীতি-কবিতার স্বর্ণসিংহদ্বার তিনিই বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইনি প্রকৃতিকে এক নব ভাবে দেখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কবিতার মূল তত্ত্ব সৌন্দর্য্য-পিপাসা।"

[বঙ্গভাষার লেখক; সুবল মিত্রের অভিধান; বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন; বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক—শিবরতন মিত্র; আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিহারীলাল—মন্মথনাথ ঘোষ, উদয়ন ১৩৪০—১৩৪১]

ভারতচন্দ্র (১৭১২—১৭৬০)—

হাবড়া-আমতার নিকটে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, বাংলা ১১১৯ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় পেঁড়ো গড়ের জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের আসল পদবী মুখোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্র পিতার চতুর্থ পুত্র। ভারতচন্দ্রের শৈশব-কালে তাঁহার পিতার সহিত বর্দ্ধমানের রাণীর বিবাদ হওয়াতে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যচ্যুত হইয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়া শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ভারতচন্দ্র সেই মাতুলালয়ে মণ্ডলঘাট পরগনার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে শৈশব অতিবাহিত করেন। তিনি নয়াপাড়ার সন্নিহিত তাজপুর গ্রামের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, এবং চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে করিতেই সারদা-গ্রাম-

নিবাসী নরোত্তম আচার্য্যের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্রের পিতা হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র কেবলমাত্র সংস্কৃত শিখিয়াছেন, ফার্সী শিখেন নাই, এবং অপকৃষ্ট কুলে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট নিন্দাভাজন হন। সেই দুঃখে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া হুগলি জেলার ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুরের মুন্‌শী বাবুদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুন্‌শী-বাড়ীর কর্ত্তা রামচন্দ্র মুন্‌শী ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার নিকটে ফার্সী শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। একদা মুন্‌শী-বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হইল, ব্রতকথার পুঁথি পড়িবার ভার দেওয়া হইল ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের উপর। তিনি গোপনে এক পাঁচালী রচনা করিয়া সেই দিন পাঠ করিলেন, এবং তাহাতে ভারতচন্দ্রের ভণিতা শুনিয়া সকলে তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইল। অপর আর এক দিন সত্যনারায়ণ পূজার পর তিনি অন্য একটি নূতন ব্রতকথা রচনা করিয়া পাঠ করেন, এবং সকলে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হয়। এই পাঁচালী রচনার তারিখ তিনি ভণিতায় দিয়া গিয়াছেন—বাংলা ১১৩৪ সাল। তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

কিছুদিন ফার্সী পড়িয়া কৃতবিদ্য হইলে, ভারতচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে নিজেদের জমিদারী উদ্ধারের চেষ্টা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান-রাজের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিলে, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই তিনি কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশের সীমা ত্যাগ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং

সেখানে পুরীর রাজা শিবভট্টের আশ্রয়ে কিছুদিন থাকেন, এবং পরে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের দলে মিলিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে তাঁহার শ্যালীপতি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া নিজের আলয়ে লইয়া যান ও তথা হইতে তাঁহাকে তাঁহাদের শ্বশুরালয়ে লইয়া যান। তখন ভারতচন্দ্রের বয়স ৩৯ বৎসর। ২৫ বৎসর পরে তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের দেওয়ান ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর নিকটে আসেন ও কর্ম্ম প্রার্থনা করেন। এই সময়ে একদিন কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ইন্দ্র-নারায়ণের মুখে ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যান ও একখানি কাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুসারে ভারতচন্দ্র তাঁহার অমর কাব্য অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। ১৬৭৪ শকে, বাংলা ১১৫৯ সালে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিত্বে মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিগুণাকর উপাধি দিয়া ভূষিত করেন। তখন মহারাজ বার্ষিক ৬০০ টাকা রাজস্ব স্থির করিয়া তাঁহাকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন, এবং কবির বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দেন। কবির পিতা এই মূলাজোড়ের বাটীতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন ও ঐখানেই দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে বর্গীর আক্রমণের ভয়ে বর্দ্ধমানের রাণী পুত্র তিলকচন্দ্রকে লইয়া পলাইয়া আসিয়া মূলাজোড়ের নিকটে কাউগাছি গ্রামে আশ্রয় লন।

মহারাণী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় পত্তনি লইতে ইচ্ছা করিলে, ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু মহারাজা তাঁহাকে মূলাজোড়ের পরিবর্ত্তে গুস্তে গ্রামে ১০৫ বিঘা ও মূলাজোড়ে ১৩ বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। মূলাজোড়ের অধিবাসীরা কবিকে ছাড়িতে অসম্মত হইলে তাহাদের অনুরোধে তিনি মূলাজোড়ের বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন। রামচন্দ্র নাগ খাজনা আদায় করিতে জুলুম করাতে বিরক্ত হইয়া কবি নাগাষ্টক কবিতা লিখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে প্রেরণ করেন, এবং মহারাজা তাহা বর্দ্ধমানের মহারাণীকে প্রতিপ্রেরণ করিলে তিনি নাগের উপদ্রব দমন করেন।

১৬৮২ শকে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ও ছন্দ রচনার শক্তি তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় ও অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি মধ্য-যুগের বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি। শব্দবিন্যাস, ভাবপ্রকাশ ও ছন্দসৃষ্টি প্রভৃতি কোনও বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কোনও মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা কবি তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার রচনার রুচির জন্য অনেকে তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার আবির্ভাব-কাল, তাঁহার আশ্রয়স্থল রাজসভা ও বর্দ্ধমানের রাজপরিবারের সহিত বিরোধ অনেকখানি দায়ী। ভারতচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে অন্নদা-মঙ্গল ও তদন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরই প্রধান ও শ্রেষ্ঠ।

[ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, বঙ্গবাসী-সংস্করণ; বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসী-অফিস; বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী;

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; সাহিত্য ১৩১১ ; আর্য্যদর্শন ১২৮১ ; ভারতবর্ষ ১৩৩৫ বৈশাখ ; বসুমতী ১৩৩৩ পৌষ-মাঘ]

মদন বাউল বা মদন সেখ—

ইঁহার কয়েকটি গান শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন সংগ্রহ করিয়াছেন। গানের ভাষা হইতে জানা যায়, ইনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন।

ময়নামতীর গান—

গোপীচন্দ্রের গান স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত গীত হইত। বঙ্গদেশের রংপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার সমধিক প্রচলন ছিল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগের দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের ও নাথ-যোগীদের ধর্ম্ম-মত একত্র মিলাইয়া রচিত। রাজা মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনের কাহিনী লইয়া যে গান রচিত হইয়াছিল, তাহাই রাজা মাণিকচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান ও গোপীচন্দ্রের গান নামে পরিচিত হইয়াছে। এইসব গানের রচয়িতা যে কে, তাহা স্থির করা যায় না। বাংলা দেশের গাথাগুলির সহিত অন্য প্রদেশের গাথাগুলির কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও মোট বিষয় এক। বাংলা গানের মতে গোপীচন্দ্র ছিলেন মাণিকচন্দ্র রাজার ও রাণী ময়নামতীর পুত্র। ময়নামতী রাজা তিলকচাঁদের কন্যা। রাজা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে গোপীচন্দ্র বিবাহ করেন। ইঁহারা ত্রিপুরা জেলার লালমাই-ময়নাবতী পাহাড়ের এক অংশ মেহেরকুল ও পাটিকারানগর রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। মেহেরকুল ও পাটিকারা দুটি সংলগ্ন পরগনা। লালমাইপর্ব্বত কুমিল্লা হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চিমে। দুইখানি আধুনিক পুঁথিতে দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও সুকুর মহম্মদ নামক লেখকদের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা বোধ হয় পরবর্ত্তী কালের

প্রকাশক মাত্র। এইসব গান গ্রাম্য কবিদের রচনা, তথাপি ইহাতে বহু ধর্ম্মতত্ত্ব, দার্শনিকতা ও কবিত্ব পাওয়া যায়।

[গোপীচন্দ্রের গান—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; প্রতিভা ১৩২৮ আশ্বিন; ১৩১৯ যোগিসখা ১৩৩১ ভাদ্র, প্রবাসী ১৩১৬; ভারতী ১৩১৩]

ময়মনসিংহ-গীতিকা—

ময়মনসিংহ জেলায় প্রাপ্ত কতকগুলি গাথা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলির রচয়িতার নাম-ধাম ও অন্য অল্প পরিচয় পাওয়া যায়, আর কতকগুলির কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। এইসব রচয়িতা-দের মধ্যে কেবল দুই জন একটু বিখ্যাত ব্যক্তি, আর অপর সকলেই অপরিচিত গ্রাম্য কবি। কিন্তু তাঁহারা কোমল-কান্ত কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গদেশকে সমৃদ্ধ ও চিরঋণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ময়মন-সিংহ-গীতিকবিতার মধ্যে ইতিহাস আছে, পুরাণ আছে, ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, সমাজতত্ত্ব আছে, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব অল্প স্বল্প আছে। তাহা ভিন্ন ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়াও এই কবিতাগুলির মূল্য আছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান মূল্য খাঁটি কবিত্বরসে, মানব-মনের সুখ দুঃখ, প্রেম বিরহ সম্বন্ধে প্রাণের দরদে; সমাজ ও সংস্কার অপেক্ষা মানুষ যে বড়, সেই অতি আধুনিক কথাটিকে জোর করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিবার মতন সাহস ও শক্তিতে। অনেকগুলি গাথাই গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস। সত্যঘটনামূলক বলিয়া গল্পগুলির ভিতর বাস্তব জীবনের স্বরূপ অনুভূতির প্রকাশ ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের ট্র্যাজেডি এমন সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে,

এগুলি অতি উৎকৃষ্ট আধুনিক ছোট গল্পের সমকক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা সহজ ও সরল, এবং কবিত্বরসে মধুর। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী ভিন্ন বাংলা সাহিত্যে ইহার সমকক্ষ সুন্দর কবিতা আর রচিত হয় নাই। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব, ইহারা অভিজাত সমাজের কাহিনী নহে, ইহা গ্রাম্য চাষী দরিদ্র সামান্য লোকেদের হৃদয়বেদনার কাহিনী। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির পরিচয় আছে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোকের কাহিনী আছে। অতএব ইহাকে বাংলাদেশের প্রকৃত অন্তরের সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

যাঁহারা এই অসাধারণ কাব্য রচনা করিয়াও এত কাল অপরিজ্ঞাত থাকিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম-ধাম যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

দ্বিজ কানাই—ইনি নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। দীনেশবাবুর অনুমান, ইনি ১৭ শতকের কবি। ইনি প্রসিদ্ধ মহুয়া কাব্য প্রণয়ন করেন।

নয়নচাঁদ ঘোষ—ইনি চন্দ্রাবতী নামক চমৎকার গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি রঘুসুত, দামোদর ও শ্রীনাথ বানিয়া নামক কয়েক জন কবির সহিত মিলিয়া 'কঙ্ক ও লীলা' নামক গাথাও রচনা করেন।

দ্বিজ ঈশান—ইনি কমলা নামক গাথার রচয়িতা।

চন্দ্রাবতী—ইনি সুবিখ্যাত মনসা-ভাসানের লেখক কবি বংশীদাস

রায়ের কন্যা। দ্বিজ বংশীদাস স্বগ্রামে বংশীপণ্ডিত নামে পবিচিত ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী ছিল কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাতওয়ারী গ্রামে। বংশীদাস বা বংশীবদন ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পদ্মাপুবাণ বা মনসার ভাসান রচনা করেন। মনসামঙ্গলে তাঁহাব কন্যা চন্দ্রাবতী ও তাঁহার প্রণয়ী জয়চন্দ্রেব রচনা আছে। চন্দ্রাবতী 'কেনারাম' গাথায় তাঁহারই পিতার দ্বারা ডাকাত কেনারামের সাধু হওয়ার বিবরণ লিখিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের প্রণয়কাহিনীর ট্র্যাজেডি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ। চন্দ্রাবতী তাঁহাব প্রণয়ী জয়চন্দ্রকে হারাইয়া অন্তর্ব্যথা ভুলিবার জন্য একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। সেই রামায়ণে তিনি তাঁহার পিতার বংশপরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

রঘুসুত—দীনেশবাবুর অনুমান, ইনি ১৭০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে পাটুনী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩)—

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রামে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ ও মাতার নাম জাহ্নবী। মধুসূদন বাল্যে হিন্দু-কলেজে শিক্ষা লাভ কবেন, এবং সেই সময়কার প্রভাবের বশীভূত হইয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং সেইজন্য তাঁহার নামের পূর্ব্বে মাইকেল নাম সংযুক্ত হয়। হিন্দুকলেজে শিক্ষা করিবার সময়েই তাঁহার কবিত্বশক্তিব উন্মেষ হয়। তিনি খৃষ্টান হইয়া মাদ্রাজে যাত্রা করেন, এবং সেখানে গিয়া ইংরেজীতে 'ক্যাপটিভ্ লেডী' নামে এক রচনা প্রকাশ করেন। মাদ্রাজে তিনি শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন, এবং পরে সেই কলেজের সাহেব অধ্যক্ষের কন্যার

পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু সেই বিবাহ তাঁহাদের সুখের হয় নাই, এবং শীঘ্রই বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে হয়। পরে আবার তিনি হেন্‌রিয়েটা নাম্নী অপর একটি ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বহু ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া ১৮৫৬ সালে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, এবং সেই সময় তাঁহার বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়। ১৮৫৭ সালে তিনি পুলিস আদালতে প্রথমে কেরানীর পদে ও পরে দোভাষীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, সতীশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ধনীদিগের অনুরোধে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের প্রণীত রত্নাবলী নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া লোক-সমাজে পরিচিত হন। তখন থিয়েটারে অভিনয়ের উপযোগী উৎকৃষ্ট নাটক নাই দেখিয়া মাইকেল নিজেই নাটক লিখিতে সঙ্কল্প করেন, এবং তাহার ফলে শীঘ্রই 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটক ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়া নিজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। একদিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে মাইকেল সঙ্কল্প করেন যে, তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি কাব্য রচনা করিবেন। সেই সঙ্কল্প অনুসারে তিনি তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য (১৮৫৯—১৮৬০) রচনা করিয়া বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেন। প্রথমে কয়েক জন রসগ্রাহী ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণে তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত অমিত্র ছন্দ পছন্দ করে নাই, কিন্তু ১৮৬১ সাল হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করিয়া স্রষ্টা কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়েন।

১৮৬২ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ও সেখানে সপরিবারে

১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত থাকেন। কিন্তু দারুণ অর্থকষ্টে কাতর হইয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার সাহায্যে দেশে ফিরিয়া আসেন।

ফ্রান্সে থাকিবার সময় তিনি ফরাসী, জার্ম্মান, ইতালীয় ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করেন, এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। বঙ্গভাষায় সনেট জাতীয় কবিতা রচনা প্রথম মাইকেল প্রবর্ত্তন করেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে পসার না হওয়াতে তিনি ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোট নামক স্থানের রাজার ম্যানেজারের কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বেশি দিন টিকিতে পারেন নাই। আবার তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, কিছুদিন তিনি ঢাকাতেও ছিলেন। অর্থকষ্টে ও নানা প্রকার মানসিক অশান্তির জন্য তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার পত্নী পীড়িতা, নিজে পীড়িত, অথচ চিকিৎসার সম্বল কিছু নাই। এমন অবস্থায় মাইকেলের বন্ধুগণ মিসেস্ দত্তকে তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে পাঠাইয়া দেন এবং মাইকেলকে দাতব্য হাস্‌পাতালে প্রেরণ করেন। সেই দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যুশয্যায় তিনি পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করেন, এবং ইহার তিন দিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯এ জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় নব নব সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার গুণগ্রাহী দেশবাসিগণ তাঁহার সমাধির উপর এক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহাতে মাইকেলের নিজের রচিত একটি কবিতায় তাঁহার পরিচয় লিখিত হইয়াছে।

[মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু; মধুস্মৃতি —নগেন্দ্রনাথ সোম; বঙ্গভাষার লেখক; মধুসূদন—শশাঙ্কমোহন সেন; প্রবাসী—১৩১১, ১৩৩০।২।৭২৬; প্রতিভা—১৩৩২ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ; অর্চনা—১৩৩১ অগ্রহায়ণ; বঙ্গবাণী—১৩৩২-৩৩; বঙ্গদর্শন—১৩১৪; প্রবাসী—১৩৩৫।১।৮৫৮; প্রবাসী—১৩৩৬।১।৪৩০]

মানকুমারী বসু (১৮৬৫—)—

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৭১ সালের মাঘ মাসে মানকুমারীর জন্ম হয় তাঁহার মাতুলালয় শ্রীধরপুর গ্রামে, যশোহর জেলায়। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্যেঠতুত ভাই আনন্দমোহন দত্তচৌধুরী মহাশয় মানকুমারীর পিতা, এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল শান্তমণি। মানকুমারী পিতা-মাতার কনিষ্ঠা কন্যা। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল, কিন্তু মানকুমারীর পিতা কন্যাকে বিদ্যালয়ে পড়াইয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাদের পাঠের জন্য মানকুমারীব দাদা বামাবোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাতে প্রকাশিত কবিতা পাঠ করিতে করিতে মানকুমারীর মনে কবিতা রচনার ইচ্ছা হয়। মানকুমারীর পিত্রালয় ছিল যশোহর জেলার মধ্যে কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে। সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিদ্যানন্দকাটি গ্রামে বসু-পরিবারের মধ্যে মানকুমারীর বিবাহ হয়। তখন মানকুমারীর বয়স মাত্র ৮ বৎসর। তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি লোকের যত্ন ছিল, মানকুমারী সেখানেও লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি ১৪ বৎসর বয়সে 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' নামে একটি কবিতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়া স্বামীকে উপহার দেন। সেই কবিতা 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রে মুদ্রিত হয়। ইঁহার স্বামী ডাক্তার

ছিলেন। মাত্র সাড়ে আঠারো বৎসর বয়সে একমাত্র কন্যা লইয়া মানকুমারী বিধবা হন। সেই শোকাবেগে তিনি 'প্রিয়প্রসঙ্গ' নামে এক গদ্যকাব্য রচনা ও প্রকাশ করেন। 'বনবাসিনী' নামে এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া তিনি বামাবোধিনীর পুরস্কার লাভ করেন। ইঁহার নানা সময়ে লিখিত কবিতাগুলি একত্র করিয়া 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশ হইলে ইঁহার কবি বলিয়া খ্যাতি প্রচারিত হয়। ইহার পরে 'কনকাঞ্জলি', 'বীরকুমার-বধ' কাব্য রচিত ও প্রকাশিত হয়। কাব্যকুসুমাঞ্জলি প্রথম প্রকাশের তারিখ বাংলা ১৩০০ সাল। ইঁহার কবিতার মধ্যে হিন্দু বিধবার উপযুক্ত ঈশ্বরভক্তি, পতিভক্তি, সংযম ও শুচিতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাগুলি সরল ও অনাড়ম্বর।

[বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। উত্তরা ১৩৩৩—৩৪]

মহারাজ মহাতাবচাঁদ (১৮২০—১৮৭৯)—

ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজা, মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে ভাগলপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি কতকগুলি গীত রচনা করিয়া কবিযশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইনি কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া মূল মহাভারত পাঠ করিতে উৎসুক হন, এবং বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত মহাভারত বাংলাভাষায় অনুবাদ করাইয়া গিয়াছেন। ইহাও তাঁহার এক সাহিত্যিক মহাকীর্ত্তি।

[সুবল মিত্রের অভিধান ; সঙ্গীতসারসংগ্রহ—বঙ্গবাসী কার্য্যালয়]

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ (১৫৪৪ ?—১৬০৪ ?)—

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগনায় আধুনিক রায়না থানার অধীন দামুন্যা গ্রামে রত্নাম্বু নদের তীরে জন্মগ্রহণ করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কয়ড়ী গ্রামিন কুলে মিশ্র-উপাধিক তপন ওঝা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ; জগন্নাথ মিশ্র মুকুন্দরামের পিতামহ। জগন্নাথের পুত্র হৃদয় মিশ্র; হৃদয় মিশ্রের পত্নীর নাম দেবকী; তাঁহাদের পুত্র কবিচন্দ্র, কবিচন্দ্র তাঁহার উপাধি, নাম ছিল নিধিরাম বা অযোধ্যারাম), মুকুন্দরাম ও রামানন্দ বা রমানাথ; মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম ও পঞ্চানন, কন্যা যশোদা, জামাতা মহেশ। মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে মুকুন্দবাম স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া নানা বিপদ ও কষ্ট উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে মেদিনীপুর জেলায় ব্রাহ্মণভূম পরগনার আড়রা গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায়ের সভায় আশ্রয় পান ও রাজপুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে রঘুনাথ রাজা হইলে তাঁহার আদেশে তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে কবিকঙ্কণ উপাধি দিয়া সম্মানিত কবেন। কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন, যদিও তিনি উদাব ভাবে সকল দেবদেবীর বন্দনা করিযা চণ্ডীব মাহাত্ম্য ঘোষণা কনিয়াছেন। কবিকঙ্কণ যখন স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত হন তখন রাজা মানসিংহ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে সুবা বাংলাব সুবাদার নিযুক্ত হন, এবং ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। অতএব কবিকঙ্কণ ঐ সময়ের মধ্যে কোনও সময়ে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। গ্রন্থ মধ্যে আর একটি তারিখের উল্লেখ আছে, তাহাই পুস্তক রচনার তারিখ বলা হইয়াছে—১৫৭৭। কিন্তু এই তারিখের সহিত মানসিংহের সুবাদারীর তারিখের মিল হয় না। সে যাহাই হৌক, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কবিকঙ্কণ তাৎকালীন সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন।

তাঁহার কাব্যখানিও তাৎকালীন বঙ্গসমাজের এক মহামূল্য আলেখ্য। কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা অতি উচ্চ শ্রেণীর; চরিত্র-অঙ্কন-শক্তিও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। মোটের উপর, মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে মুকুন্দরাম নিঃসংশয়ে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান ও সমাদর পাইবার যোগ্য। সেকালের সামাজিক রীতিনীতি, জাতিবিভাগ ও তাহাদের ব্যবসায় ও স্বভাব, নগর পত্তন, রাজসভা ও সভাসদ ইত্যাদি বহু বিষয়ের পরিচয় এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

[চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী, ২য় ভাগ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; বঙ্গভাষার লেখক; বঙ্গের কবিতা]

যদুনন্দন দাস (১৫৩৭—১৬০৮ ?)—

যদুনন্দন বা যদুনাথ নামে কয়েক জন পদকর্ত্তা ছিলেন। কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্মণ। মালিহাটী-নিবাসী কবি যদুনন্দন দাসই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ১৫২৯ শকে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি 'কর্ণানন্দ' নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম হয় ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইনি রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের সুললিত বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইনি বৈদ্যবংশীয় ছিলেন।

[পদকল্পতরু ৫ম ভাগ, সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; বঙ্গভাষার লেখক]।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬—১৮৮৭)—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৬ সালে হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনায় অনুরাগী ছিলেন। তিনি যৌবনে এডুকেশন গেজেট পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং ঐ পত্রে বহু কবিতা প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি ইন্‌কম্ ট্যাক্স এসেসর ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ পান। সেই সময়ে ১৮৫৮ সালে পদ্মিনী-উপাখ্যান, ১৮৬২ সালে কর্ম্মদেবী, এবং ১৮৬৮ সালে শূরসুন্দরী নামে তিনখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইনি কুমার-সম্ভবেরও বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অনুকরণে লিখিতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গলাল স্বীয় প্রতিভাব বলে বঙ্গকবিতার ধারা পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হন, এবং তিনিই মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কবিতার অগ্রদূত। ইঁহার কবিতায় স্বদেশপ্রীতি ও বীরত্বের প্রশংসা থাকাতে এককালে তাঁহার কবিতা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আবৃত্তি করা হইত। বাংলা কবিতার মধ্যে যে অশ্লীলতা ও অভব্যতার দোষ ছিল, রঙ্গলালই তাহা প্রথম মার্জ্জনা করিয়া সুরুচিসঙ্গত শুচি কাব্য রচনার পথ প্রদর্শন করেন। ১৮৮৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

[বঙ্গভাষাব লেখক ; সুবল মিত্রের অভিধান ; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন ইত্যাদি]।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৮৪৩—?)—

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ১৮৪৩ সালে চব্বিশ পরগনার নৈহাটি ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। রঙ্গলালের মধ্যম সহোদর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোক্‌লা দিগম্বর, ময়না কোথায়, ইত্যাদি বহু পুস্তক লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হন। রঙ্গলাল-বাবুও

অনেক কবিতা, ছড়া, গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই-সব গান গাহিয়া খুব মজ্‌লিশ জমাইতে পারিতেন, এবং তিনি সমস্যা পূরণেও দক্ষ ছিলেন। ইনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এবং নানা স্থানে শিক্ষকতা ও অন্যান্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহার কবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে কাব্য-রত্নাকর উপাধি দান করেন। একবার ভূকৈলাসের রাজার অনুরোধে তিনি একটি গান শুনিয়াই ক্ষণকাল মাত্র চিন্তা না করিয়া যে সুন্দর কবিত্বময় গান গাহিয়া সেই পূর্ব্বশ্রুত গানের উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমরা এই বঙ্গবীণার মধ্যে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। বঙ্গলাল শরৎশশী, বিজ্ঞান-দর্শক, চিত্ত-চৈতন্য-উদয়, বৈরাগ্য, বিপিন-বিহার প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু রঙ্গলালের প্রধান কীর্ত্তি বিশ্বকোষ নামক প্রকাণ্ড অভিধান গ্রন্থ প্রকাশ। তিনি ইহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা পরে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সমাপ্ত করিয়াছেন, তথাপি প্রবর্ত্তক বলিয়া রঙ্গলাল-বাবুর নাম চিরকাল বিশ্বকোষের সহিত সংযুক্ত থাকিবে ও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাহার মৃত্যুর তারিখ জানিতে পারি নাই।

[বঙ্গভাষার লেখক]

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০)—

রজনীকান্ত সেন বাংলা ১২৭২ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গুরুপ্রসাদ সেন। রজনীকান্তের পিতা গান গাহিতে ও গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। গুরুপ্রসাদ কয়েকখানি গানের বই রচনা করেন। রজনীকান্তেরও বাল্যকাল হইতেই গান গাহিবার ও গান

রচনা করিবার শক্তি প্রকাশ পায়। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও খুব প্রখর ছিল। নাটক অভিনয়ের প্রতিও রজনীকান্তের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি সমস্যা পূরণ করিয়া ও নানা প্রকার রস-রচনা করিয়া লোকের চিত্তবিনোদন করিতেন। তিনি বাল্যাবধি হাস্যরসিক ছিলেন, সেই ক্ষমতা যৌবনে পরিণতি লাভ করে। তিনি বি-এল্ পাস করিয়া রাজসাহীতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সাহিত্যরসিক রজনীকান্ত ওকালতী ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। রাজসাহী হইতে প্রকাশিত 'উৎসাহ' নামক মাসিক পত্রে রজনীকান্তের কবিতা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় এবং তিনি শীঘ্রই বঙ্গদেশে পরিচিত ও যশস্বী হইয়া উঠেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি বহু স্বদেশপ্রেম-উদ্বোধক গান রচনা করিয়া ও গাহিয়া দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ১৩১৬ সালে তিনি কণ্ঠদেশে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহাকে বহুদিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার অর্থাভাবও উপস্থিত হয়। কিন্তু কবি রজনীকান্ত অসহ্য রোগযন্ত্রণা ও অর্থাভাবের ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া যায়, তাঁহার সব কথাই কাগজে লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইত। যে ধৈর্য্যের সহিত তিনি এই সময়কার কষ্টময় জীবন অতিবাহিত করেন ও জীবনবিধাতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, নির্ভর ও বিশ্বাসের যে পরিচয় দেন, তাহা সে সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সেই সময়ে তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, কবি রজনীকান্ত বড় কবি ছিলেন বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি আরও বড় ও মহৎ ছিলেন। তাঁহাকে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া ক্রমাগত কাগজে লিখিয়া দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও সাহিত্য

ইহার পরে তিনি ক্রমাগত বহু বিষয়ে কবিতা, নাটক, নভেল, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি বালক নামে এক মাসিক পত্র ১৮৮৫ সালে প্রকাশ করেন। ১৮৯০ সালে পুনরায় বিলাতে যান। ১৮৯১ সালে বিখ্যাত মাসিক পত্র 'সাধনা' প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হন। ১৯০২ সালে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ১৯০৫ সালে তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৫ সালে ভাণ্ডার নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক হন। ১৯০৯—১৯১০ সালে গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গান রচনা করেন। ১৯১১ সালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক তিনি সম্বর্দ্ধিত ও অভিনন্দিত হন। ১৯১২ সালে তিনি তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেশের বহু পদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি বোলপুরে গিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন ও তাঁহার গৌরবে দেশের গৌরব ও আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

১৯১৪ সালে ভারতবর্ষের বড় লাট লর্ড হার্ডিং তাঁহাকে এশিয়া ভূভাগের কবি-মুকুট বলিয়া সম্মান করেন ও নাইট পদবী দিয়া সার্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি জাপানে ও আমেরিকায় গমন করেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ নিরস্ত্র লোকদিগকে হত্যা করার প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি নিজের সার উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯২০ সালে তিনি সমগ্র ইউরোপ পর্য্যটন করেন ও সর্ব্বত্র অসাধারণ সম্মান লাভ করেন। ১৯২১ সালে ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে দেশের লোকে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। এই বৎসর তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন, ও পর বৎসর শ্রীনিকেতন

প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে তিনি চীন জাপান প্রভৃতি দেশে গমন করেন এবং দক্ষিণ আমেরিকায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। ১৯২৬ সালে ইউরোপে ও ১৯২৭ সালে বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করেন। ১৯২৯ সালে পুনরায় আমেরিকা ও চীন জাপান প্রভৃতি বহু দেশে পর্য্যটন করেন। ১৯৩০ সালে একাদশ বার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হন ও ইউরোপে নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করেন। ১৯৩১ সালে তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার জন্য সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেরা সকল দেশের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আনন্দ ও সম্মান জ্ঞাপন করেন, এবং ভারতবর্ষের ও বিদেশের বহু প্রতিনিধি একত্র হইয়া কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করেন। সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক কবিকে কবিসার্ব্বভৌম উপাধি প্রদত্ত হয়। ১৯৩২ সালে পারস্যের সম্রাটের নিমন্ত্রণে কবিবর আকাশযানে পারস্যে গিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং ভারতবর্ষের ও সমস্ত পৃথিবীর উচ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অন্যতম। তাঁহার প্রতিভা বিচিত্রসৃষ্টিকুশলা, অতুলনীয়া। তাঁহার কাব্য গল্প প্রবন্ধ গান ও নাটক বঙ্গের ঘরে ঘরে পঠিত গীত অভিনীত ও সমাদৃত হয়। তাঁহার কবিতার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, কোন্‌টিকে ত্যাগ করিয়া কোন্‌টিকে গ্রহণ করিব, তাহা এক সমস্যা। নমুনা স্বরূপ আমরা কয়েকটি মাত্র কবিতা এই সংগ্রহে সমগ্র ও আংশিক উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার অসংখ্য কবিতা ও গান ও অন্যান্য রচনার রসাস্বাদ করিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থাবলীর শরণাপন্ন হইতে হইবে।

[রবীন্দ্র-জয়ন্তী বর্ষপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; আমার বোম্বাই-প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্রনাথ —অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী; বাতায়ন—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী; কাব্য-পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী; রক্তকরবীর মর্ম্মকথা—ভোলানাথ সেনগুপ্ত; রবীন্দ্র-প্রতিভা—এক্‌রামউদ্দীন; বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়; পাঁচমিশেলি—অবনীনাথ রায়; গীতাঞ্জলি সমালোচনা—উপেন্দ্রকুমার কর; রবীন্দ্র-সাধনা—শিবকৃষ্ণ দত্ত; রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ—কাজী আব্‌দুল ওদুদ; কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বপতি চৌধুরী; রবীন্দ্রনাথ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ; কাব্য-পরিমিতি—যতীন্দ্রনাথ সেন; বঙ্গভাষার লেখক; জয়ন্তী-উৎসর্গ, কবি-পরিচিতি; কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী—প্রবাসী ১৩১৬, ১৩১৭, ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৮, ১৩২৯।১।৪৬৭, ১৩২৯।১।২১৫, ৩৪২, ৫০৭, ১৩৩০। ২।২৯৩, ১৩৩১, ১৩৩২, ১৩৩৩, ১৩৩৪; বিচিত্রা মাসিক পত্র; হিন্দু পত্রিকা; বঙ্গবাণী ১৩৩১-১৩৩২, ১৩৩২-১৩৩৩; শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৮; সাহিত্য ১৩০৮; ভারতী, প্রবাসী ১৩৩৫, ১৩৩৬; প্রতিভা ১৩১৮, ১৩১৯]। Rabinbranath Tagore—Edward Thompson; Rabindranath—Kumudnath Das; Matthew Arnold, Robert Browning and Rabindranath Tagore—Amulyacharan Aikat; The Golden Book of Tagore; ইত্যাদি]

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫৫—১৮৯৩)—

রাজকৃষ্ণ রায় বর্দ্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর নামক স্থানের লোক ছিলেন। কিন্তু শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া ইনি মাসীর নিকটে প্রতিপালিত হন। শৈশবাবধি ইনি অতিদারিদ্র্যে কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য খোলার ঘরে বাস করিতেন। দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়াও অধিক করিতে পারেন নাই। অল্প বয়সে তিনি জোড়াসাঁকোর কোনো ধনীর বাড়ীতে সামান্য চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। পরে ২১ বৎসর বয়সে তিনি এল্‌বার্ট প্রেসের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। সেখানেও বেশি দিন থাকিতে না পারিয়া তিনি মেছুয়া-বাজারে নিজেই বীণা প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই প্রেস হইতে বীণা নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শৈশবাবধি তাঁহার কবিত্বশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল, তিনি বীণা পত্রিকায় ও এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হন; কিন্তু তাঁহার চিরসহচর দারিদ্র্য আর কিছুতেই ঘুচিল না। বাংলা ১২৮১ সাল হইতে তিনি নানা বিষয়ে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কেবল কবিতায় অন্নাভাব ঘুচে না দেখিয়া তিনি উপন্যাস ও নাটক রচনাতেও মন দেন। তাঁহার অবসর-সরোজিনী নামে দুই খণ্ড কবিতা সংগ্রহ, প্রহ্লাদচরিত্র, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি নাটক, হিরণ্ময়ী কিরণময়ী নামক উপন্যাস, এবং ঘোড়ার ডিম, কুপোকাত, ষোল বছুরে পেত্নী প্রভৃতি রঙ্গরচনা এককালে বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার নাটক প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইত। কিন্তু সেই থিয়েটারের কর্ত্তাদের কার্পণ্য দেখিয়া কবি নিজে বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহাতে সাধারণী স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে বালকদিগকে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করাইবার চেষ্টা করেন। এই

থিয়েটার করিয়া কবি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। পুস্তকবিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কবির দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া কবিকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন। বহু নাটক রচনা ব্যতীত রাজকৃষ্ণ মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত অবিকল পদ্যে অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অমিত্র ছন্দকে ভাব ও বিরাম অনুযায়ী ভাঙিয়া অসম ছন্দ রচনার পথপ্রদর্শক এই রাজকৃষ্ণ রায়। পরে গিরিশ ঘোষ তাঁহার নাটকে উহা বহুল ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা রচনার শক্তি অসাধারণ রকম ক্ষিপ্র ছিল, তিনি অনর্গল কবিতা রচনা করিয়া বলিয়া যাইতেন, দুজন লোকে তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিত না। ইঁহার অনেকগুলি নাটক বহু দিন খুব সমাদর লাভ করিয়াছে। শেষ কালে ইঁহার অবস্থা এমন খারাপ হইয়াছিল যে, ইঁহাকে বহু ধনীর নিকট ভিক্ষা করিতেও হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সামান্য সাহায্যই পাইয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

[বঙ্গভাষার লেখক ; সুবল মিত্রের অভিধান ; প্রদীপ—১৩০৯-১০; ইত্যাদি]।

রাধামোহন ঠাকুর (১৬৮৮ ?—১৭৬৮ ?)—

যতগুলি পদসংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পদামৃত-সমুদ্র অন্যতম। রাধামোহন ঠাকুর ইহার সংগ্রহকর্ত্তা। রাধামোহন ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ, গতিগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র জগদানন্দ, এবং জগদানন্দের পুত্র ও শিষ্য রাধামোহন। সুতরাং রাধামোহন শ্রীনিবাস আচার্য্যের

বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিলেন। তিনি কুঞ্জঘাটার বিখ্যাত জমিদার মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম ১৫৪৫ কিংবা ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে। প্রত্যেক পুরুষে ২৫ বৎসরের ব্যবধান ধরিলে রাধামোহনের জন্ম ১৬৯৮ সালের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয় ১৭৭৫ সালে। অতএব রাধামোহন ১৮ শতকের প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বাংলা ১১২৫ সালে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে এক তর্কসভায় রাধামোহন ঠাকুর পরকীয়াবাদ সমর্থন করিয়া জয়ী হন, এবং এক জয়পত্র পান। সেই দলিল মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে রেজেষ্টারীভুক্ত করা হয়। প্রবাদ যে, সেই সময় রাধামোহন ঠাকুরের বয়স ৩০ বৎসর ছিল। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুরের জন্ম-তারিখ দেওয়া হইয়াছে বাংলা ১০৯৫ সাল বা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ, এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১১৭৫ সালে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই তারিখ যে কি করিয়া নির্ণীত হইল, তাহার কোনও প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। রাধামোহন সঙ্গীতদক্ষ ছিলেন। তিনি পদাবলী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া পালার পোষক পদ অন্য কবির না পাইলে মধ্যে মধ্যে নিজেই রচনা করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পদসংখ্যা হইয়াছে ২২৮। তিনি কতকগুলি সংস্কৃত পদও রচনা করেন; তাহাতে জয়দেবের অনুকরণ সুস্পষ্ট। রাধামোহন যে-পরিমাণে পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ছিলেন, সে পরিমাণে কবিত্বশক্তি তাঁহার ছিল না। তবে তাঁহার পদামৃতসমুদ্র ও তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত টীকাই তাঁহাকে বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে।

[পদকল্পতরু ৫ম ভাগ; অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: বঙ্গভাষার লেখক]

রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১—১৮২৮)—

রামনিধি গুপ্ত নিধু-বাবু নামে অধিক পরিচিত। তাঁহার জন্ম হয় ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার চাপতা গ্রামে। তিনি প্রেমগীতি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পদাবলী-রচয়িতারাও প্রেমগীতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্তই রাধা-কৃষ্ণের বেনামী। রামনিধি গুপ্ত প্রথম উপলব্ধি করেন যে—

"এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।"

নিধু-বাবু সাধারণ মানব-মানবীর মিলন-বিরহ, অনুরাগ-সোহাগ লইয়া গান লিখিয়া প্রকৃত গীতি-কবিতার পথ প্রদর্শন করেন। নিধু-বাবুর টপ্পার সুর ব্যতীত কেবল কথায় তাহার সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। তথাপি তাঁহার রচনার মধ্যে কবিত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আন্তরিকতা এমন আছে, যাহাতে কেবল কথা পড়িয়াও তাহাদের মূল্য যে কত উচ্চ, তাহা অনুমান করিতে কোনও ক্লেশ হয় না। প্রণয়-সঙ্গীত ছাড়াও তিনি অন্য বিষয়েরও গান রচনা করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি সম্মান-সূচক যে গীতটি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গান। তিনি ছাপরায় কেরানী ছিলেন। সেইখানে তাঁহার আবাল্যের সঙ্গীতপ্রিয়তা ওস্তাদদের নিকট শিক্ষা পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গীত রচনায় প্ররোচনা যোগাইয়াছিল। তিনি তিন বিবাহ করেন। চৈত্র ১৮৩৯ সালের ৬ই এপ্রেল ৯৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[বঙ্গভাষার লেখক; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব; সুবল মিত্রের অভিধান; History of Bengali Literature—

Dr. S. K. De; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-১৩২৪; Friend of India of 11th April, 1839]

রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩ ?—১৭৬২ বা ১৭৭৫ ?)—

রামপ্রসাদ সেন আনুমানিক বাংলা ১১২৯ সালে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগনার অন্তর্গত কুমারহট্ট বা হালিসহর গ্রামে গঙ্গাতীরে বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে তাঁহার বংশ-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার পিতামহের নাম ছিল রামেশ্বর সেন, পিতার নাম রামরাম সেন। তাঁহার পিতার দুই বিবাহ ছিল; রামপ্রসাদ দ্বিতীয়ার পুত্র। রামপ্রসাদ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ও সহোদর ভ্রাতা ও সহোদরা ভগিনী ও ভগিনীপতি, ভাগিনেয় ও নিজের পুত্র-কন্যাদেরও নাম ধাম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ শাক্ত বংশে জন্মলাভ করিয়া নিজেও শক্তি-উপাসক ছিলেন। রামপ্রসাদ বাল্যকালে পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, এবং পরে এক মৌলবীর কাছে ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে, তিনি কলিকাতায় তাঁহার ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সাহায্যে একটি চাকরী সংগ্রহ করেন। কিন্তু রামপ্রসাদ সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যের রস আস্বাদন করিয়া যেমন কাব্যানুরাগী হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মপিপাসুও হইয়াছিলেন। তিনি মনিবের হিসাবের খাতায় গান রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী মনিবের নিকট রামপ্রসাদের নামে নালিশ করিলেন। তাঁহার মনিব তাঁহার কবিত্বশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে মাসিক ৩০ টাকা মাসহারা দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ীতে গিয়া কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিতে

অনুরোধ করিলেন। রামপ্রসাদ কুমারহট্টে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন এবং আকণ্ঠ জলে মগ্ন করিয়া ভক্তিভরে কালীর ভজন গান করিতেন। একদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা বজরায় করিয়া গঙ্গা দিয়া যাইতে যাইতে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে নৌকায় উঠিয়া গান গাহিতে অনুরোধ করেন। রামপ্রসাদ নবাব বাহাদুরকে উর্দ্দু গান শুনাইতে আরম্ভ করিলে, নবাব বাধা দিয়া তাঁহাকে বলেন, তিনি জলে দাড়াইয়া যে গান গাহিতেছিলেন সেই গান করুন। নবাব সেই শ্যামাবিষয়ক রামপ্রসাদী সুরের গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া রামপ্রসাদকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। পরে একদিন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐরূপ নৌকায় যাইতে যাইতে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজসভায় লইয়া যান এবং এক কাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুযায়ী রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্য, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি ও ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি উপহার দেন। রামপ্রসাদ ভক্ত সাধক ও প্রকৃত কবি ছিলেন, তাই তাঁহার দ্বারা ফরমায়েসী আদিরসপ্রধান বিদ্যাসুন্দর কাব্য তেমন সুরচিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গানগুলি তাঁহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত বলিয়া সেগুলি অতুলনীয় হইয়াছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের পরে প্রকৃত গীতিকবিতার অভাব হইয়া পড়িয়াছিল; রামপ্রসাদ তাহা আবার সঞ্জীবিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে রসধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিলেন। এইজন্য বঙ্গবাসী রামপ্রসাদের নিকট ঋণী। রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের তুলনায় বিদ্যাসুন্দর রচনায় খাটো হইলেও তাহাতে নানা ছন্দ যমক অনুপ্রাস ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগে

ও কবিত্ব প্রকাশে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রামপ্রসাদের গানের লালিকা বা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ করিয়া তাঁহার গ্রামবাসী বৈষ্ণব কবি আজুগোঁসাই আজও অমর হইয়া আছেন। রামপ্রসাদের মৃত্যু হয় কালীর ভজন গাহিতে গাহিতে গঙ্গায় এক গলা জলে দাঁড়াইয়া। তাঁহার মৃত্যুর স্থির তারিখ জানা যায় না।

[রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; বঙ্গভাষার লেখক ; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন ; বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব ; রামপ্রসাদ ও রামদুলাল —প্রতিভা ১৩৩০ কার্ত্তিক-পৌষ ; প্রদীপ—১৩০৯-১০ ; ভারতবর্ষ—১৩৩৫ বৈশাখ ; সুবল মিত্রের অভিধান]

রাম বসু (১৭৮৭—১৮২৯)—

রামচন্দ্র বসু হাবড়ার নিকটে শালিখা গ্রামে বাংলা ১১৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল, এবং তখনই তাঁহার কবিত্ব ও রচনাশক্তির বিকাশ হইয়াছিল। তিনি পাঠশালায় বসিয়া কলাপাতে গান লিখিতেন ও ফেলিয়া দিতেন। এইরূপ কয়েকটি গান একদিন কবিওয়ালা ভবানী বেনে কুড়াইয়া পান এবং গানগুলি পড়িয়া রাম বসুর রচনাশক্তি দেখিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করেন। সেই সময় হইতে রাম বসু ভবানীর কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করেন। নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির দলেও রাম বসু অনেক গান বাঁধিয়া দেন। শেষে নিজেই কবির দল সংগঠন করেন। রাম বসু বিরহ বর্ণনায় ওস্তাদ কবি ছিলেন। কবির লড়াইয়ের চাপান ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের লহর রচনাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার গানগুলি সরল ভাষায় প্রাণের কথা দিয়া লেখা।

এক কালে সর্ব্বত্র তাঁহার গানের খুব সমাদর ছিল। একবার কাশিম-বাজারের রাজবাড়ীতে কবি গাহিতে গিয়া তিনি পীড়িত হন, এবং সেই পীড়াতেই বাংলা ১২৩৬ সালে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাম বসুই কবির লড়াই অর্থাৎ আসরে বসিয়া গানেই প্রশ্ন ও উত্তর-প্রত্যুত্তর দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার কবিত্বশক্তির সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু।"

[বঙ্গের কবিতা; বঙ্গভাষার লেখক; History of Bengali Literature in the 19th Century—Dr. S. K. De]

রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩)—

রামমোহন রায় হুগলী জেলার অধীন রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের প্রপিতামহ নবাব-সরকারে কার্য্য করিয়া রায় উপাধি লাভ করেন। রামমোহনের পিতৃবংশ বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়াসক্ত ছিলেন, আর তাঁহার মাতৃবংশ ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। এই দুই গুণের সমন্বয় হইয়াছিল রামমোহনের মধ্যে। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপিপাসু হইয়া সত্যধর্ম্মের অন্বেষণে নিযুক্ত হন। পিতৃবংশের ধারা অনুসারে তিনি ফার্সী আরবী ভাষা শিক্ষা করেন, এবং মাতামহ-বংশের ধারা অনুসারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া তিনি আমাদের দেশের সত্য ধর্ম্মের পরিচয় লাভ করেন, এবং মাত্র ১৬ বৎসর বয়সেই প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে তাঁহার পিতা সামাজিকদিগের ভয়ে পুত্রের প্রতি বিরক্ত হন।

পিতার সহিত মতান্তর উপস্থিত হইলে রামমোহন গৃহ ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হন।

পিতার আহ্বানে আবার তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে গৃহবাসী করিবার জন্য তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হইল। এই সময়ে রামমোহন ইউবোপীয় জ্ঞান ধর্ম্ম আই। রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার লইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত রামমোহনেব প্রায়ই তর্কবিতর্ক হইতে থাকে। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে রামমোহনের পিতা আবার পুত্রকে ত্যাগ করেন। অল্পদিন পরে রামমোহনের পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে রামমোহন ইংরেজ গভর্মেণ্টের অধীনে কেরানীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন ও নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষ্যে রংপুরে গিয়া তিনি প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন। ১৮১৪ সালে তিনি সরকারী চাকরী ত্যাগ করেন, এবং রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রচারে উত্তম দেখিয়া তাঁহার মাতা আবার তাঁহাকে গৃহ হইতে সস্ত্রীক বিতাড়িত করেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বঙ্গদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার সাহায্যে বহু পুস্তক প্রকাশ করেন, নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জ্ঞান বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া দেশের লোককে মানুষ করিবার চেষ্টা করেন, এবং স্থানে স্থানে বিতর্ক-সভা স্থাপন করিয়া সত্য নির্ণয়ে লোকের যাহাতে অনুরাগ হয়, তাহার চেষ্টা করেন। এই সময়ে রামমোহন একাকী ব্রাহ্মণপণ্ডিত পাদ্রী মৌলবীদের সহিত বিচার করিয়া নিজের সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত সত্য ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমত স্থাপন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন। ১৮১৫ সালে তিনি আত্মীয়-সভা ও ১৮২৮ সালে উপাসনা-সভা স্থাপন করেন। ১৮২৯ সালের ১১ই মাঘ তারিখে এই উপাসনা-সভা চিৎপুর রোডে তাঁহার নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই তারিখে এখনও ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা উৎসব করিয়া সেই দিনটিকে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই উপাসনা-সভা এখন ব্রাহ্ম-সমাজ বা ব্রহ্মোপাসনা-মন্দির নামে পরিচিত হইয়াছে। এই সালেই রামমোহন দেশের পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কবিচার করিয়া সতীদাহের কুপ্রথার কুফল দেখাইতে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন, এবং অবশেষে দেশের লোকের সমর্থন না পাইয়া গভর্মেণ্টের সাহায্যে আইন করিয়া এই কুপ্রথা বন্ধ করিয়া দেন। রামমোহন বহুবিবাহ বন্ধ করিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা ও আন্দোলন করেন। হিন্দু নারীর দায়াধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতিভেদ উচ্ছেদ, কন্যাপণ নিবারণ, বিধবাবিবাহ, শিক্ষা বিস্তার, সংবাদপত্র প্রকাশ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ, দেশে ন্যায়সঙ্গত আইন ও ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন, সর্ব্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহনের ঐকান্তিক চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়াছিল। রামমোহন সর্ব্ব বিষয়ে জাগ্রত ও অগ্রসর লোক ছিলেন, এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব। তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও অগ্রগতির পথপ্রদর্শক নেতা ছিলেন। রামমোহন বাংলা ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তিনিই বাংলা গদ্য রচনার পথপ্রদর্শক, তিনিই বাংলায় প্রবন্ধ লিখিয়া শাশ্বত ধর্ম্মমত প্রচার করেন ও নানাসম্প্রদায়ের গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের সহিত তর্ক ও বিচার করেন, এবং ইহারই ফলে বাংলায় প্রথম গদ্য রচনা প্রবর্ত্তিত হয়। বাংলা গদ্যে তিনিই প্রথম কমা প্রভৃতি অর্দ্ধচ্ছেদের চিহ্ন ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন।

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম বিলাতে গমন করেন। বিলাত যাইবার কারণ সম্বন্ধে রামমোহন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন।" এই কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া বাদশাহ ১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসে রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহাকে নিজের দূত নিযুক্ত করেন। রাজর্ষি রামমোহন তাঁহার মনীষা ও বিশ্বহিতৈষণার জন্য ইউরোপে অনেক দেশে সম্মানিত হন। ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে গমন করেন। এই বৎসর ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিষ্টল নগরে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। সেই স্থানেই তাঁহার দেহ সমাহিত আছে। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়া রাজার দেহ উত্তম স্থানে সমাধিস্থ করাইয়া তাহার উপর একটি মর্ম্মরপ্রস্তরের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় কতকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির অধিকাংশই দেহতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয়। আমরা যে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেটি তিনি বিলাত যাইবার সময় জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রের বিশালতা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন।

[আর্য্যদর্শন—১২৮৫ ; বসুমতী—১৩৩৪,৩৫ ; চারিত্র-পূজা—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; বঙ্গভাষার লেখক ; সুবল মিত্রের অভিধান ; প্রবাসী—১৩২৯।২।৪৫৭, ৬০৪ ; প্রবাসী—১৩৩৩।২।৪৭৬, ১৩৩৪।২।৩৪৫, ৫৪২ ; বঙ্গবাণী —১৩২৯-৩০, বঙ্গদর্শন—১৩১১, ১৩১৫ ; সাহিত্য—১৩০৬ ; প্রবাসী—১৩৩৫।১।৮০৮, ৮৩৯ , প্রবাসী—১৩৩৬।২।৫১, ইত্যাদি ; Raja Rammohan Ray by Amal Home]

রামাই পণ্ডিত (১২ শতক)—

ব্রাহ্মণ বংশে হিমালয়-মধ্যে বৈশাখীয় শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে ভরণী নক্ষত্রে রবিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মুসলমান বিজয়ের পরবর্ত্তী কালের লোক বোধ হয়, কারণ তাঁহার রচনায় অনেক ফার্সী আরবী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে দেখা যায়। পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি হইতে বোধ হয় রামাই পণ্ডিত রাজা লাউসেনের সমসাময়িক। এই লাউসেন বোধ হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি বঙ্গে ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তনের একজন আদি পুরোহিত। এই ধর্ম্মঠাকুর বুদ্ধদেবের রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র।

[শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণ ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য]

রামানন্দ রায় (?—১৫৩৪)—

রামানন্দ রায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিদ্যানগরম্ বা বিজয়নগরম্ নগরে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায়ও রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু কোন্ রাজার কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধি ছিলেন, তাহা জানা যায় না। বোধ হয় পুরীর

রাজারই কর্ম্মচারী ছিলেন। রামানন্দ রায়ের এক ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মচারী ছিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ক একবার রাজস্ব আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিবার অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপক্রম হইলে চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন। রামানন্দ রায়ের সহিত চৈতন্যদেবের গোদাবরী নদীর তীরে সাক্ষাৎ ও তত্ত্বালোচনা হয়, এবং চৈতন্যদেব রামানন্দ রায়ের পাণ্ডিত্য ও ভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। রামানন্দ রায়ও চৈতন্যদেবের প্রভাবে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত নীলাচলে অর্থাৎ জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া বাস করেন। রামানন্দ রায়ের রচিত ব্রজবুলির একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে, কিছু সংস্কৃত পদও আছে। রামরায় নামে একজন পদকর্ত্তার কয়েকটি বাংলা পদ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি এই রামানন্দ রায়ের না হওয়াই অধিক সম্ভব, কারণ, মাদ্রাজী রামানন্দ রায় যে বাংলা শিখিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। রামানন্দ রায়ের সাধ্যসাধনতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া যে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৫৩৪ খৃঃ মাঘ মাসে তাঁহার তিরোধান হয়।

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ, পদকল্পতরু ৫ম ভাগ, সাহিত্য পরিষৎ-সংস্করণ ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২৬৮ পৃঃ ইত্যাদি]

রামী (১৪০০ ?)—

রামমণি বা রামতারা জাতিতে রজকিনী ছিলেন। চণ্ডীদাসের পিতা নান্নর গ্রামে বাশুলী দেবীর পূজারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু

হইলে চণ্ডীদাস দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। সেই সময়ে দেবীব মন্দিরের পরিচারিকা ছিলেন রামমণি বা তারা ধুবনী। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহাকে নিজের সহজ সাধনার নায়িকা রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রেম সম্বন্ধে চণ্ডীদাস নিজে বলিয়া গিয়াছেন—

বজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ,
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম, নিকষিত-হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

* * *

তুমি বজকিনী আমাব বমণী,
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।

কিন্তু লোকে তো তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহাবা চণ্ডীদাসকে রজকিনীর সংসর্গে কলঙ্কিত মনে করিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করে। চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল ভাইকে জাতিতে উঠাইয়া লইবার জন্য সমাজপতিদেব তোষামোদ কবিয়া এক ভোজের আয়োজন করেন। চণ্ডীদাস ছাড়িয়া যাইবেন আশঙ্কা করিয়া রামী অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিচলিত হইয়া ভোজের সময় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাকে দেখিয়া চণ্ডীদাসের জাতিতে উঠিবার সঙ্কল্প দূর হইয়া যায়। বজকিনী রামী মহাকবি চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিত্বের মূল উৎস ছিলেন। তাঁহাব যে কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে তাহা চণ্ডীদসোর প্রণয়িনীর অনুপযুক্ত নহে। রামী আদি মহিলা কবি বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে একটি গৌববের আসন অধিকার করিয়া আছেন।

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; বঙ্গের কবিতা]

রাস্থ—নৃসিংহ (১৭৩৪—১৮০৭)—

রাস্থ ও নৃসিংহ দুই ভাই ছিলেন। ইঁহারা কবির দল করিয়া যে-সব গান বাঁধিতেন, তাহা ঐ যুগল ভণিতা দিয়াই গাহিতেন। সেই জন্য এখন স্থির করা দুরূহ যে, কোন্ গানটি রাস্থর রচিত, আর কোন্‌টি নৃসিংহের। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এক ভাই গানের কথা বাঁধিতেন, আর এক ভাই তাহাতে সুর যোজনা করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, "উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই।" কবিওয়ালাদের অনেকেরই জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কিন্তু রাস্থ-নৃসিংহ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ জানা গিয়াছে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১১৪১ সালে ফরাসী চন্দননগরের সন্নিকটে গোঁদলপাড়া গ্রামে কায়স্থবংশে রাস্থর জন্ম হয়, এবং নৃসিংহের জন্ম হয় ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে। ইঁহাদের পিতা অনাদিনাথ রায় ফরাসী মিলিটারী দপ্তরে কেরানী ছিলেন, তাহাতেই তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর এই দুই সহোদর রঘুনাথ কবিওয়ালার দলে গিয়া ভর্ত্তি হন, এবং সেখানে কবি গাওয়ার ধরণ শিক্ষা করিয়া নিজেরাই স্বতন্ত্র দল করেন। ফরাসী গভর্মেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ইঁহাদের উৎসাহ দিতেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রাস্থর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ আরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের রচিত অতি অল্প-সংখ্যক গানই এখন পাওয়া যায়।

[History of the Bengali Literature in the Nineteenth Century—Dr. Susilkumar De]

লালন ফকির (১৯ শতক)—

লালনচন্দ্র রায় নদীয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত ভাঁড়ারা

নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, আবার কেহ বলেন ব্রাহ্মণ ছিলেন। লালন ছেলেবেলা হইতেই ধর্ম্ম-পিপাসু ছিলেন। বিবাহের পর তিনি তাঁহার মাতার সহিত নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান কবিতে যান, ও সেখানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তিনি মরণাপন্ন হইলে তাঁহাব মাতা লোকের পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে অর্দ্ধগঙ্গা করিয়া অন্তর্জলী করেন ও তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় গঙ্গাতীরে ত্যাগ কবিয়া আসেন। তিন দিন পরে লালনের চেতনা হয়, জল-পিপাসা প্রবল হয়। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, একজন মুসলমান স্ত্রীলোক নদী হইতে জল লইয়া যাইতেছেন। লালন তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার কাছে জল প্রার্থনা করেন। স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে জল পান তো করাইলেনই, অধিকন্তু দয়াপরবশ হইয়া লালনকে নিজের বাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যান এবং তিনি ও তাঁহাব স্বামী উভয়ে মিলিয়া লালনের সেবাশুশ্রূষা করিয়া লালনকে রোগমুক্ত করেন। সেই মুসলমান দম্পতীব কোনো সন্তানাদি ছিল না এবং সেই মুসলমান পুরুষটি একজন ধর্ম্মপরায়ণ ফকির ছিলেন। লালন ঐ ফকিরের নিকট মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে লালন গুরুব অনুমতি লইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন কবেন ও স্বীয পত্নীকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইতে আহ্বান করেন। কিন্তু লালনের স্ত্রী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে লালন দেশভ্রমণে বহির্গত হন ও একজন গুরু অনুসন্ধান করিতে থাকেন। অনেক সন্ধান করার পর লালন কুমার-খালি শহরের নিকটবর্ত্তী হরিনারায়ণপুর-গ্রামবাসী সেরাজ সাঁই নামক এক ফকিরের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী ছেঁওড়িয়া গ্রামের গভীর বনের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া এক আমগাছের তলায় সাধনা আরম্ভ করেন। তিনি নির্জ্জনে সাধনা করিতেন, লোকালয়ে বাহির হইতেন না। দিনান্তে বনের কচু খাইয়া প্রাণধারণ করিতেন। পরে গ্রামের লোকেরা তাঁহার সন্ধান পায় ও তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার জন্য একটি আখড়া তৈয়ার করিয়া দেয়। লালন নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বরতত্ত্বে মগ্ন থাকিতেন এবং নানা প্রকারের আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গান রচনা করিতেন। পরে ইনি যশোহরের হরিশপুরের খন্দকার বংশের কন্যা বিশোকাকে বিবাহ করেন। ইহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। ইনি শাশ্বত সার্ব্বজনীন সত্যধর্ম্মের উপাসক ছিলেন, এজন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার শিষ্য হইত। গোঁড়া কোনও সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিত না। কয়েক বৎসর হইল, লালন ফকিরের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার কতকগুলি গান সরলা দেবী সংগ্রহ করিয়া ভারতী পত্রিকায় ছাপেন, ও কতকগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহ করিয়া প্রবাসীতে ও শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁহার গান আরও অন্য লোকেও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিযাছেন। এই-সব ফকিরের গান বুঝিতে হইলে বাউল সম্প্রদায়ের মর্ম্মকথা বুঝিতে হয়। অতএব বাউলদের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

[প্রবাসী ১৩৩২, শ্রাবণ; বঙ্গবাণী ১৩৩৩, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ; হারামণি—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন]

শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭৩—১৯২৮)—

কবির পিতার নাম ব্রজমোহন সেন। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য। ইঁহাদের নিবাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাট গ্রামে। কবির জন্ম ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে এবং মৃত্যু হয় ১৯২৮ সালের ১৬ই এপ্রেল। ইনি

বি এল পরীক্ষা পাস করিয়া চট্টগ্রামেই ওকালতী করিতেন। কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি, সমালোচনায় নিপুণতা ও সাহিত্য-প্রতিভা দেখিয়া সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁহার প্রকাশিত কাব্য, নাটক, সমালোচনা প্রভৃতি ভিন্ন তাঁহার অনেকগুলি অপ্রকাশিত রচনা আছে। বিশ্বামিত্র নামক একখানি নাট্য-কাব্য চট্টগ্রামের অঞ্জলি নামক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকাবলীর নাম শৈলসঙ্গীত, সিন্ধুসঙ্গীত, সাবিত্রী, বিমানিকা, বঙ্গবাণী, বিশ্ববাণী, মধুসূদন।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)—

পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৪৭ সালে তাঁহার মাতুলালয় চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে কলিকাতার নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃভবন চব্বিশ পরগনার মজিলপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য্য। শিবনাথ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের সুপণ্ডিত সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতুল-বংশও পণ্ডিতের বংশ। শিবনাথের মাতুল ছিলেন খ্যাতনামা সোমপ্রকাশ-পত্রের খ্যাতনামা সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। শিবনাথের পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে স্ত্রীপুরুষ সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। শিবনাথ তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পূরা মাত্রাতেই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কিশোর বয়সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বসংস্কারবিমুক্ত ভাব দেখিয়া সেই ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৬৯ সালে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। ১৮৭২ সালে শিবনাথ সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতসাহিত্যে এম-এ পাস করিয়া শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বাংলা দেশের সকল প্রকার মঙ্গল কর্ম্মের সহিত শিবনাথ সংযুক্ত হইয়া

রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও ধার্ম্মিক সংস্কার করিবার চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। এই সময় হইতেই শিবনাথের কবিতা লেখা আরম্ভ হয়, এবং মাত্র সতেরো বৎসর বয়সেই তিনি "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" নামে এক খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইহা বঙ্গভাষায় একখানি অতি উৎকৃষ্ট সদ্‌ভাবপূর্ণ খণ্ডকাব্য। ১৮৭৬ সালে তাঁহার দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক "পুষ্পমালা" প্রকাশিত হয়। এখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কবিতার সমষ্টি। ১৮৮৬ সালে "হিমাদ্রিকুসুম" নামে অপর একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার পরে "পুষ্পাঞ্জলি" এবং বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর ১৮৮৯ সালে "ছায়াময়ী-পরিণয়" নামে তাঁহার শেষ কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয়। শিবনাথের কবিতায় স্বদেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মভাব, লোকহিতৈষণা ও ঈশ্বরপ্রেম দেখা যায়। শিবনাথ সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়াতে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি প্রতিভার অনুরূপ উৎকৃষ্ট হইতে পায় নাই। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—শাস্ত্রী মহাশয় অতুল ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ কিছু দান করিলেন না। শিবনাথ যেমন একদিকে গভীর বিষয়ে চিন্তাশীল তত্ত্বকথা লইয়া কবিতা রচনা করিতেন, অপর দিকে আবার ছোট শিশুদের উপযোগী হাস্য-রসের কবিতাও রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "কাজের ছেলে" নামক শিশুরঞ্জন কবিতাটি বঙ্গভাষায় সুপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ১৯১৯ সালে ঈশ্বরভক্ত শিবনাথ ভগবানের নাম ও প্রেম স্মরণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

[আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত—হেমলতা দেবী ; ইত্যাদি]

শেখর (১৭০০—?)—

শেখর ভণিতায় রচিত পদ যে কাহার, তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। শেখর নাম চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, কবিশেখর, রায়শেখর নামক কবিদের কাহারও নাম-সংক্ষেপ। পদাবলী-সাহিত্যের জহুরী সতীশ রায় মহাশয় শেখরকে রায়শেখর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। রায়শেখর আবার কবিশেখর ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। শেখর দাস, কবি-নৃপ শেখর (অর্থাৎ শেখর কবিরাজ), কবিশেখর রায় প্রভৃতি বহুবিধ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। রায়শেখর সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্যজাতীয় নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য ঠাকুরদের অনেক শিষ্য ব্রাহ্মণও আছেন। তাহাতে স্থির করিয়া বলা যায় না যে, রায়শেখর বৈদ্য অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি নিজে কবি-নৃপ বলাতে তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই অনুমান হয়। রায়শেখর বিদ্যাপতির অনুকরণে ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ ছিল। রায়শেখর বিদ্যাপতির অনুকরণে যে ব্রজবুলির প্রবর্ত্তন করেন, তাহা শক্তিশালী কবি গোবিন্দদাসের হাতে পড়িয়া যথেষ্ট মার্জ্জিত ও মধুর হইয়াছিল। তথাপি রায়শেখরের উদ্যম প্রশংসনীয়।

[পদকল্পতরু ৫ম ভাগ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী; বঙ্গভাষার লেখক]

শ্রীধর কথক (১৮১৬—?)—

বাংলা ১২২৩ সালে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম পণ্ডিত রতনকৃষ্ণ শিরোমণি। ইঁহার পিতামহ

লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ একজন প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। শ্রীধরের বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে ও কবিতায় অনুরাগ ছিল। যৌবনে ইনি সঙ্গীদের লইয়া পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। ইহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভর্ৎসনা করায় শ্রীধর তাঁহার বন্ধুর সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কাজ তাঁহার ভালো লাগিল না। বহরমপুরের কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট তিনি কথকতা শিক্ষা করেন। এই শিক্ষার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠ ও সুগৌর সুশ্রী চেহারা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে অল্পদিনের মধ্যেই লোকের নিকট সমাদৃত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি কথকতার জন্য নানা ভাবের ও নানা সুরের গান রচনা করিতেন। সেই-সব গান এমন সুন্দর যে, সেকালে অনেকে তাহা নিধু বাবু বা রাম বসুর গান বলিয়া ভুল করিত।

[শ্রীধর-সঙ্গীত—বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত; সুবল মিত্রের অভিধান]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)—

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহাদের পিতার নাম যাদবচন্দ্র। যাদবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার পুত্রদের শিক্ষা নানা স্থানে হয়। সঞ্জীবচন্দ্র কোনো পরীক্ষায় কোনো উপাধি না পাইলেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি ইংরেজীতে 'বেঙ্গল রায়ত' নামে একখানি বই লিখেন এবং সেই বইখানি লেফ্‌টেনাণ্ট্ গভর্ণারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহাতে তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। কার্য্য উপলক্ষে তাঁহাকে একবার পালামৌ যাইতে হয়। সেই সূত্রে তিনি 'পালামৌ ভ্রমণ' নামে একখানি বই লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া পড়েন। ইঁহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ছিল, এবং তাহার ফলে তিনি প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য ও মানুষের স্বভাবের বিশেষত্ব নিপুণ ভাবে দেখিয়া সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে বিভাগীয় দুইটি পরীক্ষা দিয়া কর্ম্মের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইত। পরীক্ষায় পাস করা সঞ্জীবচন্দ্রের ধাতে ছিল না, তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। পরে তিনি সাব-রেজিষ্ট্রার হইয়া কিছুদিন কার্য্য করেন। কিন্তু তাহাতেও যশোহরের কালেক্টারের সহিত মতের অনৈক্য হওয়াতে তাঁহাকে পদ ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর তিনি 'ভ্রমর' নামক এক মাসিক পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু সেই পত্র শীঘ্রই উঠিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্র প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দিলে সঞ্জীবচন্দ্র উহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন ও উহার সম্পাদক হন। বাংলা ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন। ইঁহারই সম্পাদনের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস ও অন্যান্য অনেক লেখা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। আর সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা' ও 'কণ্ঠমালা' নামক দুখানি উপন্যাস, এবং বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদের তিরোধানের পর একজন জাল প্রতাপচাঁদের আবির্ভাব লইয়া সেকালে যে আন্দোলন ও মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার ইতিহাস লইয়া তিনি 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইঁহার ভাষা অতি মধুর, বর্ণনাশক্তি মনোহারী, এবং রচনা-সৌন্দর্য্য দ্বারা বিভূষিত। ইনিও ভ্রাতার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। তাঁহার কবিতা অধিক নাই, উপন্যাসের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও কয়েকটি গান সন্নিবেশিত করিয়া কবিত্বশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৯ সালে তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

[বঙ্কিম-জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; সুবল মিত্রের অভিধান; আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি]।

সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২—১৯০৪)—

সতীশচন্দ্র রায় বাংলা ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম তিলকচন্দ্র রায়, তিনি সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, কিন্তু জমিদারীর ভগ্নদশায় সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যেই পালিত হইয়াছিলেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে এফ-এ পাস করিয়া তিনি বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন, এবং সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইলে সতীশচন্দ্র বি-এ পরীক্ষা না দিয়া রবীন্দ্রনাথের নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। বাল্যকাল হইতেই সতীশচন্দ্রের রচনা করিবার ঝোঁক ছিল, পরে রবীন্দ্রনাথের সংসর্গে আসিয়া তাহা বিকাশ লাভ করে। সতীশচন্দ্র প্রতিভাবান্ যুবা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিকাশ পূর্ণতা পাইবার পূর্ব্বেই বাংলা ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে বোলপুরে বসন্তরোগে প্রাণ-ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় সতীশচন্দ্রের বয়স মাত্র ২২ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে তাঁহার প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

[সতীশচন্দ্র রায়ের রচনাবলীর ভূমিকা ; বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২)—

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ১২৮৮ সালের ৩০এ মাঘ তাঁহার মাতুলালয় নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিমতা গ্রাম কলিকাতার সন্নিকট

বেলঘারিয়া ষ্টেসনের পাশে। সত্যেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাস ছিল নদীয়া জেলার চুপী গ্রামে। কিন্তু সত্যেন্দ্রের পিতামহ বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত কলিকাতার নিকটে বালীগ্রামে আসিয়া বাস করেন। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা রজনীনাথ দত্ত কলিকাতায় বাড়ী করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বহু বিদ্যায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার প্রবল পাঠানুরাগ ও ভাষা শিক্ষার আগ্রহ ছিল। কিশোর বয়স হইতেই তিনি কবিতা রচনা ও কবিতা অনুবাদে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯০১ সালে তাঁহার প্রথম কবিতা "সবিতা" ছাপা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি 'সন্ধিক্ষণ' নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। ইহার পরে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম প্রবল ছিল, এইজন্য দেশে কোনো স্মরণযোগ্য ঘটনা (তাহা সু বা কু হোক) ঘটিলেই তিনি তাহা অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ সমাজের কুপ্রথার প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের দানশীলতা, মাতৃভক্তি ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেশগুরু মহাত্মা গান্ধীজীর প্রতি ভক্তি তাঁহার চরিত্রকে বিশেষত্ব দান করিয়াছিল। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে বাংলা ১৩২৯ সালের আষাঢ় মাসে সত্যেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা-পুস্তক অনেকগুলি তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলিক কবিতা রচনাতে তাঁহার যেমন দক্ষতা ছিল, নানা ভাষার কবিতা মৌলিকের ন্যায় সরস ও সুন্দর করিয়া অনুবাদ করিবারও তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। আর তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল নানাবিধ ছন্দ রচনায় ও নব নব ছন্দ উদ্‌ভাবনে। এই শক্তি

দেখিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রকে ছন্দসরস্বতী বলিয়া সমাদর করিতেন। সত্যেন্দ্র কবিতা ভিন্ন নানাদেশের নাটক গল্প ধর্ম্ম ও নীতিকথা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

[প্রবাসী ১৩২৯ সালের শ্রাবণ, ১৩২৯।২।৬৩৫, ১৩৩৩।১।৪৩৪, নব্যভারত ১৩২৯ শ্রাবণ, প্রতিভা ১৩৩২ কার্ত্তিক-পৌষ, ইত্যাদি]

সহদেব চক্রবর্ত্তী (১৭০০ ?)—

সহদেব চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ঐ পুস্তক রচনা আরম্ভ করিবার তারিখ তিনি দিয়া গিয়াছেন বাংলা ১১৪১ সাল, (১৭৪০ খৃষ্টাব্দ) ৪ঠা চৈত্র। তিনি হুগলী জেলার বালিগড় পরগনার অধীন রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কাব্যের নাম ধর্ম্মমঙ্গল হইলেও তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতা মাণিক গাঙ্গুলী অথবা ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের হুবহু অনুকরণ নহে। ইহার বিষয় স্বতন্ত্র। মূল উপাখ্যান অবশ্য বৌদ্ধ, কিন্তু তাহাকে তিনি নানা দেবদেবীর ও নাথসিদ্ধপুরুষদের কাহিনীর দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। হরপার্ব্বতীর বিবাহ, কানুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি নাথ সিদ্ধদিগের কাহিনীর সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুর ও তাঁহার পূজক হরিশ্চন্দ্র লুইচন্দ্র ভূমিচন্দ্রের কথা এবং যাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মবিদ্বেষের কথাও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির কথারও উল্লেখ আছে। ধর্ম্মসেবক ডোম জাতির নির্য্যাতনের কথাও আছে। সহদেব চক্রবর্ত্তী তাঁহার কাব্যে স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্ব বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৯১ পৃঃ ; History of Bengali Language and Literature—Dr. D. C. Sen].

সীতানাথ মুখোপাধ্যায় (১৯ শতক)—

সীতানাথ পূর্ব্ববঙ্গের একজন যাত্রাওয়ালা ছিলেন। তিনি ওস্তাদী কবিগানের শেষ সময়ে আবির্ভূত হইয়া গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

[বঙ্গের কবিতা—জনাথকৃষ্ণ দেব]

সুধারাম বাউল (১৭০০ ?)—

ইনি বিক্রমপুরের মাঠিভাঙ্গা গ্রামে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে নমঃশূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বেশি আর কোনও পরিচয় ইঁহার পাওয়া যায় না। ইনি পরবর্ত্তী জীবনে বাউল হইয়া অনেকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৭—১৮৭৮)—

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার যশোহর জেলার ভৈরবনদের তীরবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্রসন্ননাথ মজুমদার। গ্রামে ও বাড়ীতে তিনি বাংলা ফার্সী ও সংস্কৃত কিছু কিছু অধ্যয়ন করেন। যখন কলিকাতায় আসিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পড়িতেন, তখনই ইঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়। তিনি ষড়্ঋতু বর্ণনা করিয়া এক কাব্য রচনা করেন। উষা-স্বপ্ন, ঈশ্বরপরায়ণের মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়েও তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। তিনি ইহার পরে আরো অনেক কবিতা নাটক রচনা করেন। কিন্তু বাংলা ১২৭৫ সালে তাঁহার 'সবিতা-সুদর্শন' নামক কবিতা প্রকাশিত হইলে তিনি কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা ও যশ লাভ করেন। বাংলা ১২৭৮ সালে তিনি পীড়িত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মুঙ্গেরে যান, এবং প্রসন্নকুমার

ঠাকুরের শৈলনিবাস পীরপাহাড়ে অবস্থান করিতে থাকেন। সেইখানে তাঁহার অমর কাব্য 'মহিলা' রচিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এই অপূর্ব্ব সুন্দর কাব্যখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কাব্যে তিনি মহিলার গুণ ও যশ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, এবং মহিলার চারি রূপ লইয়া মাতা জায়া ভগিনী ও দুহিতা নামে চারি পরিচ্ছেদে কাব্য রচনা করিবার সঙ্কল্প করেন। মাতা ও জায়া পরিচ্ছেদ শেষ করিয়া ভগিনী পরিচ্ছেদের মাত্র চারিটি কলি তিনি লিখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৮৫ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

[মহিলা কাব্যের ভূমিকা; বঙ্গভাষার লেখক; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ইত্যাদি]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন (১৮৭৪—)—

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বিহারের পাটনা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে তিনি ষ্টেট্ স্কলাশিপ প্রাপ্ত হইয়াও বিলাত গমন করেন নাই। ইনি ১৯১০ সালে Doctor of Low পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কয়েকবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন। গত ১৯৩১—৩২ খৃষ্টাব্দে ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডিশন্যাল জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট। আইন ব্যবসায়ীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও ইনি বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত হিন্দোলা, তুষার, চিনার, চৈতা প্রভৃতি কবিতা পুস্তকগুলি সদ্ভাব-পবিত্র

কবিতাকুসুমে সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়া ইনি Jurisprudence in Ancient India নামক ইংরাজী পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কবি ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর।

সৈয়দ মর্ত্তুজা (১৬শ শতাব্দীর শেষ)—

সৈয়দ মর্ত্তুজা খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অনেক পদ পদকল্পতরু প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহে পাওয়া যায়। সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণিতাযুক্ত বহু বৈষ্ণব পদাবলী চট্টগ্রাম হইতেও পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বিবেচনা করেন যে, চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদগুলি অপর কোনও চট্টগ্রামনিবাসী সৈয়দ মর্ত্তুজার রচিত। ইঁহার সম্বন্ধে আর কোনও পরিচয় জানা যায় না। প্রবাদ এই যে, সৈয়দ মর্ত্তুজা মুর্শিদাবাদ শহরের সন্নিকট জঙ্গীপুর বালিঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল সৈয়দ হোসেন কাদেরী। সুতী নামক স্থানে গঙ্গাতীরে সৈয়দ মর্ত্তুজা ও তাঁহার ভৈরবী—ব্রাহ্মণকন্যা আনন্দময়ী—সমাহিত আছেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিন গ্রন্থে শা মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধির উল্লেখ আছে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মর্ত্তুজার পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যা আসিয়া বিবির স্বামী, মর্ত্তুজার জামাতা, সৈয়দ কাসেম বালিঘাটায় শ্বশুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান।

[বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩২৫ ; সাহিত্য ১৩১০ ; পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়]

হরু ঠাকুর (১৭৩৮—১৮২৪)—

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী বা দীর্ঘাঙ্গী সাধারণের নিকট হরু ঠাকুর নামে

পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কবিওয়ালা ছিলেন। কবিওয়ালারা প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোক হইতেন, কিন্তু হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া লোকে সম্মান করিয়া তাঁহাকে ঠাকুর পদবী দিয়াছিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১১৪৫ সালে কলিকাতার সিমলা পাড়ায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র। পাঠশালায় পাঠ করিবার সময়েই হরু ঠাকুর পুস্তক অধ্যয়ন অপেক্ষা কবিতা রচনা ও গান করার দিকেই অধিক মনোযোগ দিতেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং হরু ঠাকুর পাঠশালা ত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় নিষ্কর্ম্মা কতকগুলি লোককে জড়ো করিয়া এক সখের কবিদল খুলিলেন। রঘুনাথ দাস কবিওয়ালা তাঁহার কবিগানের শিক্ষাগুরু ছিলেন, এজন্য হরু ঠাকুর তন্তুবায় জাতীয় এবং কাহারও মতে মুচি জাতীয় রঘুনাথকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, এবং নিজের কোনো কোনো গানে গুরুর নামের ভণিতা লাগাইয়া তিনি গুরুভক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হরুঠাকুর একবার তাঁহার সখের দল লইয়া গান করিবার জন্য শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে আহূত হন। মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া একজোড়া মূল্যবান শাল তাঁহাকে পারিতোষিক দেন। তেজস্বী কবি সেটি তাঁহার দলের ঢুলির গায়ে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেও মহারাজা তাঁহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বরাবর অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। মহারাজারই পরামর্শ অনুসারে শেষ হরু ঠাকুর তাঁহার সখের দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করেন। কিন্তু নিজের কবিত্বশক্তি বেচিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহার মন চাহিত না। সে যাহাই হউক, তাঁহার নাম ও খ্যাতি দেশে ছড়াইয়া পড়িল, এবং যশোমণ্ডিত হইয়া ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার

মৃত্যু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। পরে বঙ্গবাসী কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন। হরু ঠাকুরের গানগুলি কবিত্বে রসে মণ্ডিত, সুখপাঠ্য। ইহা সেই অশিক্ষিত কবির পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে।

[বঙ্গের কবিতা; বঙ্গভাষার লেখক; সুবল মিত্রের অভিধান; History of the Bengali Literature in the Nineteenth Century—Dr. Susilkumar De; সমাচার-দর্পণ ১৮২৪ সনের ২১এ আগষ্ট তারিখের; ভারতবর্ষ ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩)—

ইনি বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গুলিটি নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। ইঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র। ইনি প্রাচীন হিন্দু কলেজে ও পরে তাহা প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিবর্ত্তিত হইলে সেই কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং বি-এ বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। মাইকেল মধুসূদনের পরে ইনিই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ কবির আসন অধিকার করেন। ইনি কবিতাবলী (১৮৮০) নামে খণ্ডকবিতার সমষ্টি গ্রন্থ, চিন্তা-তরঙ্গিণী (১৮৬১), বৃত্রসংহার (১৮৭৭), ছায়াময়ী (১৮৮০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), বীরবাহু (১৮৬৪), আশাকানন (১৮৭৬) ও বহু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়িলে অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন, এবং সেই অবস্থায় তিনি চিত্তবিকাশ নামে এক কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করেন। বাংলা ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভারতসঙ্গীত, ভারতভিক্ষা, ভারতবিলাপ প্রভৃতি

কবিতায় ও ব্যঙ্গ কবিতায় হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহাতেই তাঁহাকে বিখ্যাত ও যশস্বী করিয়াছে। ইঁহার ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'যোগেশ' কাব্য রচনা করিয়া কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

[বঙ্গভাষার লেখক ; সুবল মিত্রের অভিধান ; রামগতি ন্যায়রত্নের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ; হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ; হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।] *

---

* কয়েকজন কবির জন্ম-মৃত্যুর তারিখ প্রসিদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কবিতার প্রথম লাইনের বর্ণানুক্রমিক সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

কবিদিগের বর্ণানুক্রমিক সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা